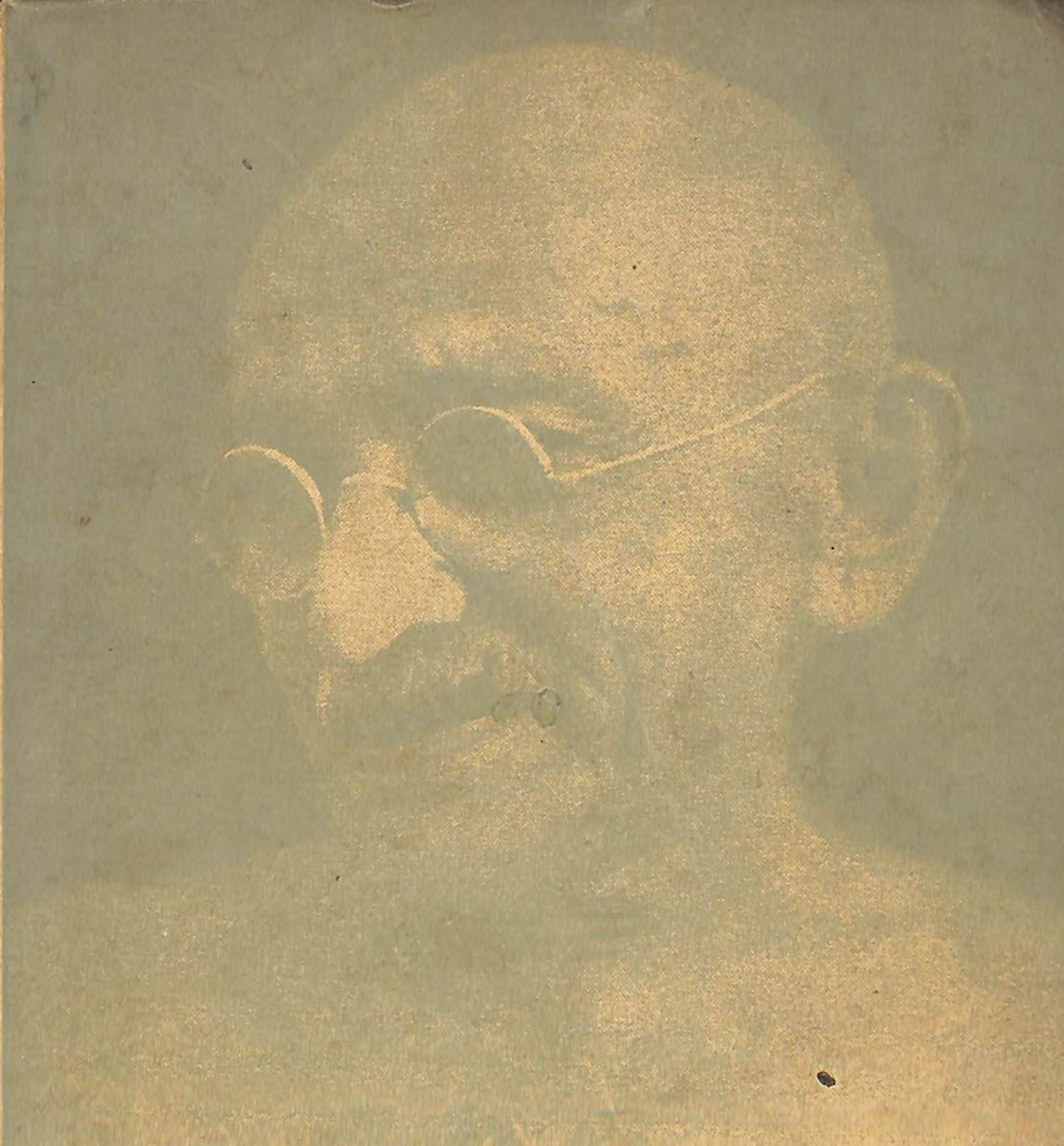


ছাত্রদের প্রতি

মহাত্মা গান্ধী

ছাত্রদের প্রতি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নবজীবন ট্রাস্টের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত
প্রথম সংস্করণ
—সাড়ে চার টাকা—

প্রচ্ছদপট চিত্রটি
"জনসেবক পত্রের" সৌজন্যে

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৮, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

এক মহত্তর জীবনাদর্শের উপলব্ধির পথে
প্রথম প্রেরণা যাঁর কাছে পেয়েছিলাম,
ভারতীয় ছাত্র ও যুব সংগঠনের অন্যতম পথিকৃৎ,
আনন্দমেলার বন্ধু সেই "মৌমাছি"র করকমলে—

ভূমিকা

গান্ধীজীর সঙ্গে ছাত্রজগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয় বহুদিন পূর্বে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনকালে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জোহনস্-বার্গের নিকট টলস্টয় ফার্মের স্থাপনা করেন। এখানে সত্যাগ্রহীরা কঠোর কৃচ্ছ্রতা-মূলক জীবন যাপন করত। সাধারণ অর্থে "শিক্ষা" বলতে যা বোঝায়, তার দায়িত্ব এই সময় গান্ধীজীর উপর পড়ে। টলস্টয় ফার্মের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষা দেবার আংশিক ভার তাঁকে বহন করতে হয়। এইভাবে এক অভিনব জীবন-যাত্রা পদ্ধতির প্রয়োজনের তাগিদে গান্ধীজীকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর 'প্রয়োগ' সুরু করতে হয়। আর তার ফলে তাঁর চতুর্দিকস্থ অহিংস সংগ্রামের পরিবেশের প্রভাবে ও স্বীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গির কল্যাণে শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতবাদ এবং ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা-সমূহ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

নৈতিকতা গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ হওয়ায় বরাবরই ছাত্র-সমাজকে তিনি সংযম-পালনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্টা করে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রহ্মচর্য ছাড়া কেউই নিজেকে জনসমাজের আদর্শ সেবকে রূপায়িত করতে পারে না এবং সেইজন্য ব্রহ্মচর্যের বাণী প্রচারে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নি। বস্তুতঃ তিনি একবার এমন কথাও লেখেন যে, তিনি স্বয়ং বিবেকবোধ-সম্পন্ন কর্মী হলেও কখনও কখনও বাসনা তাঁর কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করেছে। তাঁর নিজের সীমা সম্বন্ধে এইরূপ সচেতনতা তাঁকে সংযমাভিমুখী করেছে। তাঁর যুক্তি হচ্ছে "সত্যোপলব্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণকে স্বার্থলেশশূন্য হতে হবে। এদের সন্তান-প্রজনন এবং সংসার-প্রতিপালনের মত স্বার্থপূর্ণ কাজে মগ্ন হবার সময় থাকতে পারে না।" (যারবেদা মন্দির হইতে—পৃষ্ঠা ১৭)। কিন্তু সংযমের উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রায়ই তাঁকে এ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও নৈষ্ঠিক নীতিবানদের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি তাঁর স্বভাবোচিত সাহসিকতার সঙ্গে অদম্য উৎসাহে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

যাই হোক, তাঁর নবীন-বয়স্ক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তিনি যা বলতে চাইতেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, তারা যেন তাদের গুরুভার সামাজিক দায়িত্বের কথা নিজ মনশ্চক্ষুর সামনে চিরজাগরূক রাখে। ছাত্ররা হচ্ছে সমাজেরই অঙ্গ এবং তাদের শিক্ষার ব্যয় ছাত্রদের শ্রমদ্বারা নির্বাহ হয় না। সমগ্র সমাজকে এই ব্যয়ভার বহন করতে হয়। আর আমাদের মত দরিদ্র দেশে স্বভাবতই এই ভারের অধিকাংশ

পড়ে লক্ষ লক্ষ অবহেলিত ও শোষিত গ্রামবাসীর উপর। এই সকল গ্রামবাসী দেহ ও মনের অন্ধকারার মাঝে নির্বাসিত। সুতরাং ছাত্রদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রাবস্থাকে মানসিক বিলাসিতায় লিপ্ত হবার সুযোগ বলে মনে না করা। বরং আজ যাদের স্কন্ধারূঢ় হয়ে তারা বিরাজমান, শেষ পর্যন্ত তাদের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতির মুহূর্ত বলে মনে করতে হবে এই বিদ্যার্জনের কালকে। এই ঋণ পরিশোধের একটি সরল ও সহজসাধ্য উপায় হচ্ছে, পঠনকালেই যে কোন একটি কারুশিল্প শিক্ষা করা এবং নিজ শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যে তাদের শিক্ষাকালীন ব্যয়-ভারের যতটুকু পারা যায় উপার্জন করা। এইভাবে শিক্ষণকালে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হলে পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষে শিক্ষার বিকীরণ হবার পথে যথেষ্ট সহায়তা মিলবে, কারণ প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতির অভাবে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয় বলে বলা হয়।

গান্ধীজী ছাত্রদের এ পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, যেসব গ্রামের মাঝে তাদের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত, তার অধিবাসীদের সঙ্গে ছাত্রদের যেন নিয়মিত সংযোগ থাকে। ছাত্রদের শুধু সহানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রামবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক বাধা সম্বন্ধে তথ্যান্বেষণ করলেই চলবে না, এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আর্থিক ও নৈতিক মানের উন্নতির জন্যও তাদের সক্রিয় ভাবে কিছু করতে হবে। গান্ধীজী এই অভিলাষ পোষণ করতেন যে, এ কার্য সাধনের জন্য ছাত্ররা উপলব্ধি ও উদ্যম সহকারে চরকা ধরবে এবং এই চরকাকে তারা বিশ্বের তাবৎ শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী যোগসূত্র স্বরূপ মনে করবে।

এই সাধারণ উৎপাদনমূলক শ্রমের মাধ্যমে শ্রমজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ছাত্ররা নিরক্ষরতা দূর করবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আদি সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেবে। পণপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার মত নিষ্ঠুর রীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ছাত্রদের সমাজ-সংস্কারের নায়ক হতে হবে।

কিন্তু আমাদের মত পরাধীন দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের এর চেয়েও একটি গুরুতর দায়িত্ব আছে। বহু ছাত্র এ বিষয়ে গান্ধীজীর উপদেশপ্রার্থী হয়। তিনি তাদের সকলকে যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি গড়ে তোলার পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন যে, তারা যেন সকলের বক্তব্য শ্রবণ করে ও আসল ও নকলের পার্থক্য ধরতে পারে এবং সর্বোপরি তারা যেন দলগত রাজনীতি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকে। ছাত্ররা যেন তাদের কর্তব্যে ব্রতী থাকে এবং নৈতিকতা সম্বন্ধে তাদের মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন তাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থাকে। সর্বব্যাপক রাষ্ট্র-

বিপ্লবের সময় তাদের পাঠ্যপুস্তক রেখে দিয়ে সৈনিকের মত সে আন্দোলনে যোগদান করতে হবে। সারা ঘরে যখন আগুন লাগে তখন সকলেই জলপাত্র হস্তে অবিলম্বে করণীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়। সময় সময় গান্ধীজীর মনে এই ইচ্ছা জাগত যে, চীনের মত আমাদের ছাত্রসমাজও যেন সকল কর্মের অগ্রদূত হয়। জাতীয় সংগ্রামকালে যুদ্ধক্ষেত্রই হবে তাদের জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে গান্ধীজী এই ভাবে ছাত্রসমাজকে সেবামূলক আত্মদান ও শোষিত জনতার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান একাত্মতার পথে সুসংবদ্ধভাবে নিয়ে যেতে চাইতেন, যাতে ছাত্ররা তাদের সেবা দ্বারা এদের এই ঘন ঘোর তমিস্রা থেকে উদ্ধার করে। এই হচ্ছে জীবনের পরমারাধ্য ধ্যেয় এবং শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে বয়োপ্রাপ্তিকালে ছাত্রদের এই গুরুদায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবার যোগ্য করে গড়ে তোলা।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধাবলী এবং গান্ধীজীর বক্তৃতা ও রচনার উদ্ধৃতি-সমূহের কালানুক্রমিক সমাবেশ করা হয়েছে। গান্ধীজী ছাত্রসমাজের জন্য যে বহুমুখী সামাজিক কর্তব্য এবং সুমহান আদর্শ নির্ণয় করে গেছেন, এ গ্রন্থ যথোচিত অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে অবশ্যই তা পাঠকের মনে প্রভাব সৃষ্টি করবে। যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানরূপী লক্ষ্য তাদের কাছে কঠিন বলে মনে হওয়া উচিত নয় এবং দীন-দরিদ্রের জন্য তাদের কাছে যে ত্যাগের দাবী তিনি জানিয়েছেন, তার পরিমাণ হ্রাস করারও কোন কারণ নেই।

গান্ধীজী তাঁর জীবদ্দশায় ভারতের ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে যে বিশ্বাস পোষণ করতেন, তারা যেন তার যোগ্য হয়।

নির্মলকুমার বসু

কলিকাতা
৪-৪-১৯৪৮

উপক্রমণিকা

যে কোন প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজ জীবনে নবীন স্থিতি ও নব মূল্যবোধ স্থাপনা করতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে লোকমানসের পরিবর্তন সাধন ; এবং এই নূতন মনোভাবকে লোকজীবনে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য এর পর প্রয়োজন হয় অনুকূল সামাজিক কাঠামো রচনা করা। নচেৎ লোকচরিত্রে পরিবর্তন আনার চেষ্টা না করে বা এই কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যেন তেন প্রকারেণ বস্তুস্থিতির বাহ্য রূপান্তর ঘটালে, হয় নবীনাদর্শের উদ্যোক্তাদের অবর্তমানে সেই উচ্চ জীবনাদর্শ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, আর নয়ত এই প্রক্রিয়ার অবসানে দেখা যায় যে যাত্রী পথভ্রান্ত হয়ে মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আমরা বার বার দেখেছি। তাই অতীত প্রয়োগের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আমাদেরই দেশের যে মহামানব মহান সাধ্য প্রাপ্তির জন্য সাধনশুদ্ধির উপর জোর দিয়ে বিপ্লব বা ক্রান্তি আবাহনের পন্থায় বিপ্লব সাধন করলেন, তাঁর নাম মহাত্মা গান্ধী। লৌহবাসরের সূচিকাপ্রমাণ ছিদ্রপথে অনুপ্রবেশ করে কাল-ভুজঙ্গ যাতে মানবসমাজের বহুদিনের কঠোর তপস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অকাল মৃত্যু ঘটাতে না পারে, তারই জন্য গান্ধীজী বিচারক্রান্তির উপর এত গুরুত্ব আরোপ করলেন। নবীন বিচারধারা লোকমানসে আসন পরিগ্রহ করলে জাগ্রত জনমত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রাচীন প্রথার বন্ধনমুক্ত হয়ে সমাজ-দেউলে নবীন দেবতার আরাধনা করবে। এবং এ আবাহন হবে দীর্ঘকালস্থায়ী ও এর প্রক্রিয়াও হবে সর্বাপেক্ষা স্বল্প-আয়াস-সাধ্য।

আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে চিরকাল মতদ্বৈধতার অবকাশ থেকে যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ নেই যে অকর্মণ্য সৈনিক দ্বারা কঠিন রণে জয়লাভ অসম্ভব। তাই যে মতেরই হোক না কেন, নিজ অভীষ্ট সাধনের জন্য নিপুণ যোদ্ধা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন। আত্মসংযম ও আদর্শ নৈতিক চরিত্রনিষ্ঠা ছাড়া এ যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। প্রত্যহের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দায়িত্ব পালনে অক্ষম এবং সামান্য প্রলোভনে আদর্শচ্যুত কর্মী নিশ্চয় কোন জাদুমন্ত্র প্রভাবে বিপ্লবের লেলিহান বহ্নিশিখার মাঝে ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনুশাসন ও আদর্শবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে পড়বে না। সেইজন্য যে মহামানবের সমগ্র জীবনই সত্যলোকাচারী এক অনির্বাণ হোমশিখা, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রবচন সর্ব মত ও পথের ছাত্র ও তরুণদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

যোগ্যতার সঙ্গে চলার উপযুক্ত পাথেয়র সন্ধান দেবে, এতে সন্দেহ নেই। সতত অনুশীলন ও নিয়ত প্রচেষ্টার দ্বারা ষড়-রিপুর দাস এই মরমানব কতটা উর্ধ্বে উঠতে পারে, তারই জলন্ত নিদর্শন মহাত্মা গান্ধী। তিনি সর্বকালের সর্ব মানবের প্রেরণার উৎস এবং সর্বযুগে তাঁকে মানবতা-পরিমাপের মানদণ্ড রূপে বিবেচনা করা হবে। ভবিষ্যতের দায়িত্বভার যাদের উপর পড়বে, তাদের জন্য তিনি কোন্ পথ ছকে দিয়েছিলেন, তা সেই কারণে উত্তরোত্তর অধিকতর মহত্ত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

বাঙলার ছাত্র- ও তরুণ-সমাজের হাতে এই মহাপুরুষের উপদেশ পৌঁছে দেবার সম্পূর্ণ গৌরব এই গ্রন্থের প্রকাশকদের প্রাপ্য। এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য তাঁরা প্রতিটি বঙ্গভাষাভাষীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন সন্দেহ নেই। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয় আমার প্রতি অসীম স্নেহবশতঃ এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিভাষা রচনা কার্যে পরামর্শ দিয়েছেন। কল্যাণীয়া শ্রীমতী গীতা ধর অশেষ পরিশ্রম সহকারে এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দিয়েছেন। এঁদের সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সম্পর্ক নয় বলে শুধু ঋণ স্বীকার করেই ক্ষান্ত হলাম।

আর একটি কথা, গ্রন্থের কলেবর অত্যধিক স্ফীত হবার আশঙ্কায় মূল পুস্তকের কয়েকটি অধ্যায় বর্জন করেছি এবং কোন কোন স্থলে ঈষৎ সম্পাদনা করতে হয়েছে।

অঃ ভাঃ সর্ব সেবা সঙ্ঘ
পোঃ খাদিগ্রাম, মুঙ্গের।
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৮

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রদের প্রতি

ছাত্রদের সঙ্গে আমি বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছি। তারা আমাকে জানে এবং আমি তাদের জানি। তাদের কাছ থেকে আমি কাজ পেয়েছি। কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্র আমার অন্তরঙ্গ সহকর্মী। আমি জানি যে তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ আশাস্থল। অসহযোগের গৌরবোজ্জ্বল দিনে তাদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র যারা কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়েছিল এবং এখনও যারা দৃঢ়তা সহকারে নিজ কর্তব্য করে যাচ্ছে, তারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করেছে এবং নিজেরাও উপকৃত হয়েছে। আর সে আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, কারণ দেশের অবস্থা সেরকম নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বর্তমান শিক্ষা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক হলেও দেশের যুব-সম্প্রদায়ের কাছে এর প্রলোভন অতীব তীব্র। কলেজী শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের সুরাহা হয়। মন্ত্রমুগ্ধদের দলে ঢুকে পড়ার অনুমতিপত্র এ। গতানুগতিক পন্থায় না চললে সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান-পিপাসা মেটে না। মাতৃভাষার পরিবর্তে সম্পূর্ণ এক বিদেশী ভাষার জ্ঞানার্জনের জন্য যে বহুমূল্য সময় নষ্ট হয়, তার প্রতি কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। এ পাপ কখনই অনুভূত হয় না। ছাত্রসমাজ ও তাঁদের শিক্ষকগণ স্থির করে নিয়েছেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার ব্যাপারে দেশীয় ভাষা সমূহ সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমি ভেবেই পাই না যে, জাপানের কাজকর্ম চলছে কেমন করে! কারণ আমি যতদূর জানি, তারা জাপানী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেয়ে থাকে। চীনের জেনারেলিসিমো ইংরাজী প্রায় জানেন না বললেই চলে।

কিন্তু ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা মেনে নিলেও একথা ঠিক যে, এই সব নবীন নরনারীর ভিতর থেকেই ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দের সৃষ্টি হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের মধ্যেও বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। অহিংসার প্রতি তাদের আকর্ষণ অতি অল্প। এক ঘুষির বদলে আরও একটি বা দুটি ঘুষির কথা তারা সহজেই বোঝে। এর পরিণাম অস্থায়ী হলেও তারা মনে করে যে, এতে দ্রুত ফললাভ হয়। এ হচ্ছে পশু বা মানবজাতির যুদ্ধকালীন সতত বিরাজমান পাশব শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অহিংসার পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ হচ্ছে ধৈর্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা এবং আচরণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে অধিকতর কষ্ট ও তিতিক্ষার পরিচয় দেওয়া। কিন্তু আমি নিজেই হচ্ছি তাদের সমগোত্রীয় ছাত্র এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক অর্থে এই বিশ্বই আমার বিদ্যালয়।

তাদের ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্থক্য আছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার জন্য এবং আমার গবেষণার সহকর্মী হবার জন্য তাদের আমি স্থায়ী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তবে এ আমন্ত্রণ নিম্নরূপ সর্তে—

১। দলগত রাজনীতিতে ছাত্ররা কোনক্রমেই অংশ গ্রহণ করবে না, তারা হচ্ছে বিদ্যার্থী এবং তথ্যান্বেষক—রাজনীতিবিদ্ নয়।

২। রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট করা তাদের উচিত হবে না। নেতা অবশ্য তাদের থাকবে, তবে নেতার প্রতি তারা অনুরাগ দেখাবে তাঁর সৎগুণাবলীর অনুকরণ করে। তাদের নেতাকে জেলে দিলে বা নেতা মারা গেলে বা এমন কি তাঁর ফাঁসি হলেও তারা ধর্মঘট করবে না। দুঃখ যদি তাদের অসহ্য মনে হয় এবং সমস্ত ছাত্রের বুকেই সমানভাবে তা বাজে, তবে সে ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সম্মতি নিয়ে বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ কর্ণপাত না করলে যথোচিত শিষ্টাচার সহকারে ছাত্রেরা বিদ্যানিকেতন ছেড়ে চলে যেতে পারবে এবং কর্তৃপক্ষ অনুতাপ প্রকাশ করে তাদের পুনরায় না ডেকে পাঠানো পর্যন্ত তারা ফিরে আসবে না। বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছাত্র বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কখনই তারা বলপ্রয়োগ করবে না। এ বিশ্বাস তাদের থাকা চাই যে, সংহতি সম্পন্ন হলে এবং তাদের আচরণ সৌজন্যপূর্ণ হলে তাদের বিজয় অনিবার্য।

৩। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তারা ত্যাগের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুতো কাটবে। তাদের সাজ-সরঞ্জাম সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো গোছানো থাকবে। সম্ভব হলে তারা নিজেরাই সেসব তৈরী করবে। স্বভাবতই তাদের সুতো খুব উঁচুদরের হবে। সুতো কাটার আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় দিকগুলি সম্বন্ধে যেসব বই আছে, তারা সেগুলি পড়বে।

৪। তারা আগাগোড়া খাদি ব্যবহার করবে এবং কলে তৈরী বা বিদেশী জিনিসের বদলে গ্রাম্যপণ্য ব্যবহার করবে।

৫। অপরের উপর তারা "বন্দেমাতরম্" বা "জাতীয়-পতাকা" জোর করে চাপাবে না। জাতীয় পতাকার ছবিযুক্ত প্রতীক তারা নিজেরা ব্যবহার করতে পারে তবে অপরকে অনুরূপ প্রতীক ব্যবহারের জন্য চাপ দেবে না।

৬। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বাণী তারা নিজেরা বহন করবে এবং তাদের মনে সাম্প্রদায়িকতা বা ছুঁৎমার্গের ভাব থাকবে না। প্রিয়জনের মত নিজেরা অন্য ধর্মাবলম্বী এবং হরিজন ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করবে।

৭। আহত প্রতিবেশীর প্রাথমিক পরিচর্যা অবশ্যই তারা করবে এবং নিকটস্থ গ্রামে তারা সাফাই এবং আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করবে ও গ্রামের শিশু ও

বয়স্কদের তারা শিক্ষা দেবে।

৮। রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী তারা সবাই শিখবে এবং এর বর্তমান যুগ্মরূপ অর্থাৎ দু'ধরণের কথন ও লিখন পদ্ধতিও তারা জানবে। এর ফলে হিন্দি বা উর্দু—যাই বলা হোক না কেন এবং নাগরী ও উর্দু যে কোন লিপিই লেখা হোক না কেন, তারা কোন অসুবিধাই ভোগ করবে না।

৯। নতুন কিছু যা তারা শিখবে, তা তারা মাতৃভাষায় অনুবাদ করবে এবং নিকটস্থ গ্রামগুলিতে সাপ্তাহিক পরিক্রমার সময় সেই নতুন জ্ঞান ছড়িয়ে দেবে।

১০। কোন কিছুই তারা গোপন করবে না, তাদের যাবতীয় আচরণ খোলা-খুলি হবে। তারা আত্মসংযমমূলক পবিত্র জীবনযাপন করবে, সমস্ত ভয় বিসর্জন দেবে ও সহপাঠী দুর্বল ছাত্রদের রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে, এবং জীবন পণ করেও অহিংস পন্থায় দাঙ্গা দমনের জন্য তারা তাদের বিদ্যানিকেতন ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ও প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবে।

১১। সহপাঠিনী ছাত্রীদের সঙ্গে তারা যথোচিত ন্যায়সঙ্গত ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করবে।

ছাত্রদের যে কার্যক্রম আমি ছকে দিয়েছি, তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তাদের সময় করে নিতে হবে। আমি জানি যে কুড়েমি করে তারা বহু সময় নষ্ট করে। প্রকৃত মিতাচারের ফলে তারা সময় বাঁচাতে পারে। তবে কোন ছাত্রের উপর আমি অসঙ্গত চাপ দিতে চাই না। কোন দেশপ্রেমিক ছাত্রকে এক নাগাড়ে আমি তাই একটি বছর নষ্ট করতে বলব না। তার সমস্ত বিদ্যাভ্যাস কালের মধ্যে তাকে এই এক বছর দিতে বলব। তারা দেখবে যে এভাবে এক বছর দেওয়ায় সময় নষ্ট হয়নি। এ প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক নৈতিক এবং শারীরিক উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে এবং পঠদ্দশায় তারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারবে।

পুণা

১৩-১১-১৯৪৫

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সূচীপত্র

ছাত্রদের প্রতি

১। সন্ত্রাসবাদী অপরাধ *

যদিচ শ্রীযুক্ত গান্ধীর গুরু পরলোকগত গোখেলের এই নির্দেশ ছিল যে এদেশে থাকাকালীন তিনি তাঁর কান খোলা রেখে মুখ বন্ধ রাখবেন, তথাপি ঐ সভায় কিছু বলার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। বক্তা এবং তাঁর স্বর্গবাসী গুরু উভয়েরই অভিমত হচ্ছে এই যে, রাজনীতি ছাত্রদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু হতে পারে না। কারণ তিনি ছাত্রদের রাজনীতি বোঝার এবং তাতে ভাগ না নেবার কোন কারণ বুঝে উঠতে পারেন না। রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা অনুচিত বলা যেতে পর্যন্ত তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আশা প্রকট করেছিলেন যে, তাদের শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সভার মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে তারা এ বিষয়ে একমত হবে যে, সবল চরিত্র গড়ে তুলতে না পারলে শুধু আক্ষরিক শিক্ষার কোন মূল্য নেই। এ কথা কি বলা যেতে পারে যে, দেশের ছাত্র সম্প্রদায় বা জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভয়? বিদেশে অবস্থান করলেও এই প্রশ্নটি বক্তার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করত। রাজনৈতিক দস্যুতা বা রাজনৈতিক হত্যার অর্থ তিনি বুঝতেন। এ বিষয়ে যথোচিত অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদিও তাঁর স্বদেশীয় কিছু সংখ্যক ছাত্রের মন উদ্দীপনার বহ্নি-শিখা এবং মাতৃভূমির প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ, তথাপি স্বদেশ প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ছাত্রদের জানা নেই। তিনি শুনেছেন যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হীনপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। এর কারণ এই যে তারা ভগবানকে ভয় করার বদলে মানুষকে ভয় করে। তিনি আজ এই জন্যই তাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন যে, রাজদ্রোহের সমর্থক হলে তিনি প্রকাশ্যভাবেই সে কথা ঘোষণা করবেন এবং এর পরিণতি সাদরে বরণ করবেন। এরকম করলে সমগ্র পরিবেশের মধ্যে আর মিথ্যাচারের স্পর্শ থাকবে না। ছাত্ররা শুধু ভারত কেন সারা সাম্রাজ্যের আশাস্থল। তারা যদি ঈশ্বরের ভয়ে কাজ করার পরিবর্তে ব্রিটিশ বা স্বদেশীয় সরকারের ভয় দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে

* ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার স্টুডেন্টস হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার।

তার ফল সারা দেশের পক্ষে হানিকর বলে পরিগণিত হবে। পরিণাম যাই হোক না কেন, তারা সদা সর্বদা মনের দরজা খোলা রাখবে। ডাকাতি বা নরহত্যার সঙ্গে যুক্ত যুবকেরা ভ্রান্তপথে পরিচালিত এবং এসব কাজের সঙ্গে তাদের কোনরকম সম্বন্ধ থাকা অনুচিত। এই সব ব্যক্তিদের তারা দেশ ও তাদের নিজেদের শত্রু বলে মনে করবে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এমন কথা বলছেন না যে, তাদের ঘৃণা করা উচিত। বক্তার গভর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস নেই এবং তিনি কোনরকম গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতি নন। তিনি বিশ্বাস করেন যে সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ যা সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে। তবে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না তুলে তিনি একথা অবশ্যই বলবেন যে, ভ্রান্তপথে পরিচালিত যে উদ্যম ডাকাতি এবং নরহত্যা করে, তার দ্বারা কোন সুফল লাভ করা যায় না। এইসব লুণ্ঠন ও নরহত্যা এ দেশে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। এ প্রথা এদেশে শিকড় গাড়বে না বা স্থায়ী ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হবে না। হত্যায় যে কোন মঙ্গল হয় না, ইতিহাস তার সাক্ষী। এ দেশের হিন্দু-ধর্মের তাৎপর্য হচ্ছে হিংসা থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ জীবহত্যা না করা। তাঁর মতে এই নীতিই হচ্ছে সকল ধর্মের মূল কথা। হিন্দুধর্ম তো একথাও বলে যে, পাপীকে ঘৃণা কোরো না। হিন্দুধর্ম বলে যে, পাপীকেও হত্যা করার অধিকার কারও নেই। রাজনৈতিক হত্যাকে পাশ্চাত্য প্রথা বলে অভিহিত করে বক্তা তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে এইসব পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও পশ্চিম দেশীয় পাপ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। পাশ্চাত্য জগতে এর ফলে কি লাভ হয়েছে? যুব সম্প্রদায় যদি এর অনুকরণ করে ও মনে করে যে এর দ্বারা ভারতের বিন্দুমাত্র উপকার হবে, তবে তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—এ কথা বলতে হবে। ব্রিটিশের শাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করা সত্ত্বেও আজ তিনি এ কথার আলোচনা করতে চান না যে, ব্রিটিশ, না ভারতের প্রাচীন পদ্ধতি—কোন্ ধরণের শাসন ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকর। তবে তাঁর তরুণ বন্ধুদের তিনি অবশ্যই এ পরামর্শ দেবেন যে তারা যেন নির্ভীক ও সৎ হয় এবং ধর্মীয় নীতি যেন তাদের পরিচালনা করে। দেশকে যদি তারা কোন কর্মসূচী দিতে চান, তবে খোলাখুলি তা জনসাধারণের সামনে পেশ করা উচিত। সভায় সমাগত তরুণ-তরুণীদের ধর্মভাবাপন্ন হতে এবং ধর্মবোধ ও নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হবার আবেদন জানিয়ে বক্তা তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তারা যদি মরতে প্রস্তুত থাকে তবে বক্তাও তাদের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করবেন। তিনি তাদের নেতৃত্ব মেনে নেবেন। তবে দেশে আতঙ্ক ছড়ালে তিনি তাদের বিরোধী হবেন।

[সভাপতি তাঁর সুললিত ভাষণে সন্ধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রশংসা করতঃ মন্তব্য

করেন যে, এ দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ দূরীকরণের জন্য যুব-সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বক্তৃতার জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধীকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।]

২। গুরুকুলে *

অভীমন্ত্র

সফরকালে সর্বদা আমাকে ভারতের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় জিনিস কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। সর্বত্র আমি এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছি এখানেও আজ তার পুনরুক্তি করলে অন্যায় হবে না বলে মনে হয়। মোটামুটি বলতে গেলে ভারতের সর্বাপেক্ষা ও অবিলম্বে প্রয়োনীয় জিনিস হচ্ছে উপযুক্ত ধর্মীয় চেতনা। তবে আমি এ কথা জানি যে এ উত্তর একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন বলে এতে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। অথচ এ উত্তরের ভিতর সর্বকালের সত্য নিহিত আছে। সুতরাং আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, আমাদের ভিতর ধর্মীয় চেতনা সুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে আমরা সর্বব্যাপী ভীতির মধ্যে ডুবে আছি। আমরা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক, এই দুই দিকেরই কর্তৃপক্ষকে ভয় করি। পুরোহিত ও পণ্ডিতদের কাছে আমরা মনের কথা বলার সাহস পাই না। ইহজাগতিক প্রভুদের সম্বন্ধে আমরা সম্ভ্রম মিশ্রিত আতঙ্ক বোধ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এতে আমরা তাঁদের এবং আমাদের নিজেদেরও ক্ষতি করি। ধর্মজীবনের গুরু বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের শাসক —এঁরা নিশ্চয় চান না যে, তাঁদের কাছে সত্য গোপন করা হোক। সম্প্রতি বোম্বাইএ বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড উইলিংডন মন্তব্য করেছেন যে, আমরা সত্যসত্যই "না" বলার কথা ভাবলেও সে কথাটি উচ্চারণ করতে ইতস্তত: করি এবং এই জন্য তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে নির্ভীকতার অনুশীলন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য নির্ভীকতার অর্থ এ নয় যে অপরের মনোভাবের অসম্মান বা অমর্যাদা করা। আমার বিনত অভিমত হচ্ছে এই যে, দেশে সত্যকার স্থায়ী কিছু মঙ্গল করার পূর্বে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নির্ভীকতা। ধর্মীয় চেতনা ছাড়া এ গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা যেন ভগবানকে ভয় করি, তাহলেই মানুষকে ভয় করার স্বভাব ছাড়তে পারব। আমরা যদি এই কথাটি উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের ভিতর এমন এক ঐশ্বরিক শক্তি বিদ্যমান, যা আমাদের সকল চিন্তা ও কার্যের সাক্ষী এবং যে শক্তি

* গুরুকুলের বাৎসরিক সম্মেলনে প্রদত্ত গান্ধীজী কর্তৃক লিখিত বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

আমাদের সর্বদা সযত্নে রক্ষা করে ও সত্যপথে পরিচালিত করে, তাহলে ভগবান ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কাউকেই আমরা ভয় করব না। রাজ্যপালদের প্রতি-পালকের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে সর্ববিধ আনুগত্যের সেরা এবং আনুগত্যের একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিদ্যমান।

স্বদেশীর তাৎপর্য্য

অভিমন্ত্রের যথোচিত অনুশীলনের পর আমরা দেখতে পাব যে খাঁটি স্বদেশী মনোবৃত্তি ছাড়া আমাদের মুক্তির উপায় নেই। এ স্বদেশীকে সুযোগ মত মুলতুবী রাখা যায় না। আমার কাছে স্বদেশী কথাটির অর্থ এর চেয়ে গভীর। আমি একে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই। সুতরাং সময় বিশেষে স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না। স্বদেশী বস্ত্র তো আমাদের সর্বদাই পরতে হবে। তবে ঈর্ষা বা প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে আমরা এমন করব না। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য-পরায়ণতা বশতই আমরা স্বদেশী কাপড় মাথায় তুলে নেব। বিদেশী বস্ত্র পরিধান করলে অবশ্যই স্বদেশী মনোবৃত্তিচ্যুত হতে হয়; কিন্তু বিদেশী ছাঁটকাটের পোশাক পরলেও ঐ একই রকমের দোষ হয়। আমাদের পোশাকের ধরণের সঙ্গে নিঃসন্দেহে আমাদের পরিবেশের সম্বন্ধ বিদ্যমান। রুচি এবং সৌষ্ঠবের দিক থেকে দেশী পোশাক নিঃসন্দেহে ট্রাউজার বা জ্যাকেটের চেয়ে শ্রেয়। ট্রাউজারের বাইরে দোদুল্যমান সার্ট এবং তার উপর নেকটাই বিহীন অবস্থায় খোলা ফ্ল্যাপের ওয়েস্ট কোট চাপান ভারতবাসীকে দেখে মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয় না। ধর্মের ক্ষেত্রে স্বদেশী-বোধ আমাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হতে এবং তাকে বর্তমান যুগোপযোগী করতে শেখায়। ইউরোপের অসংবদ্ধ অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে অমঙ্গল এবং তামসিকতার প্রতিভূ। কিন্তু প্রাচীন অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা মূলতঃ ঐশ্বরিক শক্তির উত্তরসাধক। বর্তমান সভ্যতা প্রধানত বস্তুতান্ত্রিক; কিন্তু আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক। জড় জগতের গতিসূত্র সম্বন্ধে গবেষণা এবং মানব প্রতিভাকে উৎপাদনের সাধন ও ধ্বংসের আয়ুধ আবিষ্কারে নিয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার কাজ। কিন্তু আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সূত্র আবিষ্কার। আমাদের শাস্ত্ররাজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা ঘোষণা করে যে, ন্যায়-ভিত্তিক জীবনযাত্রার জন্য যথাবিহিত ভাবে সত্য অনুসরণ, পবিত্র জীবন যাপন, সর্বজীবে দয়া এবং অস্তেয় ও অপরিগ্রহ ব্রতপালন অপরিহার্য। আমাদের শাস্ত্রমতে এতদ্ব্যতিরেকে সেই "সত্যম্‌শিবম্ ও সুন্দরমের" অনুভূতি লাভ

অসম্ভব। আমাদের সভ্যতা অপরিসীম নিঃসংশয়তা সহকারে ঘোষণা করে যে অহিংসা অর্থাৎ পবিত্র প্রেম ও দয়া বৃত্তির যথাযথ অনুসরণে সমগ্র বিশ্ব আমাদের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হবে। এই মহান আবিষ্কারের নায়ক এ নীতিতে বিশ্বাস সৃষ্টির মত বহু উদাহরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

অহিংসনীতি

রাজনৈতিক জীবনে এর ফল পরীক্ষা করে দেখ। আমাদের শস্ত্রমতে জীবনের চেয়ে মূল্যবান অবদান আর কিছুই নেই। আমাদের শাসকদের জীবনের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করতে পারলে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কেমন হবে, তা একবার ভেবে দেখ। তাদের মনে একবার যদি এই বিশ্বাস জাগে যে তাদের আচরণ সম্বন্ধে আমরা যে মনোভাবই পোষণ করি না কেন, তাদের দেহকে আমরা নিজদেহের মতই পবিত্র বোধ করব, তাহলে অবিলম্বে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হবে এবং উভয়পক্ষের মধ্যেই এমন অকপটতা দেখা দেবে যে, আজকের বহুবিধ জটিল সমস্যার সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের পথ রচিত হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অহিংসা আচরণের কালে অহিংস প্রতিদান পাবার আশা মনে রাখলে চলবে না, অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ পথে অহিংস প্রতিদান পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। অনেকের মত আমিও বিশ্বাস করি যে আমাদের সভ্যতার মারফৎ জগতকে আমরা নূতন এক বাণী শোনাবার ক্ষমতা রাখি। নিছক স্বার্থের খাতিরেই আমি ব্রিটিশ সরকারের অনুগত। ব্রিটিশ জাতিকে আমি অহিংসার শক্তিদীপ্ত বাণী সমগ্র বিশ্বে পরিব্যপ্ত করে দেবার কাজে লাগাতে চাই। তবে আমাদের তথাকথিত বিজেতাদের জয় করার পরই একাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। আর এ কাজের জন্য আমার মনে হয় যে, উপস্থিত আর্যসমাজী বন্ধুরাই সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ তোমরা খুঁটিয়ে পড় বলে দাবী কর এবং কোন কিছু তোমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নাও না ও নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী চলতে তোমাদের মনে দ্বিধা নেই বলে বল। অহিংসা নীতিকে তাচ্ছিল্য করার মত বা এর গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ করার কোনরকম ক্ষেত্র আছে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং অবিলম্বে কি প্রতিদান পাচ্ছ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তোমরা অহিংসানীতিকে জীবনে মূর্ত করার সাহস মনে আন। এতে অবশ্য তোমাদের বিশ্বাসের অগ্নি পরীক্ষা হবে। এর দ্বারা তোমরা শুধু ভারতের মুক্তি আনবে না, একজন মানুষের পক্ষে সমগ্র মানবতাকে সর্বাধিক প্রেয় যে সেবা দেওয়া সম্ভব, তাই তোমরা দেবে এবং মহাপ্রাণ দয়ানন্দ স্বামীর ব্রতকেও

তোমরা এইভাবে সফল করবে। এই স্বদেশী মন্ত্রকে অতীব সক্রিয় শক্তি বলে জানবে এবং ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্লেষণ ও সতর্কতা সহকারে এর প্রয়োগ করতে হবে। অলসের জন্য এ ধর্ম নয়, সত্যের জন্য সানন্দে যারা জীবনপাত করবে, এ ধর্ম হচ্ছে শুধু তাদেরই। স্বদেশীর অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ; কিন্তু মনে হয় যে আমার বক্তব্য বোঝবার মত যথেষ্ট বলা হয়েছে। আমি শুধু এইটুকুই আশা করি যে তোমাদের মত দেশ-সংস্কারকের দল যথেষ্ট বিবেচনা না করে আমার কথাকে নাকচ করবে না। আর আমার কথা যদি তোমাদের মনঃপূত হয়ে থাকে তবে তোমাদের যে অতীত ইতিহাস আমি জানি, তাতে আমি আশা করব যে, আজ আমি যে শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে তোমাদের বললাম, সেই সত্যকে তোমরা নিজ জীবনে মূর্ত করবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে তোমাদের কর্মক্ষেত্র করবে।

কলেজী যুবক

বিগত দুই-তিন বৎসরে যে সব ছেলে কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছে তারা কি করে তা দেখতে হবে। কাজ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে জনসাধারণ কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের বিচার করে না বা করতেও পারে না। ব্যর্থতা এখানে ক্ষমা পায় না এবং এই বিচারকের বিচার হয় নিক্তির ওজনে। গুরুকুল এবং জনসাধারণ দ্বারা সমর্থিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত বিচার হবে এই ভাবে। কলেজ ছেড়ে যেসব ছাত্র জীবনের বন্ধুর ক্ষেত্রের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের উপর তাই গুরুদায়িত্ব। তারা যেন সতর্ক হয়। সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এই মহান পরীক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁরা এই কথাটি জেনে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন যে, প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে এই যে, ফল হবে গাছের মত। গাছটি তো এখন দেখতে সুন্দর, যাঁরা এই বৃক্ষে বারি সিঞ্চন করেছেন, তাঁরা মহাপ্রাণ ব্যক্তি। এর ফল কেমন হবে তা নিয়ে এখন থেকে চিন্তার কি আছে ?

শরীর শ্রম ও সাফাই

গুরুকুলে প্রেমিক হিসাবে আমি এবার এর পরিচালনা সমিতি ও অভিভাবকদের কয়েকটি পরামর্শ দেব। গুরুকুলের ছেলেদের আত্মপ্রত্যয়শীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হলে তাদের প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পের শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের মত যে দেশে শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবি এবং সম্ভবত শতকরা আরও ১০ জন কৃষককুলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত, সেখানে আমার মতে কৃষিকার্য ও বুনাই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রতিটি যুবকের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ

হওয়া উচিত। হাতের কাজের হাতিয়ারপত্র ঠিক ভাবে চালাতে শিখলে বা একটুকরা কাঁচকে সোজাসুজি চিরতে জানলে অথবা ঠিকমত গুনিয়া টেনে মজবুত দেওয়াল গাঁথতে পারলে তো তার কোন ক্ষতি নেই। এই রকম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ছেলে জীবন সংগ্রামে কোন দিন নিজেকে অসহায় বোধ করবে না এবং কখনও সে বেকার থাকবে না। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শিশুপালন সম্বন্ধেও গুরুকুলের ছাত্রদের জ্ঞান থাকা দরকার। এখানকার মেলার সাফাইএর ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। মক্ষিকা বাহিনী দেখলেই সব কথা বোঝা যায়। এই সব দুর্দম সাফাইকার্য পরিদর্শকের দল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সাফাইএর ব্যবস্থা ত্রুটীশূন্য নয়। এরা আমাদের সোজাসুজি এই শিক্ষা দিচ্ছে যে ভুক্তাবশেষ এবং আবর্জনাসমূহ ঠিকভাবে মাটি চাপা দিতে হবে। আমার এই কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছিল যে, মেলার বাৎসরিক দর্শকদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাফাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেবার এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু একাজের সূচনা করতে হবে ছেলেদের দিয়েই। তাহলে কর্তৃপক্ষ এরপর বাৎসরিক সম্মেলনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনশত সাফাই বিজ্ঞান শিক্ষক পাবেন। সর্বশেষে বললেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে এই যে, অভিভাবক এবং পরিচালন সমিতি যেন তাঁদের ছেলেদের ইউরোপীয় পোশাকের অন্ধ অনুকরণ করতে দিয়ে ও আধুনিক বিলাসের দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে ধ্বংসের রাস্তা না খুলে দেন। ভবিষ্যত জীবনে তারা এসবের ফলে কষ্ট পাবে এবং এসব আচরণ ব্রহ্মচর্যনীতি বিরুদ্ধও বটে। আমাদের মধ্যে যেসব কুপ্রথা বিদ্যমান, তার বিরুদ্ধেই তাদের যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হবে। তাদের লোভ বাড়িয়ে দিয়ে সে সংগ্রামকে আমরা যেন কঠোরতর না করি।

৩। ছাত্রদের প্রতি উপদেশ *

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং প্রিয় বন্ধুবর্গ,

আমার এবং আমার পত্নীর প্রশংসার জন্য মাদ্রাজ সত্য সত্যই ইংরাজী ভাষার শব্দ-সম্ভার উজাড় করে প্রয়োগ করেছে এবং আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

* ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল ওয়াই, এম, সি, এতে প্রদত্ত বক্তৃতা, অনারেবল শ্রীযুক্ত ডি, এস, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কোথায় আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহ, ভালবাসা যত্ন বর্ষণ করা হয়েছে, তাহলে আমাকে বলতেই হবে যে, তা হচ্ছে মাদ্রাজ। (হর্ষধ্বনি) তবে প্রায়ই আমি একথা বলে থাকি যে এটা হচ্ছে মাদ্রাজের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আপনারা যে অতুলনীয় মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অকৃপণভাবে এইরকম প্রীতির ধারা প্রবাহিত করবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আমি যে সার্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির শিক্ষানবিশ, স্বয়ং তার সুযোগ্য সভাপতি মহোদয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করায় এবারে আমার প্রতি মাদ্রাজের স্নেহ ও সৌজন্যের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে মনে করছি। আমি কি এসবের যোগ্য? অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুধু প্রবল কণ্ঠের "না" কথাটি এর জবাবস্বরূপ ধ্বনিত হচ্ছে। তবে আমি ভারতবর্ষে এসেছি, আপনারা যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করবেন তার যোগ্য হতে এবং আমি যদি সুযোগ্য সেবক হতে চাই, তাহলে আমার সমগ্র জীবনকে অবশ্যই এর যোগ্য হবার জন্য উৎসর্গ করতে হবে।

আপনারা একটু পূর্বে স্থললিত ছন্দে গ্রথিত আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন এবং তখন আমরা সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। মাতৃস্বরূপা ভারতবর্ষকে বর্ণনা করার জন্য কবি তাঁর বিশেষণের ভাণ্ডার বোধহয় শূন্য করে ফেলেছেন। ভারতমাতাকে তিনি সুহাসিনী, সুমধুরভাষিনী, সুখদা, বরদা, সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এবং অতীতের স্বর্ণযুগের নরনারী অধ্যুষিত দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদের নয়নের সম্মুখে এমন এক পবিত্র ভূমির চিত্র অঙ্কন করছেন, যে দেশ সমগ্র বিশ্বকে তার কণ্ঠলগ্ন করবে এবং আসুরিক শক্তির দ্বারা নয়, আত্মিক বলে এই দেশ সমগ্র মানব সমাজকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে। এই মন্ত্র কি আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে? নিজেকে আমি প্রশ্ন করি: "এ মহাসঙ্গীত শ্রবণকালে আমার কি উঠে দাঁড়াবার অধিকার আছে?" কবি অবশ্য আমাদের অনুভূতি শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য এমন একটি আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন, যার শব্দগুলি বর্তমানে ভবিষ্যৎ-কল্পনার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির রূপ বর্ণনায় কবি যে সব শব্দ নিচয় প্রয়োগ করেছেন, তাদের বাস্তব ক্ষেত্রে মূর্ত করার দায়িত্ব পড়েছে ভারতের আশাস্থল তোমাদের উপর। আজ হয়তো মনে হতে পারে যে মাতৃভূমির রূপ বর্ণনে এই সব বিশেষণ ব্যবহার করা অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু কবি আমাদের মাতৃভূমির জন্য যে গৌরব দাবী করেছেন, তার যথার্থতা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর।

মাদ্রাজ তথা সমগ্র ভারতের ছাত্রগণ ! তোমরা কি এমন এক শিক্ষা গ্রহণ করছ, যা তোমাদের পূর্বোক্ত মহান আদর্শ সাধনে সহায়তা দেবে এবং তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণরাজির বিকাশ ঘটাবে, না তোমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু সরকারী কর্মচারী ও সওদাগরী অফিসের কেরানী উৎপাদন করার যন্ত্রস্বরূপ ? সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরি সংগ্রহ করাই কি শুধু তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য ? এই যদি তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হয় এবং একে যদি তোমরা নিজ জীবনের আদর্শ-রূপে বরণ করে থাক, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, কবির মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যে কল্পনা ছিল, তা কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। তোমরা হয়তো শুনেছ বা হয়তো আমার রচনাবলী দ্বারা অবগত হয়েছ যে, আমি আধুনিক সভ্যতার প্রবল বিরোধী। ইউরোপে যা চলেছে আমি তার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তোমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, বর্তমান সভ্যতার পদভারে ইউরোপ ত্রাহি রব ছাড়ছে, তাহলে সেই সভ্যতাকে আমাদের মাতৃভূমিতে আমদানি করার আগে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বজদের গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। তবে আমাকে কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, আমাদের শাসকরা সেই সভ্যতা এ দেশে আমদানি করার ফলে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্তধারণা পোষণ করো না। এক মুহূর্তের জন্যও আমি একথা মনে করি না যে নিজেরা দীক্ষিত হতে না চাইলে আমাদের শাসকরা সে সভ্যতাকে আমাদের দেশে প্রবর্তন করতে পারে এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমাদের শাসকরা এই সভ্যতাকে আমাদের সামনে পেশ করল ; তাহলেও আমি বলব যে আমাদের ভিতর এমন শক্তি আছে যার বলে শাসকদের বাতিল না করেও আমরা সে সভ্যতাকে বর্জন করতে পারি। (হর্ষধ্বনি) বহুবার বক্তৃতা উপলক্ষ্যে আমি বলেছি যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের মধ্যে রয়েছে। কেন যে তারা আমাদের মাঝে আছে সে সম্বন্ধে আজ আমি আলোচনা করব না। তবে আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের মুখে ভারতের যেসব প্রাচীন ঋষিদের কথা শুনলেন, তাঁদের পথে চললে আমরা এই মহান ব্রিটিশ জাতির মারফৎ বিশ্বে এক নবীন বাণী প্রচার করতে পারব। এ বাণীর সঙ্গে আসুরিক শক্তির সম্বন্ধ নেই, এ হবে প্রেমের বাণী। তারপর আপনারা রক্তপাত বিনা শুধু উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিজয়ীদের জয় করবেন। আজকে ভারতে যেসব ঘটনা ঘটছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে রাজনৈতিক হত্যা এবং ডাকাতির সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস এ পদ্ধতি বিদেশ থেকে আমদানি করা এবং এদেশে কোন দিনই

এসব শিকড় গাড়তে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ছাত্রসমাজ যাতে এজাতীয় সন্ত্রাসবাদের প্রতি মানসিক বা নৈতিক সমর্থন না জানায় তার জন্য তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। একজন অহিংস প্রতিরোধকারী হিসাবে আমি তোমাদের এর বিকল্প একটি আয়ুধ দেব। নিজেকে সন্ত্রস্ত করে তোল, আত্মানুসন্ধান কর। অত্যাচার ও অবিচার যেখানেই দেখবে তার প্রতিরোধ কর। তোমাদের স্বাধীনতা খর্বকারী প্রতিটি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগে সংগ্রাম কর, কিন্তু তার জন্য অত্যাচারীর রক্তপাত করার প্রয়োজন নেই। আমাদের ধর্মের শিক্ষা এ নয়। আমাদের ধর্মের ভিত্তি অহিংসার উপর এবং এর সক্রিয় রূপ হচ্ছে ভালবাসা। এ ভালবাসা শুধু প্রতিবেশীর প্রতি নয়, এ প্রেম শুধু সুহৃদের জন্য নয়, শত্রুর প্রতিও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে এ প্রেমের ধর্ম।

এ বিষয়ে আর একটি কথা বলব। আমার মনে হয় সত্য ও অহিংসা আচরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে হবে যে আমরা যেন নির্ভীকতার পূজারী হই। আমরা যদি দেখি আমাদের শাসকবর্গ অন্যায় করছেন এবং আমাদের যদি মনে হয় যে রাজদ্রোহী আখ্যা পেলেও আমাদের পরামর্শ শাসকদের গোচরীভূত করা উচিত, তাহলে আমি বলব যে তোমরা রাজদ্রোহই প্রচার কর। তবে দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়ে তোমরা এ কাজ করবে। যখন দেখা যাবে যে তোমরা কৃতকর্মের ফলভোগে প্রস্তুত অথচ কারও প্রতি অন্যায় আঘাত হানছ না, আমার মনে হয় যে তখন তোমাদের ভিতর সরকারকেও তোমাদের পরামর্শ শুনতে উদ্বুদ্ধ করার শক্তি জন্মাবে।

অধিকার ও কর্তব্য

আমি নিজেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুক্ত করেছি; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রজার সঙ্গে সমান অংশীদার হবার দাবী আমার আছে। আজ আমি সেই সমান অংশীদারত্ব দাবী করি। আমি কোন পদানত জাতির লোক নই। নিজেকে আমি পরাধীন জাতির লোক বলি না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, ব্রিটিশ শাসকরা তোমাদের এ অধিকার দেবে না; এ অধিকার তোমাদের অর্জন করতে হবে। কোন জিনিস চাইবার এবং নেবার ক্ষমতা আমার আছে। আমার পক্ষে এটা সম্ভব শুধু নিজ কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা। ম্যাক্সমূলার বলেছেন (অবশ্য আমাদের নিজ ধর্মের ব্যখ্যার জন্য ম্যাক্সমূলারের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই) আমাদের ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে ক-র্ত-ব্য, এই তিনটি শব্দের উপর। অ-ধি-কা-র নামক চারটি শব্দের উপর নয়। এবং তোমরা যদি মনে কর যে,

আমরা যা কিছু চাই, তা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা পেতে পারি, তাহলে সর্বদা এই পথেই চিন্তা করতে হবে ও এপথে সংগ্রাম করার সময় ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। এই বাণীই আমাকে আমার গুরু (এবং হয়তো আপনাদেরও গুরুও) গোখলে আমাদের দিয়েছেন। তাহলে এই বাণীর স্বরূপ কি? সারভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির নিয়মাবলীর পুস্তকে এই নীতি-বাক্য লেখা আছে এবং এই বাণী অনুসারে আমি নিজ জীবন পরিচালন করতে চাই। দেশের রাজনৈতিক জীবন ও প্রতিষ্ঠানে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার করাই হচ্ছে সেই বাণী। এই আদর্শকে কার্যান্বিত করার জন্য আমাদের অবিলম্বে অগ্রসর হতে হবে। ছাত্ররা রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত থাকতে পারে না। তাদের কাছে রাজনীতি ধর্মের মতই অপরিহার্য। রাজনীতিকে ধর্মনীতির থেকে পৃথক করা যায় না। আমি জানি যে তোমরা হয়তো আমার মত মেনে নেবে না। কিন্তু আমার অন্তরের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে ভাবের আলোড়ন হচ্ছে, আমি শুধু তারই পরিচয় দিতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকায় লব্ধ অভিজ্ঞতার আধারে আমি তোমাদের এই কথা দৃঢ়তা সহকারে বলতে পারি যে আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শ-বিহীন তোমাদের দেশবাসীর ভিতর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাচীনকালের ঋষিদের তপশ্চর্যার প্রভাব থাকায় ইংরাজী সাহিত্যের একটিমাত্র কথাও জানা না থাকা সত্ত্বেও এবং বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তারা পূর্ণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অশিক্ষিত এবং অক্ষর পরিচয়হীন দেশবাসীর পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, তার অন্তত দশগুণ তোমাদের ও আমাদের পক্ষে ভারতের এই পুণ্যভূমিতে আজ করা সম্ভব। তোমরা এবং আমি যেন সেই গৌরবের অধিকারী হতে পারি। (হর্ষধ্বনি)

৪। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা *

বন্ধুগণ,

এখানে পৌঁছাতে খুব বেশী দেরি হবার জন্য আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমরা যদি শোন যে এই বিলম্বের জন্য আমি বা কোন মানুষ দায়ী নয়, তাহলে আমার বিশ্বাস তোমরা আমাকে অবিলম্বে ক্ষমা করবে (হাস্য)। ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি যেন কোন সার্কাসের জন্তু এবং আমার রক্ষণাবেক্ষণকারীরা আমার প্রতি করুণার আধিক্যে প্রায়ই জীবনপথের এই কথাটা ভুলে যান যে মানুষের

* ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ।

জীবনে দুর্ঘটনারও স্থান আছে। এই ক্ষেত্রে তাঁদের এবং আমাদের বাহনটিকে পরপর যেসব দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তার কথা তাঁরা পূর্ব হতে হিসাব করেন নি। তার ফল স্বরূপ এই বিলম্ব।

সুহৃদবৃন্দ! এইমাত্র যে মহিলা (শ্রীমতী বেসান্ত) তাঁর অতুলনীয় বাগ্মীপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন, তার বক্তৃতার প্রভাবে তোমরা যেন এ ভুল করো না যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং এই নব-নির্মীয়মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রছায়ায় জ্ঞানার্জনের জন্য যেসব যুবক-যুবতীর আসার কথা, তারা এখানকার পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করে এক মহান সাম্রাজ্যের দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। তোমরা যেন এ জাতীয় কোন ভুল ধারণা নিয়ে এখান থেকে না যাও। আজকে সন্ধ্যায় আমার বক্তৃতা তোমাদের এই ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে। তোমরা যদি এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা মনে করে থাক যে, যে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এ দেশ প্রসিদ্ধ এবং যে কারণে এ দেশের জুড়ি কোথাও নেই, সেই আধ্যাত্মিক জীবনের পরশ শুধু মুখের কথায় অন্যের ভিতর এনে দেওয়া যায়, তাহলে সানুনয়ে আমি তোমাদের বলব যে তোমরা ভুল করছ। ভারত একদিন বিশ্বকে যে নবীন বাণী শোনাবে, তা শুধু মুখের কথায় হবে না। নিজেই আমি ভাষণ ও বক্তৃতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তবে গত দুদিন যাবৎ এখানে এই ধরণের যে সব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, তা প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। কিন্তু এ কথাও আমি তোমাদের বলব যে, আমাদের বক্তৃতাবাজীর অবসান ঘনিয়ে আসছে এবং এখন শুধু দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে খোরাক দিয়ে কাজ শেষ হবে না, এবার আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন সৃষ্টি করতে হবে এবং আমাদের হস্তপদাদি অঙ্গ সঞ্চালন করতে হবে। গত দুইদিন যাবৎ আমরা শুনেছি যে, ভারতীয় চরিত্রের সরলতা বজায় রাখার জন্য হৃদয়ের সঙ্গে একতালে হস্তপদের সঞ্চালন করা আমাদের পক্ষে কত প্রয়োজন। কিন্তু এ তো হল আমার বক্তব্যের ভূমিকা।

আজ সন্ধ্যায় এই পবিত্র নগরীতে এই মহান বিদ্যাপীঠের ছত্রছায়ায় যে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে আমি এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমার মনোভাব স্বদেশবাসীর কাছে ব্যক্ত করছি বলে আমার লজ্জা ও অপমানের সীমা নেই। এই দুইদিন ধরে যেসব ছাত্র এই বক্তৃতা শ্রবণ করছে, আমাকে যদি তাদের পরীক্ষা নিতে হয়, তবে আমি জানি যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই অকৃতকার্য হবে। এর কারণ কি? কারণ বক্তৃতা তাদের মর্মস্পর্শ করে নি। গত ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে বিরাট অধিবেশন হয়, আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। এখানকার চেয়েও অনেক বেশী দর্শক সেখানে ছিল এবং তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, শুধু হিন্দুস্থানীতে

প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিই বোম্বের সেই বিপুল সংখ্যক দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। স্মরণ রেখো যে, এই ঘটনা ঘটেছিল বোম্বেতে, বেনারসের মত সকলে যেখানে হিন্দী বলে, সেখানে নয়। ইংরাজীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন ভাষার যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, বোম্বের আঞ্চলিক ভাষা এবং হিন্দীর মধ্যে সেই ব্যবধান নেই। সুতরাং কংগ্রেসের অধিবেশনে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী হিন্দী বক্তৃতা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিল। আমি আশা করি যে ছাত্ররা যাতে নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমাদের ভাষা হচ্ছে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি এবং তোমরা যদি বল যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে আমাদের ভাষা দুর্বল, তবে আমার মতে যত তাড়াতাড়ি ধরাপৃষ্ঠ থেকে আমাদের অস্তিত্ব মুছে যায়, ততই মঙ্গল। আমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে মনে করে ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান ইংরেজী পাবে? (না—না ধ্বনি) জাতির চলার পথে এই দাবী সৃষ্টি করা কেন? একবার ভেবে দেখ যে ইংরেজ ছেলেদের তুলনায় আমাদের ছেলেদের কি রকম বি-সম প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। পুণার জনকয়েক অধ্যাপকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁরা দৃঢ়তা সহকারে এই কথা জানালেন যে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হয় বলে প্রত্যেকটি ভারতীয় যুবককে জীবনের ছয়টি মূল্যবান বৎসর নষ্ট করতে হয়। প্রতিটি স্কুল ও কলেজে যে সংখ্যক ছাত্র পড়ে, তাকে ছয় দিয়ে গুণ দিলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, জাতির কত সহস্র বৎসর অপচয় হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, আমাদের প্রেরণাশক্তি নেই। বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করার জন্য এমন মূল্যবান সময় নষ্ট করলে আর প্রেরণাশক্তি আসবে কোথা থেকে? সুতরাং এ প্রচেষ্টায় আমরা ব্যর্থতা বরণ করে নিই। গতকাল এবং আজকের বক্তাদের মধ্যে মিঃ হিগিনবুথামের মত আর কারও পক্ষে কি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় জয় করা সম্ভবপর হয়েছে? শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে দাগ কাটতে সমর্থ না হবার অপরাধ পূর্বোক্ত বক্তাদের নয়। তাঁদের বক্তৃতায় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মনের খোরাক ছিল। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে নি। আমি অনেককে এ কথা বলতে শুনেছি যে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তো জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করেছেন। এর বিপরীত ঘটাটাই আশ্চর্যের বিষয়। দেশের একমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে ইংরাজীর মাধ্যমে। তাই নিঃসন্দেহেই এর কিছু না কিছু ফল দৃষ্টি-গোচর হবেই। কিন্তু আমরা যদি গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেতাম, তাহলে এর পরিণাম কি হত? আজ আমরা তাহলে স্বাধীন দেশের নাগরিক হতাম এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ গৃহে পরবাসীর মত

হত না, জাতির প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে তাঁদের যোগ থাকত। দেশের দীন-দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁরা কাজ করতে সমর্থ হতেন এবং এই অর্ধ শতাব্দীতে তাঁরা যা অর্জন করতেন, তাকে সমগ্র জাতির সম্পদ ও ঐতিহ্য আখ্যা দেওয়া যেত। (হর্ষধ্বনি) আজ শিক্ষিতবর্গের অর্ধাঙ্গীরা পর্যন্ত তাঁদের স্বামীর মহানতম চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন। অধ্যাপক বসু এবং অধ্যাপক রায়ের গৌরবময় গবেষণার উদাহরণ নিন। এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে তাঁদের গবেষণা সর্বসাধারণের সম্পত্তি নয়?

এবার অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

কংগ্রেস স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং মুসলীম লীগও তাদের কর্তব্য সম্পাদনার্থ এই জাতীয় কোন বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করবে। তবে একথা স্বীকার করতে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই যে, এর কি ফল হবে সে সম্বন্ধে আমি মোটেই আগ্রহান্বিত নই। ছাত্রসমাজ বা আমাদের জনসাধারণ কি করে, আমি তাই দেখতে উৎসুক। শুধু কাগজ-কলমের দৌড়ে কখনও স্বায়ত্বশাসন লাভ করা যায় না। যতই বক্তৃতার স্রোত ছুটান যাক না কেন, তার ফলে আমাদের স্বায়ত্বশাসনের যোগ্যতা অর্জিত হয় না। শুধু আমাদের চরিত্রবলই আমাদের এর যোগ্যতা দেবে। (হর্ষধ্বনি) ভবিষ্যতে কি ভাবে আমরা দেশ শাসন করব? আজ আমি আপনাদের সঙ্গে এক সাথে হৃদয় মন্থন করতে মনস্থ করেছি। বক্তৃতা দেওয়া আজ আমার উদ্দেশ্য নয় এবং আজ সন্ধ্যায় আপনাদের যদি মনে হয় যে, আমি কিছু রেখে ঢেকে বলছি না, তাহলে আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা একে এমন একজন ব্যক্তির মনোরাজ্যের অর্গল মুখে ধরা বলে ভাববেন যে কিনা আজ সবার সাথে একত্র বসে হৃদয় মন্থন করতে চায়। আপনাদের যদি মনে হয় যে এ পথে চলতে গিয়ে আজ আমি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করছি, তাহলে আপনারা আমাকে এর জন্য মার্জনা করবেন, এই আমার নিবেদন। কাল সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম এবং বিশ্বনাথের গলি দিয়ে হাঁটার সময় আমার মনে নিম্নস্বরূপ চিন্তার উদয় হল:—হঠাৎ যদি আকাশ থেকে কোন আগন্তুক এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে যদি আমাদের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করতে হয়, তাহলে তার পক্ষে আমাদের নিন্দা করাটাই কি স্বাভাবিক নয়? এই মহান দেব-দেউল কি আমাদের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি নয়? হিন্দু হিসাবেই আমি একথা বলছি। আমাদের এই পবিত্র দেবালয়ের গলিগুলি কি এত নোংরা থাকা উচিত? এর চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহগুলির কোন শ্রী-ছাঁদ নেই। গলিগুলি সর্পিল এবং সংকীর্ণ।

মন্দিরগুলি পর্যন্ত যদি প্রশস্ততা এবং পরিচ্ছন্নতার নিদর্শন না হয়, তবে স্বায়ত্ব-শাসনের ফলে আর কি হবে? যাবতীয় লটবহরসহ ইংরেজরা স্বেচ্ছায় বা চাপে পড়ে, যেমন ভাবেই হোক ভারতভূমি ছেড়ে গেলেই কি আমাদের মন্দিরগুলি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির আকর হবে?

কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সহমত যে, স্বায়ত্ব-শাসনের কথা ভাবার আগে এর জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। প্রত্যেক নগর দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি সেনানিবাস অঞ্চল এবং অপরটি আসল শহর। এই শহর নামক অংশটি এক পূতিগন্ধময় নরকস্বরূপ। জাতি হিসাবে আমরা নাগরিক জীবনে অনভ্যস্ত। শহরে থাকতে হলে নিরুদ্বিগ্ন গ্রাম্যজীবনের অনুকরণ করলে চলবে না। উপর থেকে নিষ্ঠীবন পড়ার আশঙ্কা নিয়ে যে বোম্বাইএর ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের পথচারীদের চলাফেরা করতে হয়, এ চিন্তা করতেও আমার অস্বস্তি বোধ হয়। আমি যথেষ্ট রেলভ্রমণ করে থাকি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধাসমূহ আমি লক্ষ্য করে দেখি। তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য শুধু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করলেই চলবে না। পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক নিয়মগুলিও আমরা জানি না। গাড়ীর মেঝেতে যেখানে সেখানে আমরা থুথু ফেলি এবং কখনও চিন্তা করি না যে, সময় সময় ঐ মেঝের উপর শোওয়া হয়। মেঝেতে কি করছি তা আমরা ভাবি না এবং তার ফলস্বরূপ কামরাটি অবর্ণনীয় আবর্জনা স্তূপে ভরে ওঠে। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর যাত্রীবর্গ তাঁদের অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যশালী ভ্রাতৃবৃন্দকে এড়িয়ে চলেন। এদের ভিতর আমাদের ছাত্র সমাজকেও আমি দেখেছি। সময় সময় তাঁরাও এর চেয়ে শ্রেয় আচরণের নিদর্শন দেখাতে পারেন না। তাঁরা ইংরাজী বলে এবং নরফোক্ জ্যাকেট গায়ে দেন বলে তাঁদের জোর করে গাড়ীতে ওঠার অধিকার আছে এবং বসার জায়গা পাবার দাবী আছে বলে তারা মনে করেন। সর্বত্র আমি সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছি এবং আপনারা আজ আপনাদের সামনে আমার মনের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি আমার হৃদয় আপনাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করছি। আমাদের স্বায়ত্ব-শাসনাভিমুখী অগ্রগতির পথে নিঃসন্দেহে এসব দোষ সংশোধন করতে হবে।

এবার অপর একটি দৃশ্যের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। গতকাল আমাদের বিতর্ক সভায় সভাপতিত্ব করার কালে মহামান্য কাশীর নরেশ মহোদয় ভারতের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু যে বিরাট সামিয়ানার নিচে বসে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কি বক্তব্য আছে? নিঃসন্দেহেই সেখানে এক মহা আড়ম্বর-

পূর্ণ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়। মণিমানিক্য ও জড়োয়ার যে প্রদর্শনী হল তাতে প্যারিসের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিবান রত্ন-বণিকেরও চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। এইসব বহুমূল্য বসনভূষণে আবরিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের তুলনা করে ধনীক সমাজকে আমার বলতে ইচ্ছা করে, "আপনারা এইসব হীরা জহরৎ নিজ অঙ্গ থেকে খুলে ফেলে আপনাদের স্বদেশীয় ভারতবাসীদের জন্য অছিরূপে এসব ধনরত্নের রক্ষণাবেক্ষণ না করলে ভারতের মুক্তি নেই।" (শুনুন, শুনুন ও হর্ষধ্বনি) আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মহামান্য সম্রাট বা লর্ড হার্ডিঞ্জ কেউই নিশ্চয় চান না যে, সম্রাটের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশের জন্য আমাদের রত্নালঙ্কারের পেটিকা শূন্য করে আপাদমস্তক ভূষণ শোভিত হয়ে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। যদি বলেন তবে আমার জীবন সংশয় করেও আমি স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের কাছ থেকে এই মর্মে এক নির্দেশ আনাতে পারি। ব্রিটিশ ভারত বা আমাদের মহান রাজন্যবর্গ শাসিত অঞ্চল, যেখানেই কোন বিরাট সৌধ নির্মিত হচ্ছে বলে আমি শুনি, আমি অবিলম্বে ঈর্ষিত হয়ে উঠি এবং মনে মনে, বলি, "ও, এ অর্থ তো কৃষককুলের কাছ থেকে এসেছে।" দেশের শতকরা পঁচাত্তর জনেরও বেশী কৃষিজীবি এবং গত রাত্রে মিঃ হিগিনবুথাম তাঁর স্থললিত ভাষায় আমাদের জানিয়েছেন যে, এরাই একটি দানার বিনিময়ে শস্যের দুটি শীষ সৃষ্টি করে। এদের পরিশ্রমের প্রায় সমস্তটাই যদি আমরা নিয়ে নিই বা অপরকে নিতে দিই, তাহলে আমাদের ভিতর স্বায়াত্বশাসনের ভাবধারা বিদ্যমান বলে বলা চলবে না। আমাদের মুক্তি আসবে এই কৃষককুলের ভিতর দিয়ে। আইনজীবি, চিকিৎসক বা ধনী জমিদারদের দ্বারা মুক্তির আবাহন হবে না।

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবার আলোচনা করা আমার কর্তব্য বসে বোধ করছি। গত দুই তিন দিন যাবৎ এ বিষয়টি আমাদের সকলের হৃদয়কেই আলোড়িত করেছে। বড়লাট যখন কাশীর রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমরা অনেকেই সশঙ্কচিত্তে ছিলাম। বহু জায়গায় গোয়েন্দার ঘাঁটি ছিল। আমাদের মনে আতঙ্ক ছিল। মনে আমাদের প্রশ্ন জাগছিল, "এই অবিশ্বাস কেন? এইভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় দিনাতিপাত করার চেয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের কি মৃত্যুবরণ করা অধিকতর কাম্য নয়?" তবে এক মহান রাজাধিরাজের প্রতিনিধির হয়ত মৃত্যুবরণে ইচ্ছা নেই। তিনি হয়ত জীবন্মৃত অবস্থায় থাকাই প্রয়োজন বোধ করেন। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে এইসব গোয়েন্দা চাপিয়ে দেবার অর্থ কি? আমরা এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারি, এর জন্য বিচলিত হতে পারি বা হয়তো এর প্রতিবাদ করতে পারি; কিন্তু আমাদের ভুলে

গেলে চলবে না যে বর্তমান ভারত অশান্তচিত্ততা বশতঃ একদল রাজদ্রোহীর জন্ম দিয়েছে। নিজে আমি একজন রাজদ্রোহী; তবে তা অন্যরকমের! কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন একশ্রেণীর রাজদ্রোহী আছেন, যাঁদের কাছে আমার কথা পৌঁছালে আমি বলতাম যে, ভারতকে যদি বিজেতাকে জয় করতে হয়, তবে ভারতে তাঁদের রাজদ্রোহের পদ্ধতির কোন স্থান নেই! ও পন্থা ভয়ের নিদর্শন। আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হই ও তাঁকে ভয় করি, তাহলে রাজা মহারাজা, বড়লাট বা এমন কি সম্রাট পঞ্চম জর্জ আদি কাউকে আর ভয় করার প্রয়োজন থাকে না। দেশাত্মবোধের জন্য রাজদ্রোহীদের আমি সম্মান করি, মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত বলে তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাঁদের আমার জিজ্ঞাস্য এই—"হত্যাকরা কি সম্মানজনক কার্য? গৌরবজনক মৃত্যু বরণ করার পূর্বে কি নিজ হস্তকে রক্তপিয়াসী ছুরিকায় শোভিত করা খুবই বাঞ্ছনীয়?" আমি একথা মানি না। কোন শাস্ত্রে এর স্বপক্ষে কিছু কথিত হয়নি। আমার যদি মনে হয় যে ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংরেজদের এদেশ ত্যাগ করা উচিত এবং তাদের বিতাড়িত করা প্রয়োজন, তবে দ্বিধাহীনচিত্তে আমি ঘোষণা করব যে, তাদের যেতে হবে এবং আমার মনে হয়, প্রয়োজন হলে সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার মতে তাকে সম্মানজনক মৃত্যু আখ্যা দেওয়া চলবে। বোমা নিক্ষেপকারী গোপনে ষড়যন্ত্র রচনা করে এবং তারা আত্মপ্রকাশে ভীত। তারা ধরা পড়লে ভ্রান্তপথে পরিচালিত উদ্যমের মূল্য পরিশোধ করে শোকাবহভাবে। অনেকে আমাকে বলেন, "এ যদি না আমরা করতাম এবং কিছু লোক যদি বোমা না ছুঁড়ত, তবে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে আমদের জয় হ'ত না।" (শ্রীমতী বেসান্ত, "দয়া করে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করুন")। বাঙলা দেশে মিঃ লিয়নের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাতেও আমি ঠিক এই কথাই বলেছিলাম। আমার মনে হয় আমার বক্তব্য বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য আমাকে যদি বক্তৃতা বন্ধ করতে বলা হয় আমি সে নির্দেশ মান্য করব। (সভাপতির দিকে ফিরে) আমি আপনার নির্দেশ প্রত্যাশী। আপনি যদি মনে করেন, যে ভাবে এবং যে বিষয়ে আমি বলছি তাতে দেশ ও সাম্রাজ্যের কোন উপকার হবার নয়, তাহলে আমার বক্তৃতার পরিসমাপ্তি ঘটাব। (চীৎকার: বলুন, বলুন) (সভাপতি আপনার মনোভাব বুঝিয়ে বলুন) আমার উদ্দেশ্য আমি ব্যাখ্যা করছি। আমি শুধু (পুনর্বার বাধাপ্রাপ্তি)। বন্ধুগণ! এ বাধার জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না। এখন যদি শ্রীমতী বেসান্ত আমাকে বক্তৃতা বন্ধ করতে বলেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনিও ভারতবর্ষকে গভীর ভাবে ভালবাসেন এবং তিনি মনে করেন যে, এই নবযুবক

সমাবেশে আমার হৃদয় মন্থন করে আমি ভুল করছি। যাই হোক, আমার বক্তব্য এই যে, আমি ভারতবর্ষকে এই দু'তরফা অবিশ্বাসের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে চাই। আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে আমাদের পারস্পারিক প্রীতি ও বিশ্বাসের বনিয়াদের উপর রচিত এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হবে। নিজ নিজ গৃহে দায়িত্বহীনভাবে কোন কথা বলার চেয়ে এই কলেজের ছত্রছায়ায় এ বিষয়ে আলোচনা করা কি শ্রেয় নয়? এসব কথার খোলাখুলি ভাবে চর্চা করা আমি অনেক ভাল বলে মনে করি। ইতিপূর্বে এ পদ্ধতিতে আমি চমৎকার ফললাভ করেছি। আমি জানি যে এমন কোন বিষয় নেই যা কিনা ছাত্ররা আলোচনা করে না। এমন কোন বিষয় নেই ছাত্ররা যা জানে না। সেই কারণে আমি সন্ধানী আলোর রশ্মি নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। মাতৃভূমির সুযশ আমার কাছে এত প্রিয় বলেই আমি আজ আপনাদের সঙ্গে এভাবে ভাব বিনিময় করলাম এবং আমি আপনাদের বলব যে ভারতে সন্ত্রাসবাদের স্থান নেই। শাসকদের আমরা যা বলতে চাই, তা আমরা স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে বলব এবং তার জন্য তাঁদের বিরাগভাজন হলে তার ফলভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকব। কিন্তু আমরা যেন কাউকে গালাগালি না দিই। কয়েকদিন পূর্বে আমি একজন বহুনিন্দিত সিভিল সার্ভিস বিভাগের ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে আমি কদাচিৎ একাত্মতা বোধ করি; তথনি আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনার পদ্ধতির প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা মিঃ গান্ধী, আপনি কি মনে করেন যে সিভিল সার্ভিসের আমরা প্রত্যেকেই খারাপ এবং যাদের আমরা শাসন করতে এসেছি, তাদের উপর অত্যাচার করাই আমাদের লক্ষ্য?" আমি বললাম, "না।" তিনি তখন বললেন, "তাহলে আপনি সময় ও সুযোগ মত কখনও এই বহুনিন্দিত সিভিল সার্ভিস বিভাগ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি প্রশংসা সূচক বাক্য উচ্চারণ করবেন।" আজ আমি সেই প্রশংসার কথাটি বলতে চাই। একথা সত্য যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অনেকে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর পীড়ক ও অত্যাচারী। সময় সময় তাঁদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের সম্বন্ধে আরও বহুবিধ বিশেষণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব আমি স্বীকার করি এবং একথাও আমি মানি যে কয়েক বৎসর ভারতে থাকার পর তাঁদের মধ্যে অনেকের অধঃপতন ঘটে। কিন্তু এর দ্বারা কি সূচিত হয়? এখানে আসার আগে তাঁরা ভদ্র ছিলেন এবং সেই নৈতিকতার কিয়দংশ যদি লোপ পেয়ে থাকে, তবে তা আমাদের দোষে হয়েছে। (না-না ধ্বনি) নিজেরাই ভেবে দেখুন না কেন। একজন লোক যদি কাল পর্যন্ত ভাল ছিল এবং আজ আমার সঙ্গে

মেশার পর খারাপ হয়, তাহলে কার দোষ—তার না আমার? ভারতে পদার্পণ করা মাত্র যে তোষামোদ, চাটুকারিতা এবং মিথ্যার পরিবেশ তাঁদের পরিবেষ্টন করে, এ দোষ তার এবং সেই পরিবেশের প্রভাবে আমাদের মধ্যে অনেকেই উৎসন্নে যেতে পারি। সময় সময় নিজের কাঁধে দোষ নেওয়া ভাল। স্বায়ত্বশাসন অর্জন করতে হলে এ দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। স্বায়ত্বশাসন কোনদিনই, কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তারা স্বাধীনতা প্রিয় হলেও যে জাত নিজেরা স্বাধীনতা না অর্জন করবে, তাদের তারা স্বাধীনতা দেবে না। আগ্রহ থাকলে বুয়র যুদ্ধ থেকে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে যারা সে সাম্রাজ্যের শত্রু ছিল আজ তারা মিত্রে পরিণত হয়েছে।

(এই অবস্থায় আবার বক্তৃতায় বাধা পড়ল এবং মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিরা উঠে দাঁড়ানোতে এখানেই বক্তৃতার আকস্মিক বিরতি হল।) *

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সংযোজন (১)

বেনারসের ঘটনা †

নিউ ইণ্ডিয়া এবং অপর কয়েকস্থলে শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত বেনারসের ব্যাপারের যে আলোচনা করেছেন; তার জন্য একেবারে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে সে প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। রাজন্যবর্গের সঙ্গে তিনি যে নিম্নকণ্ঠে অলোচনা করেছিলেন, আমার বক্তব্য শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত অধিকার করেছেন। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে নিজের চক্ষু কর্ণকে যদি আমার বিশ্বাস করতে হয়, তবে আমার বক্তব্যে আমি অবিচল থাকব। অনুষ্ঠানের সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের উভয়দিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে আমন্ত্রিতবর্গ বসেছিলেন এবং শ্রীমতী বেসান্ত ছিলেন বামদিকের অর্ধবৃত্তের ভিতর। একজন তো বটেই, সম্ভবত দু'জন দেশীয় নরেশ তাঁর পাশে ছিলেন। আমার বক্তৃতার সময় তিনি প্রায় আমার পিছনে পড়ে যান। মহারাজ যখন উঠেন, তখন তিনিও উঠে দাঁড়ান। রাজন্যবর্গ মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবার আগেই আমি বক্তৃতা বন্ধ করি। বিনম্রভাবে আমি তাঁকে জানাই যে তিনি আমার বক্তৃতায় বাধা না দিলেই

*নটেশন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত "স্পীচেস্ এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী" পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ হইতে।

†কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁর বক্তৃতায় কিভাবে বাধা পড়ে সে সম্বন্ধে গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদপত্রের বিবৃতি।

পারতেন। তবে আমার বক্তব্য তাঁর মনঃপুত না হলে বক্তৃতার শেষে তিনি যে এর সঙ্গে সহমত নন, একথা জানিয়ে দিতে পারতেন। তিনি কিন্তু খানিকটা উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, "আপনি মঞ্চোপরি উপবিষ্ট আমাদের সকলকে এক অস্বস্তিকর ও অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় ফেলার পরও কি আমাদের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব? আপনার ওসব কথা বলার দরকার ছিল না।" বেনারসের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে আমার জন্য উদ্বেগ বোধ করাতেই তিনি শুধু আমার বক্তৃতায় বাধা দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনাতে তো তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি বলব যে তিনি যদি শুধু আমার নিরাপত্তা কামনা করতেন, তবে আমাকে একটি চিরকুটে লিখে বা কানে কানে একথা জানিয়ে সাবধান করে দিতে পারতেন। আর তা ছাড়া আমাকে রক্ষা করার জন্য এসব করে থাকলে তাঁর রাজন্যবর্গের সঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর এবং তাঁদের সাথে বক্তৃতা গৃহ ছেড়ে চলে যাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

আমি এখনও জানি না যে আমার বক্তৃতায় এমন কি ছিল, যার জন্য তাঁর কাছে সে বক্তৃতা এমন আপত্তিজনক মনে হল এবং তাঁর পক্ষে বক্তৃতায় বাধা দেওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। বড়লাটের পরিদর্শনের কালে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করার পর আমি এই কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছিলাম যে, হত্যাকারীর মৃত্যু মোটেই গৌরবের নয় এবং বলেছিলাম যে, সন্ত্রাসবাদ আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থবিরোধী ও ভারতে এর স্থান নেই! এরপর আমি এই কথা বলেছিলাম যে, গৌরবজনক মৃত্যুর কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে; কারণ সেইসব ব্যক্তি নিজ আদর্শের জন্য মরণ বরণ করেছে। কিন্তু গোপনে বহুবিধ ষড়যন্ত্র করার পর একজন বোমা নিক্ষেপকারী যখন মারা যায়, তখন সে কি পায়? এরপর আমি এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে অগ্রসর হই যে, বোমা নিক্ষেপকারীর প্রচেষ্টা ছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আমরা সফল হতাম না। এই অবস্থাতে শ্রীমতী বেসান্ত আমার বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য সভাপতির কাছে আবেদন করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার এ বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা কাম্য বলে মনে করি। কারণ তার ধারা থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, আমার বক্তৃতায় ছাত্রদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করার মত কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ কঠোর আত্ম-সমীক্ষার আগ্রহদ্বারা চালিত হয়েই আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

সেদিনের বক্তৃতা আমি এই বলে সুরু করেছিলাম যে, আমার ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া শ্রোতৃমণ্ডলী এবং আমার নিজের পক্ষেও লজ্জার কথা। আমি বলেছিলাম যে, শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজী হওয়ার ফলে দেশের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।

আমার মনে হয়, আমি একথা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলাম যে বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের মতৃভাষার মাধ্যমে পেলে আমরা এতদিনে প্রায় আমাদের লক্ষ্যে পৌছে যেতাম। অতঃপর আমি এবারের কংগ্রেস অধিবেশনে যে স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করি যে, অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা অখিল ভারত মুসলীম লীগ যখন ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করবে তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজ আচরণ দ্বারা নিজেদের স্বায়ত্বশাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। আমাদের লক্ষ্যের কতদূরে আমরা আছি তার নিদর্শন পেশ করার জন্য আমি কাশী বিশ্বনাথের পবিত্র মন্দিরের নিকটস্থ সর্পিল গলিগুলির অপরিচ্ছন্নতা এবং সম্প্রতি যেসব প্রাসাদোপম অট্টালিকা পথের ঋজুতা বিস্তারের কথা চিন্তা না করেই যেন-তেন-প্রকারেন নির্মিত হয়েছে, তার প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তদনন্তর আমি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে যে মণ্ডপ রচিত হয়েছিল, তার আড়ম্বরের প্রতি সভাজনদের মনযোগ আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে, আমাদের ধনীক সম্প্রদায় যেভাবে রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয়ে এসেছেন, তাতে এদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন আগন্তুক এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার পর এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যাবেন যে ভারত বিশ্বের অন্যতম সম্পাদশালী দেশ। এরপর রাজা মহারাজদের লক্ষ্য করে কথঞ্চিৎ রসিকতা সহকারে আমি তাঁদের এই পরামর্শ দিই যে, আমরা লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন তাঁদের রত্নালঙ্কারসমূহ জাতির অছিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং আমি এর সমর্থনে জাপানী রাজবংশীয়-দের উদাহরণ পেশ করি। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বংশপরম্পরা প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি এবং ধনরত্ন বিলিয়ে দেওয়া গৌরবের কাজ বলে মনে করেন। অতঃপর আমি আমাদের মাননীয় অতিথি বড়লাট বাহাদুরকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে, সেই অবমাননাকর দৃশ্যের প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারপর আমি এই কথাই সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলাম যে, এইসব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য আমরাই দায়ী; কারণ ভারতে সুসংগঠিতভাবে যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চলছে, তার জন্যই এই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এইভাবে একদিকে আমি দেখাচ্ছিলাম যে কেমন ভাবে ছাত্র সম্প্রদায় সামাজিক কদাচার দূর করার কাজে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং অন্যদিকে এমনকি তাদের চিন্তা জগতেও যেন হিংস-পদ্ধতি বিজয়ী না হয়, তার চেষ্টা করছিলাম।

গত বিশ বৎসর যাবৎ আমি জনসেবার ক্ষেত্রে আছি এবং এর মধ্যে আমাকে

অসংখ্যবার উত্তেজিত জনতার মাঝে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আধারে আমি দাবী করছি যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোভাব বোঝার মত কিছুটা ক্ষমতা আমার আছে। আমার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া আমি সতর্কভাবে লক্ষ্য করছিলাম এবং স্পষ্ট দেখেছি যে আমার বক্তৃতায় ছাত্রদের মাঝে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়নি। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে অনেকে পরদিবস আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানায় যে, তারা আমার দৃষ্টিকোণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে এবং আমার কথা তাদের মনে দাগ কেটেছে। তাদের ভিতর একজন কূটতার্কিক ছিল এবং সে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করার পর এই ধারায় আরও কিছু আলোচনা শুনে আমার মতে বিশ্বাসী হয়। এযাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলণ্ড এবং ভারতে আমি বহুসংখ্যক স্বদেশীয় ছাত্রের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিনের সন্ধ্যার যুক্তিতর্ক পেশ করে দেখেছি যে, তাদের মধ্যে অনেকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছে।

সর্বশেষে আমি বোম্বাইএর শ্রী এস. ডি. সেটলারের কথা বলব। ইনি সেদিনকার ঘটনার বিবরণ "হিন্দু" পত্রিকাতে লিখেছেন। তাঁকে মোটেই আমার বন্ধুভাবাপন্ন আখ্যা দেওয়া চলে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে তিনি সম্পূর্ণ অসঙ্গতভাবে আমাকে "তুলো-ধোনা" করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য শ্রীমতী বেসান্তের থেকে ভিন্ন। তাঁর মতে লোকের মনে এই ধারণা সৃষ্ট হয় যে, আমি সন্ত্রাসবাদীদের মোটেই প্রোৎসাহন দিই নি ; বরং আমলাতান্ত্রিক সিভিলিয়ানদের সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতি শ্রীযুক্ত সেটলারের যাবতীয় আক্রমণ এই কথাটিই প্রমাণ করে যে, হিংসাকে প্রোৎসাহন দেবার মত কোন অপরাধ আমি করিনি ; বরং রত্নালঙ্কারাদির কথা তোলাই আমার দোষ হয়েছিল।

আমার এবং শ্রীমতী বেসান্ত, উভয়ের প্রতিই ন্যায় বিচার করার উদ্দেশ্যে আমি নিম্নলিখিত পরামর্শ দেব। তিনি বলেছেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ঠিক কোন্ বাক্যটির জন্য রাজন্যবর্গ উঠে দাঁড়ান, তা বলবেন না। কারণ তাতে তিনি শত্রুপক্ষের ফাঁদে পড়ে যাবেন। তাঁর পূর্ব বিবৃতি অনুযায়ী আমার বক্তৃতার অনুলিপি ইতিপূর্বে গোয়েন্দাদের হাতে চলে গেছে এবং তাই আমার নিরাপত্তার দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর মৌনতার আর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। অতএব তাঁর কাছে যদি আমার বক্তৃতার যথাযথ অনুলিপি থাকে, তাই অথবা আমার যে কথার ফলে তাঁর আমাকে বাধা দেওয়া এবং রাজন্যবর্গের সভাস্থল ছেড়ে চলে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লো, অন্ততঃ তার সারমর্ম প্রকাশ করা কি শ্রেয়স্কর নয়?

সুতরাং আমি এই বিবৃতি শেষ করার সময় আমার পূর্ব কথনের পুনরাবৃত্তি করে

বলব ঃ শ্রীমতী বেসান্তের কাছ থেকে বাধা না পেলে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করতাম এবং তাহলে সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমার মনোভাব নিয়ে কোন ভ্রান্তধারণার উদ্রেক হতো না। *

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সংযোজন (২)

বেনারসের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ †

মহাত্মাজীর পরবর্তী জীবনে বেনারসের ঘটনা যথেষ্ট প্রভাব রেখে যায় বলে এই অবকাশে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেনারসে বক্তৃতা দেওয়ার কালে গান্ধীজী কয়েকবার শ্রীমতী বেসান্তের নিকট থেকে বাধাপ্রাপ্ত হন। ইনি গান্ধীজীর পূর্বে তাঁর বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চোপরি উপবিষ্টা ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে বলার আগেই বক্তৃতার মাঝখান থেকে কয়েকটি কথা ও ধুয়ো শুনে ভ্রান্তধারণাপরবশ হয়ে শ্রীমতী বেসান্ত এইভাবে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেন। শ্রীমতী বেসান্তের মান ও মর্যাদা গান্ধীজীর চেয়ে বেশীই বলা যায়; অথচ তিনি সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে গান্ধীজীকে বক্তৃতা থামাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তিনি এমন কি উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী এবং বিশেষতঃ হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজের উপস্থিত ছাত্রবৃন্দকে সাবধান করে দেন যে, তারা যেন বক্তার কথায় কান না দেন এবং তাঁর উপদেশ গ্রহণ না করেন; কারণ তাঁর মতে বক্তা তাঁদের ভুল পথে পরিচালিত করছেন। এই হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজের ছাত্ররাই হচ্ছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ এবং এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী হওয়ায় ছাত্রদের তিনি মাতৃস্বরূপা। গান্ধীজী কিছুক্ষণ নীরব রইলেন; কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর বক্তব্য শোনার আগ্রহ প্রকাশ করল। তিনি এরপর শ্রীমতী বেসান্তের সদিচ্ছার প্রশংসা করলেন এবং যথোচিত বিনয় সহকারে অনুষ্ঠানের সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের দিকে ফিরে যুক্ত করে জানতে চাইলেন যে তিনি তাঁর কথা বলবেন না থেমে যাবেন? ইতোমধ্যে সভামঞ্চোপরি উপবিষ্ট সকলে নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন এবং দেশীয় নৃপতিবর্গ ও ইংরেজ রাজকর্মচারীগণ শ্রীমতী বেসান্তসহ একযোগে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। সভাপতি মহোদয় অবশ্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে গান্ধীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করছিলেন এবং তিনি এর মধ্যে আপত্তিকর কোন কিছু বা অন্যায় খুঁজে পান নি। সেই কারণে

* "স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী" পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হইতে। নটেশন কোম্পানী।

† শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "গান্ধী মাহাত্ম্য" হইতে

তিনি গান্ধীজীকে বলার অনুমতি দিয়ে জানালেন যে, তিনি যেন মাঝপথে বক্তৃতা বন্ধ না করেন। অতএব এরপর গান্ধীজী প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এই গ্রন্থের সম্পাদক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং একটি পত্রিকায় সভার বিবরণ পাঠাবার জন্য সাংবাদিকের জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীমতী বেসান্ত তাঁকে গুরুতররূপে অবমাননা করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রতি যে রকম মধুর আচরণ করেন, তাতে আমি চমৎকৃত হই। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীমতী বেসান্তের আচরণ মোটেই সমর্থন করেনি। তারা বরং এর তীব্র প্রতিবাদ করে এবং তাঁর এই অনাহুত বাধাদানের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী তারা জ্ঞাপন করে। সত্যিকথা বলতে গেলে মহাত্মা গান্ধীই আন্তরিক ও গভীর ভাব-ব্যঞ্জনামূলক শব্দসম্ভার প্রয়োগে সেই মাননীয়া বৃদ্ধা মহিলার পক্ষ সমর্থন করে সেদিন শ্রীমতী বেসান্তকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন, তাঁর বিশ্বাস আছে যে, শ্রীমতী বেসান্ত তাঁরই মতো ছাত্রদের হিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অমন করেছেন। এই গ্রন্থের সম্পাদক তার জীবনে এই প্রথমবার প্রত্যক্ষ করল যে ঐরূপ গভীর অন্যায় অভিযোগের সামনেও মানুষ কিভাবে এরকম অবিচল থাকতে পারে। বস্তুতঃ ঐ ঘটনার পর থেকেই আমার মনে মহামানব গান্ধীজীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি হয়। সে সভা থেকে আমি এই শিক্ষা নিয়ে ফিরলাম যে, চেষ্টা করলে মানুষ নিজেকে কত উঁচুতে ওঠাতে পারে। ঐরূপ এক সংকটজনক মুহূর্তে সভার কার্য পরিচালনা করার জন্য সভাপতি মহোদয় যে রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তিনিও যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

৫। আর্থিক বনাম নৈতিক প্রগতি *

আর্থিক উন্নতির সঙ্গে কি আসল উন্নতির সংঘাত বাধে? আমি ধরে নিচ্ছি যে আর্থিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে অপরিমিত আধিভৌতিক উন্নতি এবং আসল উন্নতির অর্থ হচ্ছে আমাদের শাশ্বত বৃত্তিগুলির ক্রমোন্নতি। বিষয়টিকে তাই এইভাবে বলা যেতে পারে যে, নৈতিক প্রগতি কি আধিভৌতিক প্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না? আমি অবশ্য জানি যে আমাদের বর্তমান সমস্যার তুলনায় এ

* এলাহাবাদের মুইর সেণ্ট্রাল কলেজের ইকনমিক সোসাইটিতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর গান্ধীজী প্রদত্ত বক্তৃতা।

বিষয়টি ব্যাপকতর। তবে সাহস করে আমি একথা বলতে পারি যে ক্ষুদ্রতর কিছুর ভিত্তিস্থাপনাকালে আমাদের দৃষ্টিপথে বৃহত্তর একটা কিছুই বিরাজিত থাকে। কারণ বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে আমরা জানি যে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শাশ্বত শান্তি বা বিরাম বলে কিছুই নেই। তাই আধিভৌতিক প্রগতি এবং নৈতিক উন্নতির সঙ্গে যদিও সংঘাত না বাধে, তবু নৈতিক উন্নতির তুলনায় আধিভৌতিক উন্নতিরই অধিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। বৃহত্তর বিষয়বস্তুর পক্ষ সমর্থনে অক্ষম কেউ কেউ যেমন এলোমেলো ভাবে সময় সময় নিজেদের কথা পেশ করেন, তেমন ভাবে আমরা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি না। পরলোকগত স্যার উইলিয়ম উইলসন হান্টার বর্ণিত অর্ধাশনে জীবনযাপনকারী ত্রিশকোটী ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখে তাঁরা বোধ হয় বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে এদের নৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করা বা বলার আগে, এদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে হবে। তাঁরা বলেন যে এই জন্য নৈতিক উন্নতির বদলে আধিভৌতিক প্রগতির উপর জোর দেওয়া হয়। আর তারপরই একটা মস্ত লাফ মারা হয় ও বলা হয় যে ত্রিশকোটীর বেলায় যে কথা খাটে, সারা বিশ্বের বেলায়ও সে কথা খাটবে। তাঁরা ভুলে যান যে মামলা ঘোরালো হলে আইনও জটিল হয়। এই অনুমান যে কতখানি অবাস্তব তা বলা আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে নৈতিক অবনতি ছাড়া যে অন্য কিছু আর আসতে পারে না, এমন কথা কেউ কখনও বলেনি। প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে, আর তাই নিজের অন্নবস্ত্র এবং বাসস্থানের জোগাড় করারও তার অধিকার আছে। তবে এই সামান্য কাজটুকুর জন্য অর্থ-নীতিবিদ বা তাদের আইনকানুনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার যাবতীয় ধর্মগ্রন্থেই এই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে "আগামীকালের জন্য ভাবনা কোরো না"। জীবিকা অর্জন করা, যে কোন সুসংগঠিত সমাজে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ মনে হয় বা হওয়াই বিধেয়। বস্তুত কোটীপতিদের সংখ্যা দ্বারা নয়, জনসাধারণের মধ্যে অনশনের অপ্রতুলতা দ্বারা একটি দেশের সুসংবদ্ধতা নিরূপিত হয়। এখন বিচার্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আধিভৌতিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে নৈতিক উন্নতি—এই কথাটি বিশ্বজনীন নীতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। ইহজাগতিক বিভবে রোম যখন অতীব সমৃদ্ধিশালী, তখনই তার নৈতিক অধঃপতন ঘটল। মিশর এবং বোধ হয় যে সমস্ত দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের বেশীর ভাগেরই অনুরূপ অবস্থা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং আত্মীয়রা যখন ধনকুবের তখনই তাঁদের পতন হয়। রকফেলার বা কার্নেগী ইত্যাদির নৈতিকতা যে সাধারণ পর্যায়ের ছিল, এ কথা

আমরা অস্বীকার করি না, তবে সানন্দে আমরা তাঁদের একটু শিথিল ভাবেই বিচার করে থাকি। আমার একথার অর্থ হচ্ছে এই যে তাঁদের কাছে পরিপূর্ণ নৈতিক নিরিখ আমরা আশা করতে পারি না। তাঁদের কাছে আধিভৌতিক উন্নতির অর্থ সবসময় নৈতিক উন্নতি নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, আমি লক্ষ্য করেছি যে যেখানে যত প্রাচুর্য সেখানে তত নৈতিক ভ্রষ্টাচার। বেশী কথা কি, আমাদের ধনিকবর্গ দরিদ্রদের মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধরূপ নৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন নি। ধনীদের আত্মসম্মানে গরীবদের মত অত আঘাত লাগে নি। বিপদের আশঙ্কা না থাকলে আমাদের আশেপাশের লোকদের মধ্যে থেকে আমি দেখাতে পারতাম যে কেমন ভাবে ধনসম্পদ থাকায় সত্যকার উন্নতির ব্যাঘাত হয়। সাহস করে আমি একথা বলতে পারি যে অর্থনীতির নিয়মকানুনের ব্যপারে এ বিষয়ে অনেক আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে দুনিয়ার ধর্মগ্রন্থসমূহ অধিকতর নিরাপদ এবং প্রামাণ্য। আজ যে প্রশ্ন আমরা নিজেদের করছি, তা মোটেই নতুন নয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে একথা যীশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সেণ্ট মার্ক দৃশ্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। গম্ভীর হয়ে যীশু উপবিষ্ট। চোখে তাঁর স্থির সঙ্কল্পের ছবি। পরকাল সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করছেন। চতুর্দিকের বিশ্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্ তিনি। সময় ও দূরত্বের মিতব্যয়িতায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং তিনি উঠেছিলেন এ সবের উর্ধ্বে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে একজন তাঁর কাছে দৌড়ে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়ল এবং জিজ্ঞাসা করল, "দয়ালু প্রভু, কি করলে আমি শাশ্বত সুখ পেতে পারি?" যীশু তাকে বলছেন, "আমাকে দয়ালু বলছ কেন তুমি? সেই এক ঈশ্বর ছাড়া দয়ালু আর কেউ নেই। তাঁর আজ্ঞা তুমি জান। অধর্মাচার কোরো না। জীবহত্যা কোরো না, চুরি কোরো না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। কাউকে প্রতারিত কোরো না এবং নিজের মাতাপিতাকে সম্মান দিও।" এর জবাবে লোকটি তাঁকে বলল, "প্রভু, আমার যৌবনকাল থেকেই আমি এসব মেনে চলছি।" তখন যীশু তার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "একটি জিনিসের অপ্রতুলতা তোমার মধ্যে আছে। তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রের দান কর এবং তাহলে স্বর্গে গিয়ে তুমি সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। ফিরে এসে দুঃখ সহন কর আর আমাকে অনুসরণ কর।" এই কথায় বিষণ্ণ হয়ে লোকটি চলে গেল; কারণ সে ছিল প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে যীশু তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য করে বললেন,

"ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীরা কদাচিৎ প্রবেশ করতে পারে।" তাঁর শিষ্যবৃন্দ এ কথায় আশ্চর্যান্বিত হ'ল, কিন্তু যীশু এর জবাব প্রসঙ্গে পুনরায় বললেন, "বৎসগণ, আর্থিক সম্পদের শ্রেষ্ঠতায় যারা আস্থাবান তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। ধনীর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে বরং সূচের ফুটো দিয়ে গলে যাওয়া সহজ।" ইংরেজী সাহিত্যে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত জীবনের শাশ্বত নীতির বর্ণনার এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত। আজ আমরা যেমন অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়ি, তাঁর শিষ্যরাও সেইরকম করেছিল। আমাদেরই মত তাঁকে তারা বলেছিল, "কিন্তু দেখুন, বাস্তব জীবনে এ নীতি কেমন অকার্যকরী। আমরা যদি সব বিক্রী করে দিই, আর যদি কিছুই আমাদের না থাকে, তবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার মতও কিছু আমাদের থাকবে না। অর্থ না থাকলে আমরা পরিমিত পরিমাণেও ধর্মচারী হতে পারি না।" সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম : "খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল : 'তা'হলে প্রাণ পেতে পারে কে ?' তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে যীশু বললেন, "মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব ; কিন্তু ভগবানের কাছে নয়। কারণ তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।" তারপর পিটার তাঁকে বলতে লাগলেন : "দেখুন, আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করছি।" উত্তরে যীশু বললেন : "প্রকৃতই আমি তোমাদের বলছি যে এমন কেউ নেই যে আমার জন্য বা ধর্মের খাতিরে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, পিতা, মাতা, ভগ্নী বা জমিজমা এবং ঘর ইত্যাদি পরিত্যাগ করেছে। পরলোকে তারা শাশ্বত সুখ পাবে বা এখানকার চেয়ে শতগুণে গৃহ, আত্মীয়, ভগ্নী, পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং জমিজমার সুখ ভোগ করতে পারবে এই আকাঙ্ক্ষায় তারা এসেছে। আজ যারা সবচেয়ে আগে আছে তারা হয়ত পিছনে পড়ে যাবে, আর যারা একেবারে পিছনে পড়ে আছে তারাই হয়তো থাকবে সর্বাগ্রে।" এ বিধান অনুসরণ করার ফল বা পুরস্কার (কথাটি যদি আপনাদের মনোমত বোধ হয়) হচ্ছে এই। অন্যান্য অহিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করি না। যীশু বর্ণিত নীতির সমর্থনে আমাদের নিজেদের মুনি-ঋষিদের লেখা বাণী উদ্ধৃত করে, বা এমন কি বাইবেলের যে অংশটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তার চেয়েও কড়া তাঁদের কোন বাণী বা লেখা উদ্ধৃত করে, আমি আপনাদের অপমানিত করতে চাই না। আমাদের সামনে যে প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে জগতের মহান উপদেশকবৃন্দের জীবনই বোধহয় এই নীতি সমর্থনকারী সবচেয়ে প্রামাণ্য সাক্ষ্য। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবির, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদির সহস্র সহস্র লোকের উপর অতুলনীয় প্রভাব ছিল এবং তাঁরা তাদের চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাঁরা এ পৃথিবীতে এসে-

ছিলেন বলে জগৎ ধন্য। আর স্বেচ্ছায় তাঁরা সবাই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক উন্মত্ততাকে যতই আমরা আমাদের আদর্শ বলে মনে করছি, অবনতির পথে ততটাই আমরা নেমে যাচ্ছি—এই যদি আমার স্থির বিশ্বাস না হ'ত, তবে যে বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য আমি এত চেষ্টা করছি, তা করতাম না। আমার ধারণা এই যে, যে ধরণের অর্থ নৈতিক উন্নতির কথা আমি বলেছি, তা সত্যকার উন্নতির পরিপন্থী। তাই পুরাকালের আদর্শ ছিল সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সংযত করা। এর ফলে যাবতীয় আধিভৌতিক কামনা বাসনার পরিসমাপ্তি হয়ে যায় না। বরাবরের মত আমাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবেন, ধনার্জনের প্রচেষ্টাকেই যাঁরা জীবনের লক্ষ্য করে তুলবেন। কিন্তু চিরকালই আমরা দেখে আসছি যে এতে আদর্শচ্যুতি হয়। একটি মজার ব্যাপার এই যে আমাদের মধ্যে প্রভূত বিত্তশালীরাও সময় সময় মনে করেন যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিলে তাঁরা ভাল করতেন। কেউ যে একই সঙ্গে ঈশ্বর এবং কুবেরের সেবা করতে পারে না, এ এক মূল্যবান অর্থনৈতিক তথ্য। আমাদের পথ বেছে নিতে হবে। বস্তুতান্ত্রিকতা-দানবের পদতলে পড়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ আর্তনাদ করছে। তাদের নৈতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে গেছে। টাকা, আনা, পয়সা দিয়ে তারা তাদের উন্নতির পরিমাপ করে, আমেরিকার সম্পদ তাদের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা অন্যান্য দেশের হিংসার পাত্র হয়ে উঠছে। আমার বহু স্বদেশবাসীকে আমি বলতে শুনেছি যে আমরা আমেরিকার মত সম্পদ অর্জন করব বটে, তবে তাদের সম্পদ অর্জনের পন্থাকে বর্জন করব। আমার মতে এরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। একই সঙ্গে আমরা "জ্ঞানী, শান্ত এবং ক্রোধোন্মত্ত" হতে পারি না। নৈতিক বলে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ হতে নেতৃবৃন্দ আমাদের শিক্ষা দিন—এই আমি চাই। কথিত আছে যে এক সময় আমাদের দেশ ঈশ্বরের বাসস্থান ছিল। যে দেশ কলকারখানার বিকট আওয়াজে এবং চিম্‌নির ধোঁয়ায় ভরে গেছে এবং যে দেশের রাস্তাগুলিতে চলাচলে বাধা সৃষ্টিকারী এমন সব দ্রুতগতি যান্ত্রিক শকট চলে, যার অন্যমনস্ক যাত্রীসমূহ জানে না যে তারা কি চায়, এবং পাথরের মত বাক্স-বন্দি করলে বা একেবারে অপরিচিত আগন্তুকদের মধ্যে পড়লেও যাদের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না এবং যে দেশের যাত্রী এবং আগন্তুকবর্গ সম্ভব হলে পরস্পর পরস্পরকে স্থানচ্যুত করতে উদ্‌গ্রীব, সে দেশে ঈশ্বরের কথা ধারণাও করা যায় না। আধিভৌতিক প্রগতির প্রতীক বলেই এসবের আমি উল্লেখ করলাম। কিন্তু এতে এক কণাও সুখ আসে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেশ

নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

"অতীতের যে সমস্ত প্রাচীনতম তথ্যরাজি আমরা পেয়েছি, তাতে এই কথার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যে নৈতিকতা সম্বন্ধে তৎকালীন সাধারণ ধারণা ও চিন্তাধারা, নৈতিকতার মান এবং এর ফলে উদ্ভূত আচার-ব্যবহার, এখনকার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।"

আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ইংরেজ জাতি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এর পরে কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "সম্পদের এইরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধি হওয়ায় ও প্রকৃতিকে জয় করার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে, আমাদের নতুন সভ্যতা ও অগভীর খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর মারাত্মক চাপ পড়েছে। এর ফলে বহুবিধ সামাজিক ব্যভিচার অভূতপূর্ব বিস্ময়কর গতিতে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে।" কেমনভাবে নরনারী এবং শিশুর মৃতদেহের উপর কলকারখানা সমূহ গড়ে উঠেছে এবং কেমনভাবে দেশের অর্থসম্পদের সমৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতি ঘটেছে, এ তিনি এর পরে দেখিয়েছেন। অপরিচ্ছন্নতা, আয়ুক্ষয়-কারী বৃত্তি, ভেজাল দেওয়া, ঘুষ নেওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন। আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ন্যায় কিভাবে পদদলিত হচ্ছে, পানাসক্তি এবং আত্মহত্যার ফলে মৃত্যুহার কেমনভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, কেমনভাবে অপরিণত অবস্থায় জন্মহারের পর ও জন্মদোষসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা বাড়ছে এবং বেশ্যাবৃত্তি একটি বিধিসম্মত প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এসবই তিনি দেখিয়েছেন। নিম্ন-লিখিত অর্থব্যঞ্জক মন্তব্য সহকারে তিনি তাঁর বিশ্লেষণের পরিসমাপ্তি করেছেন: "সম্পদ এবং অবকাশের পরিণামের অপর দিকটি যে কি, তা জানা যায় বিবাহ বিচ্ছেদের আদালতের কার্যবিবরণী থেকে। এ ছাড়া আমার একটি বন্ধু, লণ্ডনের বিলাসী সমাজে যাঁর যথেষ্ট যাতায়াত আছে, আমাকে বলেছিলেন যে, লণ্ডন এবং মফঃস্বলে সময় সময় এমন সব বহু প্রকারের নৈশকালীন প্রমোদের ব্যবস্থা দেখা যায় যে, চরমতম ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্রাটদের রাজত্বকালীন ব্যবস্থাসমূহকেও সেগুলি ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমার বলার কিছুই নেই। রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পর থেকে কম বেশী এ অবস্থা চলেই আসছে, তবে বর্তমানে যাবতীয় সভ্যজাতির ভিতর নিঃসন্দেহেই যুদ্ধবিমুখতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু যখন অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট বোঝা এবং শান্তির স্বপক্ষের সদিচ্ছাপ্রণোদিত ঘোষণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আদর্শ হিসাবে শাসক সম্প্রদায়ের ভিতর নৈতিকতার লেশমাত্র নেই।"

ইংরেজদের আওতায় আমরা অনেক কিছু শিখেছি, তবে আমার দৃঢ়

বিশ্বাস এই যে যথার্থ নৈতিকতার ব্যাপারে ব্রিটেনের কাছ থেকে আমাদের শেখার মত বিশেষ কিছু নেই। বস্তুতান্ত্রিকতার ব্যারামের ফলে ব্রিটেন যে সমস্ত পাপাচারের আকর হয়ে উঠেছে সতর্ক না হলে আমরা সে সমস্তই আমাদের দেশে আমদানি করব। আমাদের সভ্যতা এবং নৈতিকতাকে আমরা যদি বজায় রাখি, অর্থাৎ গৌরবোজ্জল অতীত নিয়ে গর্ব না করে, আমাদের নিজেদের জীবনে সেই প্রাচীন নৈতিক গৌরবকে ফুটিয়ে তুলি, তবেই আমরা ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়েরই উপকার করব। শাসনকর্তা যোগাড় করে দেয় বলে যদি আমরা ইংলণ্ডের অনুসরণ করি, তবে তারা এবং আমরা উভয়েই অপমান ভোগ করব। আদর্শের সম্বন্ধে বা সে আদর্শকে চূড়ান্তরূপে বাস্তবে পরিণত করা সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। খাঁটি আধ্যাত্মিক জাতি আমরা তখনই হব, যখন স্বর্গের চেয়ে সত্য অধিক পরিমাণে আমাদের দেশে দৃষ্ট হবে, ক্ষমতা এবং সম্পদের জাঁকজমকের চেয়ে নির্ভীকতা বেশী হবে, এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে বদান্যতার স্থান উর্ধ্বে হবে। আমাদের গৃহ, প্রসাদ, এবং মন্দিরগুলিকে আমরা বিভবের আওতা থেকে মুক্ত করে সেগুলিতে নৈতিকতার নৈসর্গিক ধর্মের প্রবর্তন করতে পারলে ব্যয়বহুল এক সেনাদলের ভার না বহন করেও আমরা যে কোন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারব। আমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর পবিত্রতার অন্বেষণ সুরু করলে দেখব যে তারপর সব কিছুই নিঃসন্দেহে পেয়ে যাব। এই হচ্ছে খাঁটি অর্থনীতি। আমরা সবাই যেন এ সঞ্চয় করতে পারি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একে প্রয়োগ করতে পারি।

৬। সত্যাগ্রহাশ্রম *

গত বৎসর যে সব ছাত্র আমার সঙ্গে এখানে আলোচনা করতে আসে, তাদের আমি বলেছিলাম যে ভারতের কোন এক জায়গায় আমি আশ্রম জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করতে চলেছি এবং আজ তোমাদের কাছে আমি সেখানকার কথাই বলব। শুধু এখনই নয়, আমার লোকসেবার জীবনে সদাসর্বদাই আমি এই কথাটি অনুভব করেছি যে চরিত্রগঠনই আমাদের কাছে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। অবশ্য পৃথিবীর সকল জাতিরই এর প্রয়োজন আছে, তবে

*১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের ওয়াই. এম. সি. এতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আমাদের চেয়ে বেশী প্রয়োজন বোধহয় আর কারও নেই। গোখলের মত মহান দেশপ্রেমিকেরও এই অভিমত, (হর্ষধ্বনি) তোমরা জান, গোখলে বহুবার বলেছেন যে আমাদের আকাজ্ক্ষার অনুরূপ চরিত্রবল না থাকলে কোন দিনই আমরা কিছু পাব না এবং পাওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করব না। এই কারণেই তিনি সার্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির পত্তন করেন। তোমরা দেখে থাকবে যে এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনে গোখলে জেনে শুনেই লিখেছেন যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে নৈতিকতার সঞ্চার করা প্রয়োজন। তোমরা এও শুনেছ যে তিনি প্রায়ই বলতেন যে, আমাদের দেশের গড়পড়তা চরিত্রবল ইউরোপের অনেক দেশের গড়ের চেয়ে কম। যাঁকে আমি আমার রাজনৈতিক গুরু মনে করি, তাঁর ঐ মন্তব্য সত্য-সত্যই যথার্থ কিনা এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে আমি একথা স্বীকার করব যে, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে ওকথা বহুল পরিমাণে সত্য। আমাদের মত শিক্ষিতবর্গ বহুবিধ ভুল করেছি বলেই আমি শুধু একথা বলছি না। আসলে আমরা সব অবস্থার দাস। যাই হোক, জীবন সম্বন্ধে আমি এই নীতি বাক্যটি গ্রহণ করেছি যে, সমাজের যত উচ্চস্তরেই অধিষ্ঠিত হোক না কেন, যে কোন ব্যক্তির যে কোন রকমের কাজের কোন মূল্যই থাকবে না, যদি নাকি তা ধর্মীয় ভাবনা-যুক্ত না হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে ধর্ম কি? এ প্রশ্ন লোকে অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করবে। আমি এর জবাবে বলব ঃ ধর্ম অর্থে বিশ্বের যাবতীয় শাস্ত্ররাজি-মন্থিত জ্ঞান নয় ; সত্যিকথা বলতে কি এর সঙ্গে মস্তিষ্কের অনুভূতির কোন সম্বন্ধ নেই, এ হচ্ছে হৃদয়ের ব্যাপার। এ জিনিস বাইরে থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার নয়, আমাদের ভিতর থেকেই এর বিকাশ করতে হবে। ধর্ম সদা সর্বদা আমাদের ভিতরে রয়েছে। কেউ এ সম্বন্ধে সচেতন, আবার কেউ বা অচেতন। কিন্তু এ জিনিস আমাদের ভিতর আছেই এবং তাই আমরা যদি উচিত পন্থায় স্থায়ী কিছু করতে চাই, তাহলে বাইরের সহায়তা বা অন্তরের বিকাশ, যে পথেই হোক, আমাদের ভিতরস্থ এই ধর্মীয় ভাবনাকে জাগ্রত করতে হবে।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কতকগুলি নিয়মকে জীবনের নীতি ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্বতঃপ্রকাশ সত্য বলে এগুলিকে আমাদের মেনে নিতে হবে। শাস্ত্রে বলে যে এইসব নীতি অনুযায়ী না চললে ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ অনুভূতি হওয়াই অসম্ভব। এই সুদীর্ঘকাল অবধি এই সমস্ত নীতিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসে এবং শাস্ত্রের এইসব নির্দেশকে নিজ আচরণে প্রয়োগ করার প্রযত্ন করার পর আজ আমার এই ধারণা হয়েছে যে, আমার সঙ্গে সমভাবে চিন্তাকারী ব্যক্তিদের সহ-যোগিতা পাবার জন্য এবার এজাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা প্রয়োজন। এই

আশ্রমের অধিবাসী হতে হলে যেসব নিয়মকানুন মানতে হবে বলে স্থির হয়েছে, এবার আমি সেগুলি তোমাদের জানাব।

এর মধ্যে পাঁচটিকে যাম আখ্যা দেওয়া হয় ও তার মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঃ

সত্য

এ সত্য বলতে সত্যের সাধারণ সংজ্ঞা অর্থাৎ যথাসম্ভব মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া বোঝায় না। "সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি" বলতে যা বুঝায় (অর্থাৎ সততা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি না হয় তবে এর থেকে বিচ্যুত হওয়া চলতে পারে) এ সত্যের তাৎপর্য তাও নয়। আমাদের ক্ষেত্রে সত্যের ধারণা হচ্ছে এই যে, জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপকে যে কোন মূল্যে সত্যনীতি দ্বারা চালনা করতে হবে। সত্যের এই ব্যাখ্যার আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন। সত্যের মর্যাদা রক্ষার্থ সে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস প্রকাশ করেছিল এবং কোন প্রতিশোধাত্মক কার্যকলাপ দ্বারা বা পিতৃদেব অনুসৃত পীড়ন পদ্ধতির অনুকরণ করে সে তাঁর দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায় নি। পিতা ও তাঁর অনুচরবর্গের কাছ থেকে প্রহ্লাদ যে আঘাত পেয়েছিল, তা ফিরিয়ে দেবার কথাকে মনে স্থান পর্যন্ত না দিয়ে প্রহ্লাদ সত্যের জন্য সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করতে উদ্যত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আঘাতের তীব্রতা হ্রাস করার জন্যও প্রহ্লাদ কোন প্রযত্ন করে নি। এর পরিবর্তে সস্মিত বদনে সে একের পর এক কঠোর অত্যাচার সহ্য করে গেছে এবং এর ফলে অবশেষে সত্যের জয় হয়েছে। তবে প্রহ্লাদের মনে এ ভাবনা ছিল না যে এ পীড়ন সহ্য করার ফলে তার জীবদ্দশাতেই কোন না কোন দিন সে সত্যপথের অভ্রান্ততা প্রমাণে সমর্থ হবে। কার্যত এমন ঘটলেও ঘটনাচক্রে প্রহ্লাদ যদি মাঝপথে মারাও যেত, তবু সে সত্যকেই আঁকড়ে থাকত। আমি চাই যে এই ধরণের সত্য অনুসরণ করা হোক। কালকের একটি ঘটনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ঘটনাটা অবশ্য খুবই অকিঞ্চিৎকর ; তবু এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হাওয়া কোনদিকে বইছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই ঃ—জনৈক বন্ধু একান্তে আমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চান এবং সেইজন্য গোপনে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেখানে হঠাৎ আর একটি বন্ধু উপস্থিত হলেন এবং বিনীতভাবে জানতে চাইলেন যে তাঁর উপস্থিতি আমাদের বার্তালাপে বাধা সৃষ্টি করছে কিনা। যাঁর সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, তিনি উত্তর দিলেন, "আরে না-না, এখানে গোপন বলে কিছু নেই।" আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ করলাম ; কারণ আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে যাওয়ায় আমি

বুঝতে পেরেছিলাম যে, অন্তত আগন্তুক দ্বিতীয় বন্ধুটির ক্ষেত্রে এ আলোচনা গোপনীয় ছিল। তিনি কিন্তু অবিলম্বে বিনয়ের খাতিরে (আমার মতে এটা অতি বিনয়) জবাব দিলেন যে কোন গোপন আলোচনা হচ্ছে না এবং দ্বিতীয় বন্ধুটি এতে যোগদান করতে পারেন। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে আমি সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছি এটা তার বহির্ভূত। আমার মতে বন্ধুটির উচিত ছিল অত্যন্ত ভদ্র অথচ স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তাঁকে বলা, "হ্যাঁ, এই সময়টুকুর জন্যে আপনার কথা ঠিক। আমাদের কথাবার্তায় একটু বাধাই পড়ছে।" সে বন্ধুটি ভদ্রভাবাপন্ন হলে তাঁকে বিন্দুমাত্র আহত না করে একথা বলা চলে এবং যতক্ষণ না স্বয়ং কেউ প্রমাণ করছেন যে তিনি ভদ্র নন, ততক্ষণ আমরা তো প্রত্যেককে ভদ্রলোক বলে ধরে নেব। কিন্তু অনেকে হয়তো বলবেন যে উপরিউক্ত ঘটনায় আমাদের জাতির সজ্জনতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে এর দ্বারা আমার বক্তব্য বেশী করে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিনয়বশতঃ যদি এ ধরণের কথাবার্তা বলা সুরু করি, তবে আমরা প্রতারকের জাতে পরিণত হব। জনৈক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে আমার একবার যে আলোচনা হয়েছিল তার কথা মনে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে আছেন এবং একটি কলেজের অধ্যক্ষতার কাজ করেন। আমরা দু'জনে একটি লেখা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। ইংরেজদের মত আমরা মনেপ্রাণে কোন কিছু না চাইলেও সাহস করে "না" বলতে পারি না—এ কথা আমি জানি কিনা তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করছি যে তৎক্ষণাৎ আমি এর জবাবে "হ্যাঁ" বললাম। তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলাম। যার সঙ্গে আমরা কথা বলি তাঁর বক্তব্যকে যথোচিত মর্যাদা দেবার জন্য আমরা খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে "না" বলতে ইতস্ততঃ বোধ করি। এই আশ্রমে আমাদের নিয়ম হচ্ছে—ফলাফল যাই হোক না কেন, মন না চাইলে আমাদের "না" বলতেই হবে। এইটি হচ্ছে প্রথম নিয়ম।

এরপরে আসছে—

অহিংসা

শব্দগত অর্থে অহিংসার অর্থ জীবহত্যা না করা। আমার কাছে কিন্তু এর অর্থ গভীর ও ব্যাপক। অহিংসা অর্থে শুধু জীবহত্যা থেকে বিরত থাকা বুঝালে আমার মন যেখানে উঠত, অহিংসার মৎকৃত ব্যাখ্যায় আমার আত্মা নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বলোকে সঞ্চরণ করে। অহিংসার যথার্থ অর্থ হচ্ছে কাউকে দুঃখিত না করা। এমন কি যে তোমাকে তার শত্রু মনে করবে, তার সম্বন্ধেও মনে কোন

রকম বিদ্বেষভাব পোষণ করা চলবে না। আমার অনুরোধ তোমরা এই চিন্তাধারার সতর্ক বিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য কর। "যাকে তুমি তোমার শত্রু মনে কর"—এমন কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি "যে তোমাকে তার শত্রু মনে করে।" কারণ যে অহিংসার পথে চলে, তার কোন বৈরী থাকার উপায় নেই। অরাতির অস্তিত্ব সে অস্বীকার করে। কিন্তু এমন অনেকে থাকতে পারে যারা নিজেদের তার শত্রু মনে করে এবং সে ব্যাপারে তার আর কি হাত আছে? এইজন্য আমি বলছি যে ঐ জাতীয় লোকের প্রতিও তার মনে যেন বিদ্বেষভাব স্থান না পায়। আঘাত ফিরিয়ে দিলে আমরা অহিংসনীতি বিচ্যুত হই। আমি কিন্তু আরও একটু এগিয়ে গেছি। আমরা যদি আমাদের কোন বন্ধু বা তথাকথিত শত্রুর কোন আচরণের বিরোধিতা করি তাহ'লে এই আদর্শের প্রতিপালন হ'ল না মনে করব। তবে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। বিরোধিতা না করতে বলার সময় আমি কিন্তু সে কাজে সহযোগিতা করার কথা বলি না। আমার কাছে বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে তার অকল্যাণ কামনা করা বা এই অভিলাষ পোষণ করা যে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় নয়, ঈশ্বরিক শক্তি জাতীয় অপর কারও প্রভাবে সেই তথাকথিত শত্রু যেন নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারে। আমাদের মনে যদি এই জাতীয় ভাবধারা জাগরূক হয়, তবে আমরা পূর্বকথিত অহিংসা নীতি থেকে বিচ্যুত হব। আমাদের আশ্রমে যারা যোগদান করবে, তাদের অহিংসার এই ব্যাখ্যা বর্ণে বর্ণে মেনে নিতে হবে। অবশ্য এর দ্বারা এই বোঝায় না যে এই নীতিকে আমরা এইভাবে পালন করি। এ তো অনেক দূরের কথা। এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবার ইচ্ছা রাখি এবং এই মুহূর্তেই যদি এই লক্ষ্যের পানে কুচ্ করার পূর্ণ সামর্থ্য আমাদের থাকত, তবুও অহিংসার এই ব্যাখ্যা আদর্শরূপেই বিরাজিত থাকত। কিন্তু এ তো আর জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা নয় যে মুখস্থ করে ফেলা যাবে বা উচ্চাঙ্গের গণিতের কোন সমস্যা নয় যে মাথা ঘামিয়ে তার সমাধান আবিষ্কার করা যাবে। নিঃসন্দেহেই এ বিষয় এসবের চেয়ে অনেক কঠিন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই জ্যামিতি বা গণিতের সমস্যাবলির সমাধানের জন্য দীর্ঘরাত্রি বাতির তেল পুড়িয়ে কাটিয়েছ। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানের জন্য তোমাদের তেল পোড়ানোর চেয়েও কঠিন কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে উপনীত হবার বা এর ধারেকাছে পৌঁছানোর আগে তোমাদের বহু নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাতে হবে এবং মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। ধর্মপথে চলার অর্থ বুঝতে হলে আমাদের এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে। এর কমে চলবে না। এই নীতি সম্বন্ধে আমি শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে এই নীতিতে আস্থাশীল ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত এই লক্ষ্যে উপনীত

হবার প্রাক্কালে দেখবে যে সমগ্র বিশ্ব তার চরণতলে এসে গেছে। সারা জগৎ তার পদতলে পড়ুক—এ ইচ্ছা তার মনে স্থান দেবার দরকার নেই। কিন্তু তবু পরিণাম এর এই হবে। তোমার মনের ভালবাসা অর্থাৎ অহিংসার পরিচয় তুমি যদি এমন ভাবে দিতে পার যে তোমার তথাকথিত শত্রুর মনেও তার স্থায়ী ছাপ পড়ে, তবে নিঃসন্দেহেই সে তার প্রতিদান দেবে। এর থেকে আর একটি কথা ওঠে। এই নীতি মানলে আমাদের জীবনে সংগঠিত হত্যাকাণ্ড বা প্রকাশ্য নরহত্যার কোন স্থান নেই। দেশের জন্য বা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন কারও ইজ্জতের জন্যও হিংসার আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নেই। এ পদ্ধতিকে সম্মান বাঁচাবার এক দীন প্রচেষ্টা ছাড়া কি বলা যায়? অহিংসার এই নীতি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীনদের সম্মান রক্ষার্থ নিজেকে ধর্মনাশে উদ্যত ব্যক্তির হাতে সঁপে দিতে হবে। এর জন্য ঘুসি মারার চেয়ে অনেক বেশী দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা প্রয়োজন। তোমাদের হয়তো কথঞ্চিৎ দৈহিক শক্তি (ক্ষমতা নয়) থাকতে পারে এবং প্রয়োজনকালে তোমরা তার প্রয়োগ করতে পার। কিন্তু এ শক্তি ফুরিয়ে যাবার পর কি হবে? ক্রোধ ও বিদ্বেষে ফুলে ওঠা তোমার বিপক্ষ তোমার হিংস্র প্রতিরোধের কারণে আরও অধিকমাত্রায় কুপিত হয়ে উঠবে এবং তোমাকে হত্যা করার পর তার উদ্ধত রোষানল তোমার আশ্রিতকে দহন করবে। কিন্তু প্রতিরোধ না করে তুমি যদি শুধু তোমার আশ্রিত এবং বিরুদ্ধপক্ষীয়ের মাঝে অবিচলভাবে দণ্ডায়মান হও এবং প্রত্যাঘাত না করে শুধু যদি আঘাত সহন কর, তবে তার কি প্রতিক্রিয়া দেখবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিরুদ্ধপক্ষের সমস্ত হিংসা তোমার উপরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমার আশ্রিতের গায়ে সে আগুনের আঁচটুকুও লাগবে না। জীবনযাত্রার এই পরিকল্পনায় ইউরোপে আজ দেশাত্মবোধের নামে যে যুদ্ধ চলছে, তার স্থান নেই।

এরপর আসে—

ব্রহ্মচর্য ব্রত

জাতির সেবায় আত্মনিয়োগে অভিলাষী বা যথার্থ ধর্মীয় জীবনের আস্বাদ গ্রহণেচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহিত বা অবিবাহিত নির্বিশেষে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। বিবাহের ফলে দুটি নরনারীর মাঝে নিকটতম সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাদের মধ্যে এমন এক বিশেষ ধরণের সখ্যবন্ধন স্থাপিত হয়, যা জন্মজন্মান্তরে কখনও ছিন্ন হবার নয়। আমার কাছে পরিণয় বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে লালসার স্থান নেই। যাই হোক না কেন, আশ্রমবাসীদের কাছে বিবাহের এই

ব্যাখ্যাই পেশ করা হয়। এখন এ সম্বন্ধে আর বিশদভাবে আলোচনা করব না।

তারপর হচ্ছে—

আস্বাদ ব্রত

জিহ্বাকে সংযত করলে মানুষ সহজে তার জৈব প্রবৃত্তিকে করায়ত্ব করতে সক্ষম হবে। আমি জানি যে এ ব্রত পালন করা খুবই কষ্টকর। এখনই আমি ভিক্টোরিয়া হোস্টেল পরিদর্শন করে আসছি। সেখানকার একাধিক পাকশালা দেখে আমার অবশ্য ভড়কে যাবার কথা। তবুও আমি ঘাবড়াইনি এইজন্য যে এরকম দেখতে আমি অভ্যস্ত। ভিন্ন ভিন্ন জাতের জন্য এতগুলি পাকশালা চলছে না। বিভিন্ন রকমের রুচির রান্নার জন্য এবং যে যে প্রান্ত থেকে আসছে, সেখানকার রন্ধন প্রণালীসম্মত স্বাদের জন্য এতগুলি পাকগৃহের প্রয়োজন ঘটেছে এবং এইজন্যই আমরা দেখছি যে শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই একাধিক পাকশালা ও তার নানা উপবিভাগ রয়েছে এবং এগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন দলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের বিশিষ্ট স্বাদের আহার্য পরিবেশন করা হয়। আমি আপনাদের বলতে চাই যে একে স্বাদের উপর প্রভুত্ব বলে না, বলে জিহ্বার দাসত্ব। আমাদের এই অভ্যাস বর্জন না করলে এবং চা ও কফির দোকান এবং এই জাতীয় পাকশালার উপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে নিলে আমাদের নিষ্কৃতির পথ নেই। শরীরকে সুস্থ রাখার পক্ষে পরিমিত আহার্যে যতক্ষণ না আমরা তুষ্ট হচ্ছি এবং আমাদের খাদ্যে যেসব গরম স্বাদবর্ধক ও উত্তেজক মশলা মেশাই, তা যতদিন না পরিত্যাগ করছি, ততদিন কিছুতেই এই অপ্রয়োজনীয় উত্তেজক বৃত্তির মাত্রাধিক্যের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করতে পারব না। এই পথ না ধরার স্বাভাবিক ফল হবে এই যে, আমরা নিজেদের অধঃপতন ঘটাব এবং আমাদের উপর যে পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত তা পালন না করে আমরা পশুরও নিম্নপর্যায়ে নেমে যাব। পান, আহার এবং ষড় রিপুর দাস হবার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পশুর পার্থক্য নেই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কোন গরু বা ঘোড়াকে কি কখনও আমাদের মত স্বাদেন্দ্রিয়ের অপপ্রয়োগ করতে দেখেছ? একে কি তোমরা সভ্যতার লক্ষণ বলে মনে কর? সত্যকার জীবনের তাৎপর্য কি নিজ অবস্থার প্রতি দৃকপাত না করে আহার্য তালিকার দৈর্ঘ বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ হয়ে সংবাদপত্রে নব নব ভোজ্য তালিকার বিজ্ঞাপনের সন্ধান আরম্ভ না করা পর্যন্ত একের পর এক রকমের খাবার খেয়ে যাওয়া?

এরপর আসে—

অস্তেয় ব্রত

আমার মতে আমরা সকলেই কোন না কোন রকমের চোর। অবিলম্বে প্রয়োজন নেই, এমন কিছু যদি আমি যোগাড় করে রেখে দিই, তাহ'লে তা অপর কারও জিনিস চুরি করার সামিল। দৃঢ়তা সহকারে আমি একথা বলব যে, কোন-রূপ ব্যতিক্রম বিনা প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রকৃতি আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত সম্পদ সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকে যদি ঠিক তার যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী না গ্রহণ করে, তবে এ বিশ্বে দারিদ্র্য বলে কিছু থাকবে না এবং অনশনে কেউ আর প্রাণত্যাগ করবে না। বিশ্বে যতদিন এই অসাম্য বিদ্যমান, ততদিন আমরা চুরি করছি বলতে হবে। আমি অবশ্যই বলব যে, যাঁরা এই ঘনঘোর তমিস্রার মাঝে আলোকের অভ্যুদয় দেখতে ইচ্ছুক, ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের এই নীতি মেনে চলতে হবে। আমি কারও উচ্ছেদ কামনা করি না। এরকম করলে আমি অহিংসা নীতি থেকে পতিত হব। আমার চেয়ে কারও যদি বেশী থাকে তবে তা থাকুক। তবে যেখানে আমার নিজ জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, সেখানে আমি অবশ্যই বলব যে আমার এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের প্রায় ত্রিশলক্ষ ব্যক্তিকে একবেলা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং সেই একবেলার আহার্য হচ্ছে কোন রকম স্নেহ পদার্থের সম্পর্কবিহীন কয়েকটি শুকনা রুটি ও সামান্য লবণ। এই ত্রিশ লক্ষ ব্যক্তি ভালভাবে খেতে পরতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের আজ যা আছে, তা রাখার অধিকার নেই। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তোমাদের ও আমার বেশী করে জানার কথা বলে ঐসব হতভাগ্যের যথোচিত যত্নের জন্য ও তাদের অন্নবস্ত্র দেবার জন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা ও এমন কি স্বেচ্ছায় উপবাস করা।

এরপর স্বভাবতই অপরিগ্রহের কথা ওঠে এবং তারপর আসে—

স্বদেশী ব্রত

স্বদেশীর ব্রত আমাদের কাছে অপরিহার্য, তবে স্বদেশী জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও স্বদেশী মনোভাব সম্বন্ধে তোমরা ভালভাবেই খবর রাখ। নিজ প্রয়োজনপূর্তির জন্য প্রতিবেশীর বদলে অন্যত্র অপর কারও কাছে গেলে আমরা জীবনের এক পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করছি বলে আমি বলব। মাদ্রাজে তোমাদের ঘরের কাছে যার জন্ম-কর্ম হয়েছে এমন একজন বাসনপত্রের ব্যবসায়ী থাকা সত্ত্বেও বোম্বাই থেকে কেউ এসে যদি তোমাদের কাছে হাঁড়িকুড়ি বিক্রী করতে চায়, তবে তোমাদের তা কেনা উচিত নয়। তোমাদের গ্রামে যতক্ষণ নাপিত রয়েছে, ততক্ষণ মাদ্রাজের ছিমছাম্ চেহারার নাপিতকে পয়সা দেওয়া অনুচিত। তোমরা যদি চাও যে

তোমাদের গ্রামের নাপিত মাদ্রাজের নাপিতের মতই যোগ্যতা অর্জন করুক, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাকে সেভাবে শিক্ষা দেওয়া। সে যাতে তার পেশা ভাল ভাবে শিখে আসতে পারে, সেজন্য পারলে তাকে মাদ্রাজে পাঠাও। এসব চেষ্টা না করা পর্যন্ত তোমার অন্য নাপিতের কাছে যাবার অধিকার নেই। এই হচ্ছে স্বদেশী। এইভাবে আমরা যখন দেখি ভারতে অনেক জিনিস পাওয়া যায় না, তখন সেগুলি ছাড়াই আমাদের কাজ চালিয়ে নেবার চেষ্টা করা দরকার। এমন অনেক জিনিস ছাড়া আমাদের কাজ চালাতে হবে, যা আজ আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি। তবে বিশ্বাস কর, সেরকম মনের অবস্থা এলে "পিলগ্রিমস প্রগ্রেস" বইএর তীর্থযাত্রীদের মত দেখবে যে তোমাদের কাঁধের বোঝার অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে। তীর্থযাত্রী যে গুরুভার বহন করে চলছিল, একসময় তার অজ্ঞাতসারে কাঁধ থেকে তা পড়ে গেল এবং যাত্রা আরম্ভ করার সময়ের তুলনায় তখন নিজেকে তার অধিকতর মাত্রায় মুক্তপুরুষ বলে মনে হতে লাগল। ঐরকমভাবে এই স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করার পর তোমাদের এখনকার চেয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হবে।

এরপর—

অভী ব্রত

আমার ভারত পরিভ্রমণকালে আমি দেখেছি যে ভারতবাসী, বিশেষতঃ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় মারাত্মক ভয়ের আশঙ্কায় মূহ্যমান। সর্বসাধারণের কাছে আমরা মুখ খুলব না। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত সকলের কাছে আমরা ব্যক্ত করব না। নিজেদের মনোভাব মনেই গুপ্ত রেখে বড় বেশী হলে গোপনে তার আলোচনা করব এবং নিজগৃহের চারটি দেওয়ালের ভিতর যথেচ্ছ চলব, অথচ সর্বসাধারণকে এর কিছু জানাব না। আমরা যদি মৌন ব্রত নিতাম, তাহলে বলার কিছু ছিল না। জনসাধারণের কাছে মুখ খুললে আমরা এমন সব কথা বলি, যাতে আমাদের আস্থা নেই। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি জনসেবক, যাদের কখনও বক্তৃতা দিতে হয়, তাঁদের অভিজ্ঞতাও বোধহয় আমারই মত। আমি আপনাদের বলব যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভয় করার মত একজনই মাত্র আছেন এবং তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ভয় করলে যত উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তি হোক না কেন, কাউকে আর আমরা ভয় করব না। সত্য অনুসরণ করার নীতিকে যেভাবে তোমরা পালন করতে চাও না কেন, তার জন্য তোমাদের নির্ভীক হতেই হবে। সেইজন্য ভাগবদ্গীতাতে দেখবে যে নির্ভীকতাকে ব্রহ্মনের অতীব প্রয়োজনীয় গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিণামের

ভয়ে ভীত হয়ে আমরা সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকি। শুধু যে ভগবানের ভয় রাখে, সে কখনও পার্থিব কোন কিছুতে ভয় পাবে না। ধর্মের স্বরূপ জানার প্রযত্ন করার পূর্বে এবং ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার অভিলাষ পোষণ করার আগে যে নির্ভীকতাকে চরিত্রের অঙ্গস্বরূপ করা প্রয়োজন, একথা কি তোমরা মনে কর না? আমরা নিজেরা যেমন সম্ভ্রম মিশ্রিত আতঙ্কে কালাতিপাত করি, দেশবাসীকে কি তাই শিক্ষা দেব? তাহলে অভীব্রতের গুরুত্ব এবার তোমরা বুঝতে পেরেছ।

এরপর আসে—

অস্পৃশ্যতা পরিহার ব্রত

আজ হিন্দুধর্মের ভিতর এক দুরপনেয় কলঙ্ক বিদ্যমান। আমি মোটেই একথা বিশ্বাস করি না যে যুগ-যুগান্ত থেকে এ প্রথা আমাদের মধ্যে চলে আসছে। সভ্যতার উত্থান-পতনের যে চক্রবৎ অনুবর্তন ধারা চলে, তারই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে আমরা যখন পড়ে গিয়েছিলাম, তখনই এই জঘন্য দাসমনোভাবের প্রতীক ছ্যুৎমার্গরূপী প্রথা আমাদের জীবনে দাখিল হয় এবং এই কুপ্রথা আজও আমাদের সমাজ জীবনের অঙ্গরূপে বিরাজিত। আমার মতে এ এক অভিশাপরূপে আমাদের উপর পড়েছে এবং যতদিন পর্যন্ত এই অভিশাপ আমাদের উপর থাকবে, ততদিন এই পবিত্র-ভূমিতে আমাদের যেসব দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে কালাতিপাত করতে হচ্ছে, তাকে আমাদের এই বীভৎস পাপের উপযুক্ত সাজা বলে মনে করতে হবে। পেশার জন্য কাউকে অস্পৃশ্য করার কথা বুঝে ওঠা অসম্ভব। আর তোমাদের মত যেসব ছাত্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছ, তারা যদি এই পাপকার্যের অংশীদার হও তাহলে তোমরা কোনরকম শিক্ষার আলো না পেলেই ছিল ভাল।

আমাদের অবশ্য যথেষ্ট বাধাবিঘ্নের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। তোমরা মনে মনে যদি এ কথা মেনেও নাও যে পৃথিবীর কোন মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করা উচিত নয়, তবুও নিজ পরিবারের লোকজনের উপর প্রভাব বিস্তার করার সাধ্য তোমাদের নেই এবং তোমাদের চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের মত বদলে দেওয়ার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তোমাদের যাবতীয় চিন্তাধারার উৎস হচ্ছে একটি বিদেশী ভাষা এবং সেই ভাষার বেদীমূলে তোমাদের যাবতীয় উদ্যম উৎসর্গীকৃত। এইজন্য আমরা আশ্রমে এই নিয়ম প্রবর্তন করেছি যে আমাদের শিক্ষা হবে—**মাতৃভাষার মাধ্যমে**

ইউরোপের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ মাতৃভাষা ছাড়া আরও প্রায় তিন-চারটি ভাষা শিক্ষা করে। ইউরোপের মত আমরাও আমাদের আশ্রমে ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য যতগুলি সম্ভব দেশীয় ভাষা শিক্ষা করি। তোমরা আশ্বস্ত হতে পার যে এতগুলি ভারতীয় ভাষা শেখার জন্য যেটুকু পরিশ্রম করতে হয়, ইংরাজী শেখার তুলনায় তা নগণ্য। ইংরাজী ভাষা আমরা মোটে শিখে উঠতে পারি না। সামান্য জনকয়েক ছাড়া আমাদের পক্ষে এ প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নিজ মাতৃভাষার মত সাবলীলভাবে আমরা এ ভাষায় আমাদের ভাব ব্যক্ত করতে অসমর্থ। সমগ্র শৈশবের স্মৃতি মুছে ফেলার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করার কি কোন অর্থ হয়? কিন্তু এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা আরম্ভ করে আমাদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সূচনা করার কালে আমরা এই প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করি। এর ফলে আমাদের জীবনে এমন একটি ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে, যা জোড়া লাগাবার জন্য যথেষ্ট দাম দিতে হবে। এইবার তোমরা শিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা এই দুটি জিনিসের পারম্পারিক সম্পর্ক দেখতে পাবে। এমনভাবে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারের পরও আজ এই যে অস্পৃশ্যতার মনোভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তার মূল তোমাদের চোখে পড়বে। শিক্ষার ফলে মারাত্মক অপরাধ আমাদের নয়নগোচর হয়। কিন্তু আমাদের মনে ভয়ও আছে, সুতরাং এই নীতিকে আমাদের গৃহস্থালীতে আমরা প্রচলিত করতে পারি না। তাছাড়া আমাদের পারিবারিক আচার-বিচার এবং পরিবার-পরিজন সম্বন্ধে আমাদের মনে গোঁড়ামি মিশ্রিত শ্রদ্ধাভাব বিদ্যমান। তোমরা হয়তো বলবে, "আমি অন্ততঃ আর এ পাপের ভাগীদার হব না বললে আমার বাবা-মা প্রাণত্যাগ করবেন।" আমি তোমাদের এই কথা বলব যে, বাবা মারা যাবেন এই ভয়ে প্রহ্লাদ কখনও পবিত্র বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকেনি। প্রহ্লাদ তো পিতার উপস্থিতিতেও সারা ঘরকে কৃষ্ণনামের গুঞ্জরণে মুখরিত করে দিত। সুতরাং আমরাও পূজ্য পিতার উপস্থিতিতে এ কাজ করতে পারি। এই কঠিন আঘাতের ফলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি সত্যিই দেহত্যাগ করেন, তাহলে আমি তাকে বিপদ বলে মনে করব না। হয়তো এ জাতীয় কিছু রূঢ় আঘাত দিতেই হবে। বহু যুগ ধরে যে সব গোঁড়ামি চলে আসছে তাকে বজায় রাখার জন্য আমরা যতদিন জিদ করব, ততদিন এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু প্রকৃতির এক মহত্তর বিধান বিদ্যমান এবং সেই মহান নিয়মের খাতিরে আমাদের এবং আমাদের পিতামাতাকে এই ত্যাগ বরণ করতে হবে।

এরপর আসছে—

তাঁত চালানো

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে, "আমরা আমাদের হাত কাজে লাগাব কেন? দৈহিক শ্রম তো অশিক্ষিতদের করতে হবে। আমি শুধু সাহিত্য ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ পাঠ করব।" আমার মনে হয় আমাদের শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করা দরকার। নাপিত বা মুচি কলেজে পড়লে তার নিজস্ব বৃত্তি কেন ছেড়ে দেবে? আমার মতে নাপিতের পেশা চিকিৎসকের পেশার মতই ভাল।

রাজনীতি

অবশেষে এই সব নিয়মগুলি পালন করার পর (কিছুতেই তার পূর্বে নয়) তোমরা প্রাণ খুলে রাজনীতিতে যোগ দিতে পার এবং নিঃসন্দেহেই তখন আর তোমরা ভুল করবে না। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির সম্পর্ক না থাকলে তার কোন অর্থ হয় না। ছাত্রসমাজ যদি এ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভিড় করে, তবে আমি তাকে জাতীয় উন্নতির স্বাভাবিক লক্ষণ বলতে পারব না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ছাত্রাবস্থায় তোমরা রাজনীতি অধ্যয়ন করতে পারবে না। রাজনীতি আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত ও জাতীয় উন্নতি এবং তার গতি প্রকৃতি আদি সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন থাকা বিধেয়। আমাদের শৈশব থেকেই আমরা এ করতে পারি। সুতরাং আমাদের আশ্রমের প্রত্যেকটি শিশুকে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হয় এবং জাতির দেহের ধমনীতে যে নূতন ভাবের স্রোত বইছে, যে নবীন আশা-আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে ও যে নবজীবনের সূচনা আমাদের ইতিহাসে হতে চলেছে, সে সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞ করার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনির্বাণ দীপশিখার পরশ চাই। শুধু বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের যে নিবাত নিষ্কম্প বর্তিকা-রশ্মি হৃদয়ে চিরস্থায়ী দাগ কেটে যায়, আমরা তারই ছোঁয়া চাই। প্রথমে আমরা এই জাতীয় ধর্মীয় চেতনা হৃদয়ে জাগ্রত করতে চাই এবং আমার মনে হয় এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তদনন্তর ছাত্র এবং আর সকলের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সেই সর্বাঙ্গীন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। এর ফলে বয়ঃকালে বিদ্যায়তন ছাড়ার সময় তারা জীবন সংগ্রামে যোগদান করার উপযুক্ত আয়ুধে সজ্জিত হয়ে যাবে। বর্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকাংশই ছাত্রদের মধ্যে সীমিত। ফলে বিদ্যায়তন ছেড়ে ছাত্রজীবনের অবসান ঘটা মাত্র এই সব প্রাক্তন ছাত্র বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যায় এবং স্বল্প বেতনের দুর্গতির সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনধারণোপায় খুঁজে বেড়ানোর জন্য তাদের জীবন থেকে

উচ্চ আশা বিদায় নেয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, মুক্ত বায়ু বা অমলিন আলোক সম্বন্ধে তারা খবর রাখে না এবং পূর্বোক্ত জীবনের যে নীতিসমূহ পালনের ফলে মহান শক্তিশালী স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-বৃত্তি জাগে, তার লেশমাত্র এই সব প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সত্যাগ্রহাশ্রমের সংযোজন

(নিয়ম-কানুন)

এই প্রতিষ্ঠান ১১ই বৈশাখ শুদি ১৯৭১ সম্বতে (২৫শে মে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ) আহমেদাবাদের নিকটস্থ কোচরাবে স্থাপিত ও পরে সবরমতী নামক আহমেদাবাদের নিকটস্থ একটি জংশন স্টেশনে স্থানান্তরিত হয়।

লক্ষ্য

এই আশ্রমের লক্ষ্য হচ্ছে এই যে এর অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্বদেশের সেবা ও তার জন্য যোগ্যতা অর্জন মানসে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করবে।

বিধিপালন

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করা অপরিহার্য :—

১। সত্য

প্রতিবেশী মানবের সঙ্গে সাধারণ অর্থে মিথ্যা আচরণ করা বা তাদের কাছে মিথ্যা ভাষণ করা থেকে বিরত থাকাকেই সত্যের ব্রতপালন আখ্যা দেওয়া যায় না। সত্যই ঈশ্বর এবং এই হচ্ছে একমাত্র ও অদ্বিতীয় বাস্তব তথ্য। এই সত্যের সন্ধান ও পূজা থেকে অপরাপর যাবতীয় বিধির জন্ম। আপাতদৃষ্টিতে যাকে তারা দেশের হিত বলে মনে করে, তার খাতিরেও সত্যের পূজারীদের অসত্যের স্মরণ নেওয়া চলবে না। সত্যের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন-বোধে প্রহ্লাদের মত তাদের পিতামাতা আদি গুরুজনের আদেশ সবিনয়ে অমান্য করতে হবে।

২। অহিংসা বা প্রেম

শুধু জীবহত্যা থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়। অহিংসার সক্রিয় দিকটি হচ্ছে প্রেম। ক্ষুদ্র কীটানুকীট থেকে বিশাল বপু মানব পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি সমদৃষ্টি রাখাই হচ্ছে প্রেমের ধর্ম। এ নিয়ম পালনকারীকে অত্যন্ত গর্হিত কাজের নায়কের প্রতিও ক্রোধ পোষণ করা চলবে না, তিনি তাকে ভালবাসবেন, তার মঙ্গল কামনা

করবেন ও তার সেবা করবেন। দুষ্কৃতিকারীকে এইভাবে ভালবাসলেও তিনি তার অন্যায় আচরণের কাছে নতিস্বীকার করবেন না, বরং সর্বশক্তি প্রয়োগে তিনি এর বিরোধিতা করবেন এবং কোন রকমে ক্ষুব্ধ না হয়ে ধৈর্য সহকারে তিনি এই বিরোধিতার জন্য দুষ্কৃতিকারীর যাবতীয় পীড়ন মাথা পেতে নেবেন।

৩। **ব্রহ্মচর্য**

ব্রহ্মচর্য বিনা উপরিউক্ত বিধিসমূহ পালন করা অসম্ভব। কোন নারী বা পুরুষের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত না করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের জৈব কামনাকে এমনভাবে আয়ত্তে আনতে হবে, যাতে সে ভাব মন থেকে বিতাড়িত হয়। বিবাহিতদের স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি কামভাব পোষণ করা চলবে না। স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের জীবনমরণের সাথী বলে মনে করবে। তাদের মধ্যে একান্ত শুচিতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। পাপ-ইচ্ছা নিয়ে স্পর্শ, কোন ইঙ্গিত বা কথোপকথন প্রত্যক্ষভাবে এ নীতি ভঙ্গকারী মনোভাব।

৪। **অস্বাদ**

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে যে স্বাদেন্দ্রিয়ের প্রভু না হলে ব্রহ্মচর্য পালন খুবই দুরূহ। এই কারণে অস্বাদকে স্বয়ং একটি ব্রতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শরীর রক্ষা এবং দেহকে সেবার উপযোগী রাখার জন্য আহারের প্রয়োজন এবং আত্মসুখের জন্য আহার্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং যথোচিত সংযম সহকারে ঔষধের মত আহার গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি পালনের জন্য ঝাল, মশলা আদি মুখরোচক দ্রব্য বর্জন করা প্রয়োজন। মাংস, মদ্য, তামাক এবং ভাঙ্ আদি আশ্রমে আসে না। এই নীতি মানতে হলে উৎসব ও নিমন্ত্রণ-বাড়ী ইত্যাদি যেখানে রসনাতৃপ্তি মুখ্য উদ্দেশ্য, তার সংস্রব ছাড়া দরকার।

৫। **অস্তেয়**

না বলে পরের দ্রব্য নেওয়ার অভ্যাস পরিহার করাই যথেষ্ট নয়। কোন বিশেষ কাজের জন্য একটি জিনিস পেলে তাকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বা কোন দ্রব্য ধার নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী তাকে নিজের কাছে রাখলেও চৌর্যাপরাধে অপরাধী হতে হয়। যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশী নিলেও এই একই দোষ হয়। এই নীতির মূল কথা হচ্ছে এই যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে যতটুকু ঠিক যথেষ্ট, প্রকৃতি ততটুকুরই মাত্র সংস্থান করে।

৬। **অপরিগ্রহ**

এ নীতি আসলে অস্তেয়রই অংশবিশেষ। শুধু যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী যেমন গ্রহণ করা উচিত নয়, তেমনি তা নিজ আয়ত্তে রাখাও বিধেয় নয়।

অপ্রোয়জনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র নিজের কাছে রাখলে এ নীতি ভঙ্গ করা হয়। কারও যদি চেয়ার ছাড়া চলে যায়, তবে একটিও চেয়ার রাখার প্রয়োজন নেই। এই নীতি পালন করার কালে জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে ক্রমশঃ সরল করে তুলতে হয়।

৭। শরীর শ্রম

অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ নীতি আচরণ করার জন্য শরীর শ্রম অপরিহার্য। মানুষ যদি সমাজের ক্ষতি না করতে চায় তবে নিজ দেহধারণের জন্য তার শরীর শ্রম করা উচিত। প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ শরীরসম্পন্ন ব্যক্তির স্বয়ং নিজ ব্যক্তিগত কাজগুলি করে নেওয়া উচিত। যথোপযুক্ত কারণ না হলে তারা যেন এজন্য অপর কারও সহায়তা না নেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তি এবং শিশুদের সেবা করার দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপর এসে পড়ে।

৮। স্বদেশী

মানুষ সর্বশক্তিমান নয়। সুতরাং তার পক্ষে বিশ্বের সেবা করার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে প্রথমে নিজ প্রতিবেশীর সেবা করা। এই হচ্ছে স্বদেশী ব্রত এবং যদি কেউ তার নিকটস্থ ব্যক্তিকে সেবা করার বদলে দূর দেশে অবস্থিত ব্যক্তির সেবা করছি বলে, তাহলে এই নীতি ভঙ্গ করা হয়। স্বদেশী ব্রত পালনে বিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং এর ব্যতিক্রমের ফলে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। এই নীতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ আমাদের যথাসম্ভব স্থানীয় বাজার থেকেই কিনতে হবে এবং যে দ্রব্য সহজে নিজ দেশে উৎপন্ন হতে পারে, তার জন্য বিদেশ থেকে আমদানির উপর নির্ভর করা চলবে না। স্বদেশীতে স্বীয় স্বার্থ সাধনের স্থান নেই। এই আদর্শের বেদীমূলে নিজেকে পরিবারের কাছে, পরিবারকে গ্রামের কাছে, গ্রামকে দেশের কাছে ও দেশকে সমগ্র মানব সমাজের জন্য আত্মবলি দিতে হবে।

৯। নির্ভিকতা

ভয়ের প্রভাবাধীন থাকাকালীন কারও পক্ষে সত্য বা প্রেমের অনুবর্তী হওয়া অসম্ভব। দেশে এখন আতঙ্কের রাজত্ব চলছে বলে নির্ভিকতার চর্চা ও এ সম্বন্ধে চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এইজন্যই কৃত্য হিসেবে এর পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল। সত্য-সন্ধানীকে পিতামাতা, জাতি, সরকার বা দস্যুআদির ভয় বিসর্জন দিতে হবে এবং দারিদ্র্য বা মৃত্যুর জন্য তার আতঙ্কিত হওয়া চলবে না।

১০। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ

যে অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দুধর্মের এত গভীরে তার মূল বিস্তার করেছে, তা

একেবারে ধর্মনীতি বিরোধী। এই কারণে এই পাপ দূরীকরণের কাজকে একটি স্বতন্ত্র নীতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আশ্রমে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের স্থান অন্যান্য জাতিদের সমানই। জাতি ভেদ প্রথার উচ্চনীচ ভাবনা এবং পরস্পরের সম্পর্কে এলে অশুচি হয়ে পড়ার সংস্কার প্রেমধর্ম বিরোধী বলে আশ্রমে জাতিভেদ প্রথা মানা হয় না। আশ্রম অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। বর্ণবিভাগের ভিত্তি হচ্ছে বৃত্তির উপর এবং প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে তার পৈতৃক পেশা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। তবে এ মানুষের মৌলিক নীতিবিরুদ্ধ হবে না এবং এই পথের পথিককে তার অবসর সময় ও উদ্বৃত্ত কর্মশক্তিকে সত্যকার জ্ঞান অর্জন ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। স্মৃতিসমূহে উল্লিখিত চতুর্বিধ আশ্রম প্রথা মানব জাতির মঙ্গলসূচক। সুতরাং আশ্রম বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করলেও এখানে বর্ণভেদের স্থান নেই। কারণ আশ্রম জীবন ভগবদগীতার সন্ন্যাসের আদর্শে রচিত।

১১। সহনশীলতা

আশ্রমিকগণ বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের প্রমুখ ধর্মমত সমূহে সত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে এর প্রত্যেকটিই মানবের মত অসম্পূর্ণ সত্ত্বা কর্তৃক প্রবর্তিত বলে এর মধ্যে অপূর্ণতার ছোঁয়া আছে এবং কিছু কিছু অসত্যেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং প্রত্যেকরই কর্তব্য হচ্ছে অপরের ধর্মমতকে নিজধর্মের সমান মর্যাদা দেওয়া। এই জাতীয় সহনশীলতা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ থাকে না এবং এই কারণে কারও ধর্মান্তরকরণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যে বিভিন্ন ধর্মমতগুলি যেন তাদের ত্রুটি দূর করতে পারে এবং সবগুলি যেন একযোগে পূর্ণতার পথে চলে।

কার্যক্রম

এই সকল নীতির ফলস্বরূপ আমাদের এই উদ্দেশ্যের পরিপূর্তি মানসে আশ্রমে নিম্নরূপ কার্যক্রম অনুসৃত হয়।

১। প্রার্থনা

প্রত্যহ আশ্রমের সামাজিক (ব্যক্তিগত নয়) কার্যক্রম সুরু হয় প্রত্যুষের ৪-১৫ মিনিট থেকে ৪-৪৫ মিনিটের সমবেত প্রার্থনা থেকে এবং এর অবসান হয় রাত্রি ৭টা থেকে ৭—৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রার্থনার পর। আশ্রমস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রার্থনায় যোগদান করা নিয়ম। আত্মশুদ্ধি এবং নিজের সব কিছু ঈশ্বরের পদপ্রান্তে সমর্পণ করাই হচ্ছে প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

২। সাফাই

সমাজের পক্ষে সাফাইএর কাজ অপরিহার্য ও পবিত্র। তথাপি একে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং এর ফলস্বরূপ একাজের প্রতি উপেক্ষা দেখানো হয় ও তাই এর যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ বিদ্যমান। আশ্রমে সেইজন্য যাতে বাইরের শ্রমিক না নিয়োগ করা হয়, তার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। আশ্রমিকগণ পর্যায়ক্রমে সাফাইএর প্রত্যেকটি কাজ করেন। নবাগতদের প্রথমতঃ এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রায় নয় ইঞ্চি গভীর খাদ খনন করে মল তার ভিতর দিয়ে, গর্ত খোঁড়ার সময় যে মাটি বেরিয়েছিল, তাই দিয়ে তাকে ঢেকে দেওয়া হয়। এইভাবে মল মূল্যবান সারে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট জায়গাতেই শুধু মলমূত্র ত্যাগ করা হয়। থুথু ফেলে বা অন্যভাবে যাতে পথঘাট নষ্ট করা না হয়, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

৩। সূত্রযজ্ঞ

কৃষির প্রধান অনুপূরক কার্য হিসাবে হাতে সুতাকাটার শিল্পকে মূলতঃ বিদেশী শাসকগণ ধ্বংস করার ফলে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের ভিতর উত্তোরত্তর বুভুক্ষার যে পরিমাণ প্রসার ঘটছে, তা বর্তমান ভারতের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। এই শিল্পটিকে আমাদের জাতীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানসে সুতা কাটাকে আশ্রমের মূল কার্যক্রম বলে গণ্য করা হয় এবং আশ্রমবাসীদের কাছে বাধ্যতামূলক ভাবে সুতাকাটা হচ্ছে জাতির উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার। এই বিভাগে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শাখা বিদ্যমান :—

১। কাপাস চাষ।
২। চরখা, টেকো, ধুনকি আদি প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানা।
৩। কাপাসের বীজ ছাড়ান।
৪। তুলা ধুনাই।
৫। সুতা কাটা।
৬। কাপড়, সতরঞ্চি, ফিতা আদি বোনা।
৭। কাপড় রঙ করা ও ছাপা।

৪। কৃষি

খাদি বস্ত্রের জন্য কাপাস ও আশ্রমের পশুদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করাই আমাদের মূল কাজ। আশ্রমকে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করার জন্য ফল ও তরিতরকারীও উৎপন্ন করা হয়।

৫। গোপালন

আশ্রমবাসীদের দুধ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত গোশালাটিকে একটি আদর্শ গোশালায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গত বৎসর থেকে এই গোশালাটিকে অখিল ভারত গোরক্ষা সমিতির নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং তাঁদের অর্থসাহায্যে আশ্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিচালিত করা হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের ২৭টি গাভী, ৪৭টি বাছুর, ১০টি বলদ ও ৪টি ষাঁড় আছে। প্রত্যহ প্রায় ১০০ সেরের মত দুধ হয়।

৬। চর্মালয়

মৃত পশুর চামড়া পাকা করার জন্য অখিল ভারত গো-রক্ষা সমিতির শিক্ষকতায় ও সহায়তায় একটি চর্মালয় স্থাপনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে জুতা ও চটি নির্মাণ বিভাগ আছে। গোশালা ও চর্মালয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য এই যে আশ্রম মনে করে যে হিন্দুরা গো-রক্ষার কথা নিয়ে মাতামাতি করা সত্বেও পশু-প্রজনন, পশুদের জন্য আহার্যের সংস্থান ও মৃত পশুর চর্মের সদুপযোগের ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিলে ভারতের পশুধনের ক্রমাগত অবনতি ঘটবে এবং অবশেষে এ দেশের পশু সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসীকেও ধ্বংস করে যাবে।

৭। জাতীয় শিক্ষা

আশ্রমে জাতীয় মঙ্গলের অনুকূল শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে একযোগে হতে পারে, তার জন্য এখানে কর্মোদ্যমের এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হরফ চেনার প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। চরিত্র গঠনের খুঁটিনাটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। "অস্পৃশ্য" ছেলেদের অবাধে এখানে গ্রহণ করা হয়। নারীরা যাতে নিজ অবস্থার উন্নতি করতে পারে সেজন্য তাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং আত্মবিকাশের সুযোগ তারা পুরুষদের সমান পায়। গুজরাট বিদ্যাপীঠের নিম্নলিখিত আদর্শাবলীতে আশ্রম বিশ্বাসী :—

১। বিদ্যাপীঠের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এমন সব চরিত্রবান, ক্ষমতাশালী, শিক্ষিত ও বিবেকবান কর্মী সৃষ্টি করা যারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনায় সহায়ক হবে।

২। বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অসহযোগধর্মী হবে বলে সরকারী সাহায্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৩। স্বরাজ আন্দোলন এবং এই স্বরাজ অর্জনের পন্থা—অহিংস অসহযোগের গর্ভ হতে এই বিদ্যাপীঠের জন্ম বলে এর অধ্যাপকমণ্ডলী এবং অছিগণ সর্বদা সত্য

ও অহিংসার অনুকূল উপায় অবলম্বন করবেন এবং সদাই তাঁরা এই নীতি পালনের জন্য সজ্ঞানে প্রযত্ন করবেন।

৪। বিদ্যাপীঠের অধ্যাপকবর্গ ও অছিগণ এবং এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুসমাজের কলঙ্কস্বরূপ জ্ঞান করবেন এবং এই পাপ অপনোদনের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করবেন। অস্পৃশ্যতার অপরাধে কোন বালক-বালিকা এই বিদ্যাপীঠে প্রত্যাখ্যাত হবে না বা একবার এরকম কাউকে গ্রহণ করার পর তার প্রতি পার্থক্যমূলক আচরণ করা হবে না।

৫। বিদ্যাপীঠ এবং এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ও অছিগণ সুতাকাটাকে স্বরাজ প্রাপ্তির আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করবেন এবং নিতান্ত অশক্ত না হলে নিয়মিতভাবে সুতা কাটবেন ও খাদি পরিধান করবেন।

৬। বিদ্যাপীঠে প্রাদেশিক ভাষা প্রমুখ স্থান অধিকার করবে এবং এই ভাষাই শিক্ষার বাহন হবে।

ব্যাখ্যা :—গুজরাটি ছাড়া অন্যান্য ভাষা প্রত্যক্ষ কথোপকথোন দ্বারা শেখানো যেতে পারে।

৭। বিদ্যাপীঠের পাঠ্যক্রমে হিন্দি-হিন্দুস্থানী শিক্ষা বাধত্যামূলক।

৮। শরীরশ্রমের শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করার শিক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বৃত্তিসমূহ শেখানো হবে।

৯। জাতির উন্নতি নগর নয়, গ্রামের উপর নির্ভরশীল বলে, বিদ্যাপীঠের বেশীর ভাগ অর্থ ও প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ অধ্যাপক গ্রামীন জনতার হিতকারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবেন।

১০। পাঠ্যক্রম নির্ধারণকালে গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথমে বিবেচনা করতে হবে।

১১। বিদ্যাপীঠ পরিচালিত ও এর সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি সমদৃষ্টি থাকবে এবং ছাত্রদের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সত্য ও অহিংসানুগ ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে।

দ্রষ্টব্য :—হিন্দি-হিন্দুস্থানীর অর্থ হচ্ছে এমন একটি ভাষা যা উত্তরখণ্ডের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণতঃ বলে থাকে এবং দেবনাগরী ও আরবী, এই উভয়বিধ লিপিতেই তা লেখা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী

পরিচালকমণ্ডলী নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করেছেন :—

১। স্থায়ী-অস্থায়ী নির্বিশেষে আশ্রমের দায়িত্বশীল কর্মী ও অধিবাসীবৃন্দ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন।

২। আশ্রমে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নিজগৃহে পূর্বোল্লিখিত নিয়মগুলি অন্তত একবৎসর পালন করে আসতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা অধ্যক্ষের থাকবে।

৩। পৃথক করে আর পাকশালা স্থরু করা কাম্য নয় বলে ভবিষ্যতে বিবাহিত বা অবিবাহিত নির্বিশেষে প্রতিটি নবাগতকে সার্বজনীন পাকশালায় আহার্য গ্রহণ করতে হবে।

অতিথিদের প্রতি

দর্শক ও অতিথির সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। আগন্তুকদের আশ্রমের বিভিন্ন কার্যকলাপ দেখানোর যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমে থেকে আশ্রম দেখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যেন এর জন্য পূর্বাহ্নে সম্পাদকের কাছে আবেদন করেন এবং আবেদনের সম্মতিজ্ঞাপক উত্তর না পেলে যেন এখানে না আসেন।

আশ্রমে খুব বেশী বিছানা বা বাসনপত্র নেই। স্থতরাং আশ্রমে এসে যাঁরা থাকবেন তাঁরা যেন নিজের বিছানা, মশারী, গামছা, থালা, বাটী ও গেলাস আনেন।

পাশ্চাত্যের দর্শকদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। তবে যাঁরা মেঝেতে বসে খেতে অভ্যস্ত নন, তাঁদের একটু উঁচু আসন দেবার চেষ্টা করা হয়। কমোড অবশ্য তাঁদের দেওয়া হয়।

অতিথিদের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে :—

১। প্রার্থনায় যোগদান।

২। নীচের দৈনিক কর্মসূচীতে যে খাবার সময়ের উল্লেখ আছে তার প্রতি খেয়াল রাখবেন।

প্রত্যহিক কর্মসূচী

সকাল ৪ ঘটিকায়	শয্যাত্যগ
„ ৪-১৫ মিঃ থেকে ৪-৪৫ মিঃ	প্রাতঃকালীন প্রার্থনা
„ ৫টা থেকে ৬-১০ „	স্নান, ব্যায়াম ও অধ্যয়ন

সকাল ৬-১০	"	৬-৩০	"	প্রাতরাশ
" ৬-৩০	"	৭টা		মহিলাদের প্রার্থনার বর্গ
সকাল ৭টা	থেকে	১০-৩০	মিঃ	শরীরশ্রম, শিক্ষা ও সাফাই
বেলা ১০-৪৫ মিঃ	"	১১-১৫	"	মধ্যাহ্ন ভোজন
" ১১-১৫ "	"	১২টা		বিশ্রাম
" ১২টা	"	৪-৩০	"	শরীরশ্রম ও বর্গ
বৈকাল ৪-৩০ "	"	৫-৩০	"	খেলাধূলা
" ৫-৩০ "	"	৬টা		নৈশভোজন
সন্ধ্যা ৬টা	"	৭টা		বিরাম
রাত্রি ৭টা	"	৭-৩০	মিঃ	সমবেত প্রার্থনা
" ৭-৩০ "	"	৯টা		বিরাম
" ৯টা				শোবার ঘণ্টা

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রয়োজন বোধে কর্মসূচীর পরিবর্তন হবে।

৭। আচার্যের অভিভাষণ *

আমার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে আজকের আয়োজন পৃথক। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাকে আমি অতীব দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করি। জাতির কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করে ফেলছি বলে আমার মনে এই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়নি, আমার শুধু মনে হচ্ছে যে আমি এ কার্যের যথোপযুক্ত ব্যক্তি নই। শিক্ষা বলতে সত্য সত্য যা বোঝায়, এই কলেজটি যদি তার প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে আমার মনে এই অযোগ্যতার ভাবনা জাগত না। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুধু ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া নয়; ছাত্রদের জীবিকার সন্ধান করে দেওয়াও এর লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুজরাট কলেজের সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের তুলনা করলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। গুজরাট কলেজ একটি বিরাট ব্যাপার; কিন্তু আমাদের মহাবিদ্যালয় সে তুলনায় নগণ্য। তবে আমার মতে এটি একটি মহান প্রতিষ্ঠান। গুজরাট কলেজে ইঁট-কাঠ আর চুন-সুরকি বেশী লেগেছে। প্রতিষ্ঠানের গুণ বিচারের জন্য অট্টালিকা ও অন্যবিধ সাধন-সামগ্রী যে যথেষ্ট মানদণ্ড নয়, এ বিশ্বাস আমি যদি তোমাদের মনে সৃষ্টি করতে পারতাম, তাহলে বড় ভাল

*১৫ই নভেম্বর, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আহমেদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠের গুজরাট মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন দিবসে গান্ধীজী প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার।

হ'ত। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি যে আমাদের আদর্শ সম্বন্ধে তোমাদের মনে আমারই মত দৃঢ়মূল প্রতীতি জন্মাক।

আজকের অবস্থা হচ্ছে এই যে দেশের সূচ্যগ্র ভূমিও আমাদের নয়, সবই এক বিদেশী সরকারের অধীন। শুধু এই মাটি আর গাছপালাই নয়; আমাদের দেহগুলিও তাদের দখলে এবং নিশ্চিতভাবে একথা বলা মুস্কিল যে আমরা আমাদের আত্মার স্বামী কিনা। এই যখন আমাদের অবস্থা তখন জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের জন্য সুন্দর একটি অট্টালিকা বা এর অধ্যাপক পদের জন্য খুব জ্ঞানী ব্যক্তি পাবার আশা করা অনুচিত। এমন কি একজন লোক যদি এসে আমাদের জানায় যে আমাদের আত্মার জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশ থেকে প্রাচীনকালের প্রজ্ঞা বিদায় নিয়েছে, তাহলে অন্যান্য বিষয়ে সে অজ্ঞ হলেও আমি তো সানন্দে তাকে তোমাদের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করব। তবে আমি বলতে পারছি না যে তোমরা একজন পশুপালককে এইভাবে গ্রহণ করতে পারবে কিনা। সেইজন্য আমাদের শ্রীযুক্ত গিদওয়ানীকে খুঁজে বের করতে হয়েছে। আমি স্বীকার করছি যে তাঁর ডিগ্রীগুলির প্রতি আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। এই কলেজে পৃথক ধরণের মূল্যমান বিদ্যমান। চরিত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এখন যা পিতল মনে হচ্ছে, তাই সোনা বলে ধরা পড়বে।

আদর্শ চরিত্রের সিন্ধি, মারাঠী ও গুজরাটী অধ্যাপকমণ্ডলী পাওয়ায় আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করি।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের আমি প্রাণভরে এই মহাবিদ্যালয়কে আশীর্বাদ করতে অনুরোধ জানাই। ভারতের আত্মার পুনরুভ্যুদয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে নিজ পুত্রকন্যাকে পাঠিয়ে তাঁরা সবচেয়ে ভালভাবে এর প্রতি আশীর্বচন উচ্চারণ করতে পারেন। অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে ভারতবাসী স্বাধীন। তবে অর্থাভাবে কাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। অগ্রগতি রুদ্ধ হবার কারণ হচ্ছে মানুষের অভাব, নেতার অভাব এবং নেতা জুটলে তার অনুগামীর অভাব। আমি অবশ্য মনে করি যে যোগ্য নায়কের কখনও অনুগামীর অভাব ঘটে না। মেঝে যতই খারাপ হোক না কেন, নাচিয়ে কখনও বলে না যে উঠোন বাঁকা, ঐ উঠোনেই সুষ্ঠুভাবে সে কাজ চালিয়ে নেয়। নেতার বেলাতেও ঠিক এই কথা খাটে। জাতশিল্পী হলে তিনি কাদাকে সোনায় রূপান্তরিত করবেন। আমি প্রার্থনা করি যে তোমাদের অধ্যাপকমণ্ডলী যেন এই জাতীয় জীবনশিল্পী হয়ে ওঠেন।

শুধু শেখায় কোন কাজ হবে না। স্বরাজ অর্জন করতে হলে আমাদের

চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। আমাদের শান্তিময় ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন ত্রুটীযুক্ত হলেও বিদেশী শাসকবর্গের শয়তানোচিত হিংসার সম্মুখীন হবার জন্য এই আমাদের আয়ুধ। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হলে যাতে মুক্তির বীজ সুন্দর স্বরাজ বৃক্ষে রূপায়িত হয়, সেজন্য এ বীজ বপন করে এতে জল সিঞ্চন করতে হবে। চারিত্রশক্তি ছাড়া এর বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তোমাদের শিক্ষকবৃন্দ একথা সদাসর্বদা স্মরণ রাখলে আর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি তাঁরা এ আদর্শ পূর্ণ করার জন্য জীবন পণ করেছেন। আর এর জন্য মৃত্যু বরণ করা তো আসলে চিরজীবি হওয়া।

অধ্যাপকবর্গ তাদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন ধরে নিলে ছাত্রদের আমার আর কিছু বলার থাকে না। ছাত্র বেচারীরা তো প্রচলিত পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি। তারা যদি উদ্যমী, সত্যবাদী ও নির্মল হৃদয়ের না হয়, তবে তার জন্য দোষী হচ্ছেন তাদের পিতামাতা, তাদের শিক্ষকগণ ও তাদের শাসকবর্গ। "যথা রাজা তথা প্রজা" কথাটি যদি সত্য হয়, তবে যেমন প্রজা তেমনি রাজা কথাটিও সত্য। আমাদের জাতীয় চরিত্রের ত্রুটী দূর করার জন্য আমরা অর্থাৎ অভিভাবকবর্গ ও শিক্ষকগণ যেন বদ্ধপরিকর হই।

দেশের প্রতিটি গৃহই হচ্ছে বিদ্যালয় এবং মাতাপিতা তার শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষাদানে বিরত থেকে পিতামাতা তাঁদের পবিত্র কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছেন। বিদেশী সভ্যতার বর্তমান রূপ দেখে এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই এবং এর গুণাগুণ সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ জ্ঞান নেই। আমরা যেন ধার করে বা বরং চুরি করে সভ্যতার বহিরাবরণ ধারণ করেছি। এই চোরাই মালে আমাদের কোন রকম উন্নতি সম্ভব নয়।

এটি আমাদের মুক্তি মন্দির, পুঁথিগত বিদ্যার দেউল নয়। চরিত্র গঠন আমাদের কর্তব্য। একাজে ছাত্রদের মধ্যে আমরা যে মাত্রায় সাফল্য অর্জন করব, স্বরাজ অর্জনের সেই পরিমাণ যোগ্য হয়েছি বলে মনে করব। ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করাই স্বরাজ গড়ে তোলার একমাত্র উপায়। আজ যে ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল তার পিছনে আমাদের নিজ সম্পদ ও হৃদয় সমর্পণ করতে হবে।

কথা বলার সময় আর নেই, কর্মের মহা লগ্ন সমুপস্থিত। যেসব ছাত্র এই জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেছে, তাদের আমি অর্ধেক শিক্ষক বিবেচনা করি। তারা এই মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপন করেছে। এইজন্য তাদের নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এ অনুষ্ঠানের পুরোদস্তুর কুশীলব তারা। তারা যদি নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে গ্রহণ না করে, তবে শিক্ষকদের উদ্যমের অধিকাংশ বৃথা যাবে। কেন তারা সরকারী কলেজ ছেড়ে এ প্রতিষ্ঠানে যোগ

দিয়েছে এবং এখানে তারা কি পাবার আশা রাখে, একথা ছাত্রদের জানতে হবে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হয়তো দীর্ঘকালব্যাপী হবে। ভগবান্ যেন ছাত্রদের শেষপর্যন্ত ঠিক থাকার শক্তি দেন। শেষ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে জনকয়েকও যদি ঠিক থাক, তবে তোমরা শুধু এই মহাবিদ্যালয়ের গর্বের বস্তু বলে আখ্যাত হবে না, তোমরা হবে তোমাদের মাতৃভূমির গৌরব। গুজরাটের ধন সম্পদ ও জ্ঞানের জন্য তোমরা সে মর্যাদা পাবে না, সে সম্মান পাবার কারণ হচ্ছে এই যে এ প্রদেশে অসহযোগের বীজ বপন করা হয়েছে ও অংকুরিত হবার জন্য তাকে যত্ন করা হয়েছে। আত্মপ্রশংসা এ নয়, কারণ আমি তো শুধু জনসাধারণের সামনে এর কল্পনা পেশ করেছিলাম। জনগণই উৎসাহভরে এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে এবং যথোচিত নিষ্ঠা সহকারে আমার বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়। আমার চোখের সামনে ঐ বৃক্ষগুলি যেমন বাস্তব, তেমনি অহিংস অসহযোগও যে ভারতের মুক্তি আনবে এও বাস্তব। আর এই মহাবিদ্যালয় হচ্ছে সেই মহান আন্দোলনের ইন্দ্রিয়গোচর প্রতীক। আমি শুধু এর একটি পত্র এবং তাও শুষ্কপত্র। শিক্ষকরাও এর পত্র, তবে তাঁরা কথঞ্চিৎ সজীব। কিন্তু তোমরা এই ছাত্রের দল হচ্ছ এর শাখা-প্রশাখা এবং এর থেকে একদল নূতন শিক্ষক জন্মলাভ করবে। আমার প্রতি তোমাদের যে আস্থা, সে আস্থা তোমাদের শিক্ষকদের উপরও হোক। তাঁদের ভিতর আদর্শ চিত্তবৃত্তির অভাব দেখলে প্রহ্লাদ যেমন তার পিতাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, তোমরাও তেমনি তাঁদের নাকচ করে তাঁদের ছাড়াই এগিয়ে চল।

আমি কামনা করি যে এই মহাবিদ্যালয় যেন ঈশ্বরের অবদান হয়, এ যেন আমাদের স্বরাজ অর্জনের অন্যতম শক্তিশালী আয়ুধ হয় এবং শুধু ভারতের হিতসাধনেই আমাদের স্বাধীনতারূপী স্রোতস্বতীর জলস্রোত নিঃশেষ না হয়ে সমগ্র বিশ্ব যেন তার কল্যাণধারায় নিষিক্ত হয়।

৮। ইংরাজীর স্থান

আমি বলেছি যে হিন্দুস্থানী শেখার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা যেন পরিবর্তনের সময়, অর্থাৎ হীন অবস্থা থেকে সমমর্যাদায় উন্নীত হবার কালে, বিদেশীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বরাজ অর্জন করার সময়, অসহায় অবস্থা থেকে আত্মশক্তির উপাসক হবার কালে ইংরাজী শিক্ষা মুলতুবী রাখে। আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে আমরা যদি স্বরাজ চাই, তাহলে আমাদের হৃদয়কে স্বরাজপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়

উদ্দীপ্ত করতে হবে এবং সেই শুভদিনটিকে এগিয়ে আনার জন্য আমাদের যথাসাধ্য প্রযত্ন করতে হবে ও যে কাজে সেই শুভলগ্ন এগিয়ে আসে না বা বস্তুতঃ তার আবির্ভাব বিলম্বিত হয়, তেমন কিছু কারও করা উচিত নয়। আমাদের ইংরাজী ভাষার জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা সে আদর্শ পরিপূর্তির পথে আমাদের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে বরং গতি রুদ্ধ হবে। বহুক্ষেত্রে এই গতি রুদ্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কাই সত্য ; কারণ অনেকে বিশ্বাস করেন যে আমাদের কণ্ঠনিঃসরিত ইংরাজী শব্দাবলী তাঁদের কর্ণকুহরে সুর-ঝঙ্কার সৃষ্টি না করলে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রত করা সম্ভবপর নয়। চূড়ান্ত বুদ্ধিহীনতার নিদর্শন এ। এ হলে স্বরাজ "দূর অস্ত"। ইংরাজী আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা, কূটনীতিজ্ঞদের মুখপত্র এই ভাষা এবং বহু সাহিত্য সম্পদের আধার ও এর মারফৎ আমরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতার পরিচয় পেতে পারি। সুতরাং আমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের ইংরাজী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁরা জাতীয় বাণিজ্য বিভাগ ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির কর্ণধার হবেন এবং পশ্চিমের সাহিত্য, চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করবেন। এই হবে ইংরাজীর সমুচিত প্রয়োগ। পক্ষান্তরে ইংরাজী আজকে আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্থান নিয়েছে ও আমাদের মাতৃভাষাকে হৃদি-সিংহাসনচ্যুত করেছে। ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের বিসম সম্পর্কের এক অস্বাভাবিক পরিণতি এ। ইংরাজীর বিন্দুমাত্র জ্ঞান বিনা ভারতীয় লোক-মানসের সর্বোত্তম বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। এই মনোভাবের ফলে এদেশের পুরুষ সমাজ ও বিশেষতঃ নারী সমাজের প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে ; কারণ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা মনে করে যে ইংরাজীর জ্ঞান না থাকলে সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজে স্থান লাভ করা যায় না। এই রকম অপমানকর চিন্তাধারা বরদাস্ত করা যায় না। ইংরাজীর মোহমুক্ত হওয়া স্বরাজপ্রাপ্তির যোগ্যতা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২-২-১৯২১

৯। ঈশ্বর, সম্রাট ও দেশের জন্য

ভ্রমণকালে আমি একবার একদল গণবেশে (য়ুনিফর্ম) সজ্জিত বালক দেখতে পেয়ে তাদের কাছ থেকে তাদের গণবেশের অর্থ জানতে চাইলাম। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম তাদের গণবেশ হয় বিদেশী বস্ত্রে আর নয় বিদেশী সুতার বস্ত্রে প্রস্তুত। শুনলাম, ও হচ্ছে স্কাউটের পোশাক। জবাব শুনে আমার কৌতূহল

গভীর হল। স্কাউট হিসাবে তাদের কি করতে হয়, একথা জানার ইচ্ছা জাগল। জবাব পেলাম যে ঈশ্বর, সম্রাট ও দেশের জন্য তারা জীবনধারণ করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের সম্রাট কে?" জবাব পেলাম, "সম্রাট পঞ্চম জর্জ"।

—তাহলে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? ধর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তুমি যদি সেখানে থাকতে এবং জেনারেল ডায়ার যদি তোমাদের ভীতিবিহ্বল দেশবাসীর প্রতি গুলি চালাতে বলতেন, তাহলে তুমি কি করতে?

—আমি কিছুতেই সে হুকুম মানতাম না।

—কিন্তু জেনারেল ডায়ার তো সম্রাট নির্দিষ্ট গণবেশ পরেছিলেন।

—কথাটা ঠিক। কিন্তু তিনি হচ্ছেন আমলাতন্ত্রের অঙ্গ। ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমলাতন্ত্রকে সম্রাটের থেকে পৃথক করা যায় না; কারণ সম্রাট হচ্ছেন একটি নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমঅর্থ সূচক। সাম্রাজ্যের যে রূপ এখন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তাতে কোন ভারতবাসীর পক্ষে আনুগত্য বলতে ঠিক যা বোঝায়, ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে এই সাম্রাজ্যের প্রতি সে ভাব পোষণ করা সম্ভব নয়। যে সাম্রাজ্য সামরিক আইন বলবৎ করে দেশের বুকের উপর দিয়ে দমননীতির রথ ছোটাবার জন্য দায়ী এবং দুষ্কৃতির জন্য যার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই, পবিত্র দায়িত্বের ভার পদদলিত করে যারা গোপন চুক্তি সম্পন্ন করে, তাকে ঈশ্বরের সম্পর্কবিহীন সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। এরকম সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

ছেলেটি হতচকিত হয়ে পড়ল।

আমি আমার যুক্তি পেশ করতে লাগলাম। "ধর আমাদের দেশ যদি ধনার্জনের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং আমাদের মাতৃভূমি যদি অন্য সকলকে শোষণ করে, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে এবং বাণিজ্য বিস্তার মানসে যুদ্ধ আরম্ভ করে ও ক্ষমতা ও মর্যাদা কায়েম রাখার জন্য ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়, তাহলে যুগপৎ ঈশ্বর ও দেশের প্রতি অনুগত থাকা কি করে সম্ভব? ঈশ্বরের জন্য আমাদের কি দেশকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়? সেইজন্য আমার অভিমত হচ্ছে এই যে তোমরা শুধু ঈশ্বরের প্রতিই বিশ্বাসী ও অনুগত থাকবে। একই অর্থে এবং একই সময়ে আর কারও প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন কোরো না।"

ছেলেটির অনেকগুলি সাথী গভীর আগ্রহভরে এই আলোচনা শুনছিল।

তাদের দলপতিও এগিয়ে এল। তার কাছে আমি আমার যুক্তির পুনরাবৃত্তি করলাম এবং তাকে বললাম যে, সে নিজে যেন খানিকটা ঝক্কি নিয়েও তার নেতৃত্বাধীন বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকদের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তোলে। এই চিত্তাকর্ষক বিষয়ের আলোচনা শেষ হতে না হতেই স্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়ে দিল। ঐসব সুন্দর সুন্দর ছেলেদের সঙ্গ হারিয়ে মনে দুঃখ হল এবং এই সময় অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ ভাল ভাবে আমি বুঝতে পারলাম। মানুষের কাছে একটিমাত্র বিশ্বজনীন নীতি হতে পারে এবং এ হচ্ছে ঈশ্বরানুগত্য। একেবারে বিপরীতধর্মী না হলে সম্রাট, দেশ ও মানবতার প্রতি আনুগত্যও এর ভিতর স্থান পায়। তবে সময় সময় ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে এসবের কোনটার স্থান থাকে না। আমি আশা করি যে দেশের যুব সম্প্রদায় এবং তাদের শিক্ষকবর্গ নিজেদের ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাদের আদর্শের যথোচিত সংস্কার করবেন। যে নীতি ধোপে টেকে না, তাকে সুকুমারমতি তরুণদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৩-৩-১৯২১

১০। পিতামাতার কর্তব্য

"এ বৎসর আমার ২১ বৎসর বয়স্ক তৃতীয় পুত্র বহু ব্যয়ে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেছে। সে সরকারী চাকরি করতে চায় না। জাতির সেবাই তার ধ্যেয়। আমার পরিবারে বারোজন লোক। এখনও পাঁচটি ছেলের শিক্ষা বাকী। কিছু জমিজমা ছিল ; কিন্তু ২০০০৲ টাকার ঋণ শোধ করতে তা বিক্রী করতে হয়েছে। তিনটি ছেলেকে শিক্ষা দিতে আমি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছি। মনে এই আশা ছিল যে তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী পেয়ে আমার রিক্তপ্রায় অবস্থার পুনরভ্যুত্থান করবে। সারা পরিবারের দায়িত্ব সে নেবে বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে সমগ্র পরিবারকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। একদিকে কর্তব্য এবং অন্যদিকে আদর্শের সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। আমি আপনার সুবিবেচনাপ্রসূত সদুপদেশ প্রার্থী।"

এই হচ্ছে একটি বিশিষ্ট ধরণের চিঠির নমুনা। আর বর্তমান শিক্ষার ফলে প্রায় সর্বত্র এই মনোভাবই দৃষ্ট হয় বলে বহুদিন যাবৎ আমি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে এবং আমার সবগুলি ছেলে ও অন্যান্য অনেকের শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে আমি সুফল পেয়েছি বলে মনে করি। উন্মত্তবৎ পদ ও মর্যাদার

পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে ও সুনীতির পথ ছেড়েছে। সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষাদানের অর্থ সংগ্রহের জন্য পিতাকে কি জাতীয় সন্দেহজনক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তা কে না জানে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করলে আমাদের আরও গভীর দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর এক অকিঞ্চিৎকর অংশকে আমরা শিক্ষার সোনার কাঠির ছোঁয়া দিতে পেরেছি। এদের অধিকাংশই শিক্ষা পায় না এবং তার কারণ তাদের অনিচ্ছা নয়। তাদের পিতামাতার জ্ঞান ও সঙ্গতির অভাবের জন্যই এরকম হয়। এর গোড়াতেই কোন গলদ আছে। বিশেষ আমাদের মত দরিদ্র জাতির পিতামাতাকে যদি এতগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যার ভরনপোষণ নির্বাহ করতে হয় ও পুত্রকন্যার কাছ থেকে অবিলম্বে কোনরকম আর্থিক প্রতিদান আশা না করে তাদের যদি এই ব্যয়বহুল শিক্ষা দিতে হয়, তাহলে সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। শিক্ষার সূচনা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এর ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিশ্রম করলে আমি তার ভিতর কিছু অন্যায় দেখি না। সমগ্র ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সকলের উপযোগী সহজতম হাতের কাজ হচ্ছে সুতা কাটা ও এর আনুষঙ্গিক পূর্বক্রিয়া। এই ক্রিয়া আমাদের শিক্ষায়তন সমূহে প্রবর্তিত হলে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে: শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, বালক-বালিকাদের দেহ ও মনের অনুশীলন হবে, এবং বিদেশী বস্ত্র ও সুতা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করার রাস্তা তৈরী হবে। এছাড়া এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনচেতা হয়ে বেরোবে। পত্রলেখককে আমি পরামর্শ দেব যে, পরিবার প্রতিপালনের জন্য পরিবারস্থ প্রত্যেককে তিনি যেন সুতা কেটে ও বস্ত্র বয়ন করে সাহায্য করতে বলেন। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে এই যে নির্ধারিত নূন্যতম পরিমাণ সুতা না কাটলে কোন শিশুর শিক্ষা পাবার অধিকার থাকবে না। এইরকম পরিবার এমন আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন, যা ছিল ইতিপূর্বে স্বপ্নাতীত। এ পরিকল্পনা ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের বাধক নয়, বরং শিক্ষাকে এর দ্বারা প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের আয়ত্বের মধ্যে এনে দেয়। এর ফলে সাহিত্য কেন্দ্রিক শিক্ষার পূর্বতন গৌরব পুঃনপ্রতিষ্ঠিত হয়; কারণ এ পদ্ধতিতে সাহিত্য চর্চা হয় মূলতঃ মানসিক ও নৈতিক সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম। জীবিকার সাধন হিসেবে এর স্থান এর পরে আসে এবং তাও গৌণভাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৫-৬-১৯২১

১১। স্বরাজের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা *

শিক্ষা সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি অতীব বৈপ্লবিক এবং এইজন্য আমার সমালচোকদের কাছে এ একেবারে কিম্ভূতকিমাকার। আমি শুধু স্বরাজের দৃষ্টিকোণ থেকেই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি। সুতরাং আমি চাইব যে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেন সুতা কাটা ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে শেখার জন্য মনোযোগ দেয়। আমি চাই যে তারা খাদির অর্থশাস্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করুক। একটি কাপড়ের কল স্থাপন করতে কত পুঁজি ও সময় লাগে তা তারা জানুক। কাপড়ের কলের অনির্দিষ্ট সম্প্রসারণের সম্ভাবনার সীমা কোথায় এও তারা জানুক। ফলে কাপড় তৈরী হলে কিভাবে সম্পদ বন্টিত হয়, আর হাতে সুতা কেটে তাঁতে বুনে নিলেই বা সম্পদের বণ্টন কেমন ভাবে হয়, তা তাদের জানা প্রয়োজন। সুতা কাটার কল এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকা চাই। ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষকের কুটীরে হাতে সুতা কাটা সুরু হলে তার ফল কি হবে, তা তাদের বুঝে দেখতে হবে, এবং হাতে কলমে এ করেও দেখাতে হবে। পূর্ণমাত্রায় এই কুটীর শিল্পের পুনরভ্যুত্থান হলে হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয়কে এ কেমন ভাবে এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত করবে এ তথ্য তাদের জানা চাই। কিন্তু এসব কল্পনা হয় বিগত কালের, আর নয় আগামীকালের। এ আদর্শ এ যুগের আগেকার বা পরের যাই হোক না কেন, তার জন্য চিন্তা নেই। আমি শুধু এইটুকু জানি যে কোন না কোনদিন ভারতের প্রত্যেকটি শিক্ষিত ব্যক্তি এ পথ গ্রহণ করবেন।

১২। ভাবনগরের বক্তৃতা †

ছাত্রদের ধর্ম বা কর্তব্য সম্বন্ধে আজ আমাকে বলতে হবে। ধর্ম যতটা সহজ ততটাই আবার কঠিন। হিন্দুমতে ছাত্র হচ্ছে ব্রহ্মচারী এবং ছাত্রাবস্থা ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কৌমার্য ব্রত পালন করা ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ অর্থ। এর মূল অর্থ হচ্ছে ছাত্রাবস্থা

---

* অমৃতসরের পাঞ্জাব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ থেকে।

† ভাবনগরের শ্যামলদাস কলেজের ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা।

বা ছাত্রের জীবন। এর অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম। সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সমগ্র অধ্যয়নকালে জ্ঞানার্জন করার নামই ব্রহ্মচর্য। জীবনের এইভাগে প্রতিগ্রহের পরিমাণ বেশী, দান অল্প। এ সময় আমরা মূলতঃ গ্রহীতা। পিতামাতা, অধ্যাপকবর্গ এবং এই বিশ্বের কাছ থেকে যা পাই গ্রহণ করি। কিন্তু গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এখনই যদি প্রতিদানের দায়িত্ব না থাকে, (আর তা নেইও) তাহলে স্বভাবতই ভবিষ্যতে সময় এলে এ ঋণ চক্রবৃদ্ধি সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। এই কারণেই হিন্দুরা ধর্মীয় কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করেন।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জীবন সমঅর্থ সূচক। ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচারী হতে হলে সন্ন্যাসী হতেই হবে। সন্ন্যাসীর কাছে এটা অভিরুচির প্রশ্ন। হিন্দুধর্মের চতুর্বিধ আশ্রমের আজ আর সে পবিত্র মর্যাদা নেই। থাকলে, এর শুধু আজ নামটুকুই আছে। অঙ্কুরেই ছাত্র ব্রহ্মচারীর জীবনকে বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। সেই প্রাচীন আশ্রম প্রথার আজ অবশ্য এমন কিছু অবশিষ্ট নেই, যা বর্তমান যুগের যুবক-যুবতীদের সামনে অনুকরণ ও অনুসরণ যোগ্য আদর্শরূপে তুলে ধরা যেতে পারে। তথাপি সে যুগে যে মূল উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আশ্রম ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এযুগে ছাত্রদের কর্তব্য জানার উপায় কি ? আদর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। ছাত্রদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার নেতৃত্ব নেন পিতামাতা। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের সন্তানকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সামনে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনের পথ খুলে দেওয়া। এইভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যভিচার চলছে এবং বৃথাই আমরা ছাত্রজীবনের শান্তি, সারল্য, মাধুর্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। যে সময় আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ের কোন কারণেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কথা নয়, সে সময় চিন্তা-ভাবনার ভারে তারা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অধ্যয়নকাল তাদের কাছে শুধু গ্রহণ ও সাধিত বিষয় নিজের করে নেবার সময়। তারা এ সময় শুধু গ্রহণীয় আর বর্জনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখবে। শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রকে এইভাবে পার্থক্য করতে শেখানো। নির্বিচারে আমরা যদি সব গ্রহণ করে চলি তাহলে আমরা যন্ত্রের চেয়ে উঁচুদরের কিছু হব না। আমরা চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান জীব। সেইজন্য এই সময়ে সত্য ও অসত্য, মিষ্ট ও রূঢ় ভাষা, পবিত্র ও অপবিত্র জিনিসআদির মধ্যে পার্থক্য করতে শিখব। কিন্তু ছাত্রদের চলার পথ আজকে শুধু ভালমন্দ বিচার করার চেয়ে অনেক কঠিন দায়িত্বে পূর্ণ। আজকের ছাত্রদের বিরুদ্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। ঋষি-গুরুর আশ্রমের পূত পরিবেশের পরিবর্তে আজ তারা শতধাবিচ্ছিন্ন গৃহ ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি

সঞ্জাত কৃত্রিম পরিবেশদ্বারা পরিবেষ্টিত। ঋষিরা বই ছাড়াই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ঋষিরা ছাত্রদের কয়েকটি মন্ত্র দিতেন এবং ছাত্ররা সেগুলিকে বহু মূল্যবান জ্ঞানে অন্তরে ধারণ করে বাস্তব জীবনে তদনুযায়ী চলার চেষ্টা করত। আজকের ছাত্রদের এত বিপুল সংখ্যক পুস্তকের মধ্যে থাকতে হয় যে সেগুলি তার শ্বাসরোধ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের কালে ছাত্রমহলে "রেনল্ডসের" লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল ; কিন্তু আমি ভাল ছেলের ধার ঘেঁষেও না যাওয়ায় স্কুলপাঠ্য বইএর বাইরে তাকাইনি। তবে ইংলণ্ডে যেয়ে দেখলাম যে ভদ্রসমাজে এসব উপন্যাস অস্পৃশ্য এবং ওসব না পড়ে আমার কোন লোকসান হয়নি। এইরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে যা ছাত্ররা অক্লেশে বাতিল করতে পারে। এই জাতীয় একটি ব্যাপার হচ্ছে নিজ ভবিষ্যৎ গড়ার অশোভন ব্যগ্রতা। এ সম্বন্ধে ভাববে গৃহস্থ। ব্রহ্মচারী ছাত্রের ধর্ম এ নয়। তাকে নিজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে, সামনে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ, তার ব্যাপকতা তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে তাকে অবহিত হতে হবে। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সংবাদপত্র পড়। এ অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করতে বলা আমার উচিত নয় বলে আমি মনে করি। তবে স্বল্পকালীন গুরুত্বের সব কিছু যাতে তোমরা না পড় সে কথা আমি তোমাদের বলব এবং আমার মনে হয় সংবাদপত্রে স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু থাকে না। চরিত্র গঠনের উপাদান এতে কিছুই থাকে না। তবুও সংবাদপত্রের জন্য দেশবাসীর উন্মত্ততার বিষয়ে আমি জানি। এ এক করুণ আতঙ্কজনক অবস্থা।

চরকা অতীব নির্দোষ অথচ এত অধিকমাত্রায় মঙ্গলকারী ক্ষমতা রাখে বলে চরকার বাণী সর্বদা এবং সর্বত্র প্রচার করতে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। চরকার বাণী হয়তো খুব রুচিকর মনে না হতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। মুখরোচক মশলাযুক্ত খাদ্যের চেয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য স্বাদিষ্ট নয়। সুতরাং গীতার একটি সুন্দর শ্লোকে প্রত্যেকটি বিচারশীল ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যে প্রথমাবস্থায় বিস্বাদ অথচ পরিণামে অমরত্বপ্রসূ দ্রব্যই যেন তারা গ্রহণ করে। আজ চরকা এবং তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে এই আখ্যা দেওয়া যায়। অশান্ত চিত্তে শান্তিবারি সেচনকারী, পথভ্রান্ত ছাত্রজীবনকে কল্যাণস্পর্শে সঞ্জীবিত-করণক্ষম ও তাদের জীবনকে আধ্যাত্মিকতার পরশদায়ী শক্তির উৎস হচ্ছে সুতা কাটা এবং তাই এর চেয়ে বড় যজন আর নেই। বাস্তবের পূজারী এই যুগ অবিলম্বে ফললাভাকাঙ্ক্ষী বলে দেশকে আমি চরকার চেয়ে শ্রেয় কোন ব্যবস্থাপত্র দিতে পারি না, এমন কি গায়ত্রীর কথাও এখন তুলতে পারি না। গায়ত্রী মন্ত্র অবশ্য সানন্দে আমি তোমাদের

দেব ; কিন্তু তাতে অবিলম্বে কোন ফল লাভ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। পক্ষান্তরে আমি যে জিনিসটির কথা বলছি তা গ্রহণ করলে যুগপৎ মুখে ঈশ্বরের নাম এবং হাতে কাজ চলবে ও তোমরা অবিলম্বে এর দ্বারা উপকৃত হবে। জনৈক ইংরেজ বন্ধু লিখেছেন যে তাঁর ইংরেজ সুলভ সাধারণ বিচার বুদ্ধি তাঁকে বলছে যে সুতাকাটা নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর শখ। তাঁকে আমি বলি, "আপনাদের কাছে এ একটি সুন্দর অবসর বিনোদনের উপায় হতে পারে ; কিন্তু আমাদের কাছে এ কল্পতরু"। পশ্চিমের অনেক কিছু আমি পছন্দ করি না ; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে, যার প্রতি আমার অনুরাগ গোপন করতে পারি না। তাদের 'অবসর বিনোদন' সম্যক অর্থসূচক। সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক কর্ণেল মেড্‌ডক নিজ কার্যে অসীম তৃপ্তি পেলেও সদাসর্বদা ঐ নিয়ে থাকতেন না। দু' ঘণ্টা তিনি বাগান করার শখের জন্য ব্যয় করতেন এবং এই বাগান করা তাঁকে সাহস ও উদ্দীপনা দিত ও তাঁর জীবনকে রূপে রসে গন্ধে ভরে তুলত।

১৩। পিতামাতার দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান

বঙ্গদেশ পরিভ্রমণকালে আমি এই মর্মে একটি আশ্চর্যজনক সংবাদ পেলাম যে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নিজ পিতামাতার ভরনপোষণ নির্বাহের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহ করা অধিকতর কাম্য মনে করেন। শুনলাম, এতে আমার সম্মতি আছে বলে বলা হচ্ছে। এই পত্রিকায় আমি যদি এমন কিছু লিখে থাকি যাতে পাঠকদের পূর্বোক্ত ধারণা হতে পারে, তাহলে তার জন্য আমি ক্ষমা-প্রার্থী। এরকম কোন অপরাধ সম্বন্ধে আমি সচেতন নই। আমার সব কিছুর জন্য আমি পিতামাতার কাছে ঋণী। "শ্রাবন" তাঁর পিতামাতার প্রতি যেরূপ আচরণের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, নিজ পিতামাতার প্রতিও আমি অনুরূপ ভাব পোষণ করি। সুতরাং পূর্বোক্ত সংবাদ শ্রবণ করার পর অতিকষ্টে আমাকে ক্রোধ দমন করতে হয়েছে। যে যুবকটি এ ব্যাপার করেছে সে ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আজকাল একটু উন্নাসিক মনোভাব প্রকাশ করা এবং নিজেদের নৈষ্ঠিক আদর্শবাদী মনে করা অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মতে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বৃদ্ধ অশক্ত পিতামাতার ব্যয় নির্বাহ করা। পিতামাতার স্বাচ্ছন্দ বিধানে অপারগ হলে তারা বিবাহ না করতে পারে। এই প্রাথমিক সর্ত পূর্ণ না হলে তাদের জনসেবার কাজ হাতে নেওয়া উচিত নয়। পিতামাতার

অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার জন্য প্রয়োজন বিধায়ে তাদের উপবাস করতে হবে। তবে ছেলেরা অবশ্য একটি জিনিস করবে না এবং তা হচ্ছে এই যে, বিবেচনা শক্তি বিহীন ও অবুঝ পিতামাতার দাবীর কাছে নতি স্বীকার করবে না। অনেক পিতামাতা জীবন নির্বাহের জন্য নয়, অহেতুক আড়ম্বর অনুষ্ঠান বা কন্যার বিবাহের কারণে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করার জন্য টাকা চান। আমার মতে জনসেবকদের কর্তব্য হচ্ছে সবিনয়ে এ দাবী প্রত্যাখান করা। সত্যি কথা বলতে কি কোন সত্যকার জনসেবক উপবাসে কালাতিপাত করছেন, এমন ব্যাপার কখনও আমার চোখে পড়েনি। অনেককে আমি অভাবের মধ্যে কাটাতে দেখেছি। এমনও কয়েকজনকে দেখেছি, যা'রা যা নেয় তার চেয়ে তাদের বেশী পাওয়া উচিত। তবে তাদের কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যেমন তার মূল্য বুঝবে, তখন আর তাদের অভাব থাকবে না। দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে মানুষ গড়ে ওঠে। এ হচ্ছে সুষ্ঠু বিকাশের নিদর্শন। প্রতিটি যুবক যদি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয় এবং অভাবের নাম যদি তারা না জানে, তাহলে চরম পরীক্ষার দিনে তারা অযোগ্য বলে সাবুদ হবে। ত্যাগই আনন্দ।

সুতরাং জনসাধারণের চোখের উপর নিজের ত্যাগের নিশান তুলে ধরা অনুচিত। কয়েকজন কর্মী আমাকে বলে যে তারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে বিচলিত নয়। জেরায় জানতে পারলাম যে তাদের ত্যাগের অর্থ হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি অর্থাৎ চাঁদা তুলে খাওয়া। অনেক জনসেবক অবশ্য এভাবে কাটিয়েছেন; কিন্তু তার জন্য কেউ ত্যাগ করছেন বলে দাবী করেননি। বহু যুবক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ছেড়েছে। এজন্য তারা অবশ্যই প্রশংসার্হ। তবে সবিনয়ে আমি এই কথাটি নিবেদন করব যে এক্ষেত্রেও অহেতুক প্রশস্তি বাচন করা হয়। আনন্দ অনুভব না করলে কোন ত্যাগের অর্থ নেই। ত্যাগ এবং বিরস বদন—এ দুটি একসাথে হয় না। ত্যাগের অর্থ 'পবিত্র করা।' ত্যাগের জন্য যে সহানুভূতি প্রার্থী তাকে মানবতার এক হতভাগ্য নিদর্শন বলতে হবে। বুদ্ধ যে সব কিছু ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে তাঁর এ ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁর কাছে কিছুর স্বামীত্ব অর্থে আত্মপীড়ন। অর্থশালী হওয়া কষ্টকর ব্যাপার বলে লোকমান্য দরিদ্র রয়ে গেলেন। এনড্রুজ মাত্র দু'এক টাকা থাকাই বোঝা বলে মনে করেন এবং তাই দু'চারটাকা হাতে এসে গেলে সর্বদা তাকে বিদায় করার জন্য চেষ্টা করেন। সময় সময় তাঁকে আমি বলি যে এইজন্য তাঁর একজন অভিভাবক দরকার। ধৈর্য ধরে তিনি আমার কথা শোনেন এবং তারপর হাসেন। তবে তিনি যা করতেন তার ব্যতিক্রম করেন না। "ভারত মাতা" দেবীটি বড়ই

ভীষণা। "বেশ বাবা, বেশ। এবার হয়েছে।" বলার আগে তিনি আরও বহু যুবক-যুবতীর বলিদান গ্রহণ করবেন। স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারীর দান তিনি নেবেন, আবার অনিচ্ছুকের কাছ থেকেও জোর করে আদায় করবেন। এযাবৎ আমরা "ত্যাগ ত্যাগ খেলা" করেছি। আসল আত্মত্যাগের দিন পরে আসছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৫-৬-১৯২৫

১৪। একটি ছাত্রের প্রশ্ন

আমেরিকায় পাঠরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জনৈক ছাত্র লিখছে :—"ভারতের দারিদ্র্য অপনোদনের জন্য ভারতের সম্পদাবলী নিয়োগের কথা যারা ভাবেন, আমি তাদের মধ্যে একজন। এদেশে এই ছয় বৎসর হল এসেছি। উদ্ভিদ রসায়ন নিয়ে আমি চর্চা করছি। ভারতের শিল্পোন্নতির গুরুত্ব সম্বন্ধে এইরকম গভীর ভাবে বিশ্বাস না করলে আমি হয়তো সরকারী চাকরি নিতাম, আর নয় চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করতাম।...আমার কাগজের খণ্ড বা কাগজ উৎপাদনের মত শিল্পে যোগদান করা কি আপনি সমর্থন করেন? ভারতের জন্য একটি সুবিবেচনা প্রসূত মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনার কি অভিমত? আপনি কি বৈজ্ঞানিক প্রগতি চান? বৈজ্ঞানিক প্রগতি বলতে আমি অবশ্য ফ্রান্সের ডাঃ পাস্তুর, টোরিয়োণ্টোর ডাঃ বেণ্টিং এর গবেষণার মত মানব-কল্যাণকর আবিষ্কার বুঝি।"

সব জায়গার ছাত্রদের কাছ থেকে আমার কাছে এত প্রশ্ন আসে এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার অভিমত সম্বন্ধে এত ভুল ধারণা আছে যে এই প্রশ্নটির প্রকাশ্য উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন বোধ করছি। ছাত্রটি যে ধরণের শিল্পোন্নয়নের কথা ভাবছে তাতে আমার কোনরকম আপত্তি নেই। তবে এর জন্যই একে আমি মানবতাপূর্ণ বলব না। আমার কাছে ভারতের পক্ষে মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা হচ্ছে হাতে সুতাকাটার গৌরবজনক পুনরভ্যুত্থান। কারণ শুধু এর দ্বারাই যে দারিদ্র্য এদেশের কোটী কোটী পর্ণকুটিরের অধিবাসীর জীবনকে কীটদষ্ট ফুলের মত নষ্ট করছে, অবিলম্বে তা দূর হতে পারে। দেশের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আর সব এরপরে করা যেতে পারে। সুতরাং নিজের চরকাকে ভারতের কুটীরসমূহের পক্ষে উৎপাদনের অধিকতর কার্যকুশল যন্ত্রে পরিণত করার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি যুবক স্বীয় প্রতিভা নিয়োগ করুক এই আমি চাই। আমি বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধবাদী নই। পক্ষান্তরে পশ্চিমের

বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে আমার প্রশস্তিবাচন যদি কোথাও সীমীত হয়ে থাকে তবে তার কারণ হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন না। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথা আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। তথাকথিত বিজ্ঞান ও মানবতার নামে নিরীহ জীবহত্যা করাকে আমি ক্ষমার অযোগ্য মনে করি এবং এর প্রতি বিরাগ পোষণ করি। নিরাপরাধের রক্তরঞ্জিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আমি অহেতুক বিবেচনা করি। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ ছাড়া যদি রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন সম্ভব না হয়, তবে এমন জ্ঞান ছাড়াই মানুষের চলবে। আমার মনে হয় সেদিন দূরে নয়, যেদিন ইউরোপের সৎ বৈজ্ঞানিকরা জ্ঞানার্জনের বর্তমান উপায়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। মানবতার ভবিষ্যৎ মূল্যমান শুধু মানব সম্প্রদায়ের কথাই ভাববে না, ভবিষ্যতে সকল জীবের কথাই বিবেচনা করা হবে। আজ যেমন আমরা ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবেই একথা উপলব্ধি করছি যে আমাদের এক-পঞ্চমাংশকে নরক সদৃশ অবস্থায় ফেলে রেখে হিন্দুত্বের বিকাশ অসম্ভব, অথবা প্রাচ্য দেশ ও আফ্রিকার জাতিসমূহকে শোষণ ও হতমান করে যেমন পাশ্চাত্য জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা ও সমৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব, তেমনি সময়কালে আমরা বুঝতে পারব যে, সৃষ্টির নিম্নস্তরের জীবের চেয়ে আমরা উচ্চ পর্যায়ের বলে তাদের হত্যা করাতে আমাদের মহত্ব নেই, বরং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মঙ্গল বিধানই আমাদের উচ্চতার নিদর্শন। কারণ এবিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে, আমারই মত তাদের আত্মা বিদ্যমান।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৭-১২-১৯২৫

১৫। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বাণী *

সংখ্যা গৌরবে উল্লসিত হয় ভীরু। শৌর্যবানের গৌরব একক সংগ্রামে এবং তোমরা সকলে সেই শৌর্যের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে এসেছ। তোমরা এক বা একাধিক যাই হও না কেন, মনের এই সাহসিকতাই হচ্ছে আসল বীরত্ব এবং আর সব কিছু মিথ্যা। আর ত্যাগ, দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও বিনয় ছাড়া মনের এই সাহসিকতা অর্জন করা যায় না।

আত্মশুদ্ধির ভিত্তিতে আমরা এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছি। অহিংস

* ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন আহমেদাবাদেব গুজরাট মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে পঠিত ভাষণ। ঐ দিন গান্ধীজীর মৌনব্রত ছিল।

অসহযোগ এর একটি অঙ্গ। অহিংস ও অসহযোগের এই "অ"-এর অর্থ হচ্ছে হিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কিছু অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ। তবে যতদিন না আমরা 'অস্পৃশ্য' ভাইদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, যতদিন না বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদের ভিতর হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতদিন না দেশের জনগণের সুমহান মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ আমরা চরকা ও খদ্দরকে জীবনের অঙ্গীভূত করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, ততদিন এই নঙর্থক পূর্ব সংযোজনাটি সম্পূর্ণরূপে অহেতুক। সে অসহযোগ অহিংসা-ভিত্তিক না হয়ে ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। গঠণমূলক নির্দেশ ছাড়া শুধু নেতিবাচক বিধান হচ্ছে প্রাণহীন দেহের মত এবং অগ্নিতে অর্পণ করাই হচ্ছে এর সদুপযোগ। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের জন্য সাত হাজার রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান। এই সাত হাজার জনপদকেও আমরা চিনি বলে দাবী করতে পারি না। রেল স্টেশন থেকে দূরে অবস্থিত গ্রামগুলি সম্বন্ধে আমরা শুধু ইতিহাস বই থেকে সংবাদ পেয়ে থাকি। এইসব গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ-সাধনকারী একমাত্র প্রেমবন্ধন হচ্ছে চরকা। এই মৌলিক সত্য যারা এখনও বোঝে নি, তাদের এখানে থাকা নিরর্থক হয়েছে। যে শিক্ষা ভারতের এই কোটী কোটী বুভুক্ষু জনতার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করে না ও এদের অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট করে না, তাকে "জাতীয়" আখ্যা দেওয়া চলতে পারে না। কর সংগ্রহের পর সরকারের সঙ্গে গ্রামের আর সম্পর্ক থাকে না। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সূত্রপাত হয় চরকার দ্বারা তাদের সেবার সূচনায়। তবে সেখানেই কিন্তু তার পরিসমাপ্তি নয়। চরকা হচ্ছে এই সেবাকার্যের কেন্দ্রবিন্দু। তোমাদের আগামী অবকাশ যদি কোন সুদূর গ্রামে কাটাও তবে আমার কথার যথার্থতা বুঝতে পারবে। দেখবে যে সেখানকার অধিবাসীরা নিরানন্দ ও ভয়ভীত। বহু ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দেখবে। বৃথাই তোমরা কোনরকম স্বাস্থ্যরক্ষা বা ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা খুঁজে বেড়াবে। পশুগুলির অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখবে ; কিন্তু তবুও সেখানে দৃঢ়মূল আলস্য চোখে পড়বে। লোকে তোমাদের জানাবে যে বহুদিন আগে ঘরে ঘরে চরকা ছিল ; তবে আজ তারা চরকা বা অন্য কোন কুটীরশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। তাদের ভিতর আশার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। ইচ্ছা করলেই মরা যায় না বলে তারা বেঁচে আছে। তোমরা যদি সুতা কাট, তাহলেই তারা সুতা কাটা ধরবে। ৩০০ জন অধ্যুষিত কোন গ্রামের ১০০ জনও যদি সুতা কাটে তাহ'লে তারা যে বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা রোজগার করতে পারে, এটা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই অতিরিক্ত উপার্জনের ভিত্তিতে গ্রাম

সংস্কারের স্থায়ী বনিয়াদ স্থাপিত হতে পারে। আমি জানি যে একথা বলা সহজ, কিন্তু করে দেখানো খুব কঠিন। বিশ্বাস থাকলে একাজ সহজে হতে পারে। মোহ আমাদের কানে কানে বলবে, 'আমি একা হাতে সাত লক্ষ গ্রামে কি করতে পারি ?' এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ স্থরু কর যে একটি মাত্র গ্রামে কাজ স্থরু করে সফল হলে বাদবাকী সব আপনি হবে। তাহলে প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। এই বিদ্যালয় তোমাদের ঐ জাতীয় কর্মীরূপে গড়তে চায়। একাজে যদি আনন্দ না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এ বিদ্যালয় আনন্দবিহীন এবং একে ছেড়ে যাওয়া উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৭-৬-১৯২৬

১৬। আত্মত্যাগ

আমার সামনে একাধিক যুবকের নিকট হতে প্রাপ্ত এমন সব পত্র রয়েছে যার লেখকরা অভিযোগ করেছে যে জনসেবার ক্ষেত্রে তারা যে মাসোহারা পায় তা তাদের পারিবারিক প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। একজন সেই-জন্য বলেছে যে, সে জনসেবার কাজ ছেড়ে দিয়ে ধার করে বা চেয়েচিন্তে কিছু টাকা জোগাড় করে ইউরোপে গিয়ে তার উপার্জন-ক্ষমতা বাড়াবে। আর একজন বেশী মাইনের চাকরি খুঁজছে এবং অন্য একজন আবার কোন লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার জন্য কিছু পুঁজি চেয়েছে। এইসব যুবকদের মধ্যে প্রত্যেকেই খাঁটি, সৎ এবং আত্মত্যাগী কর্মী। কিন্তু এদের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পারিবারিক প্রয়োজন বেড়ে গেছে। খাদি বা জাতীয় শিক্ষায় তাদের অন্তর তৃপ্ত নয়। আরও টাকা চেয়ে তারা জনসেবা কার্যের বোঝা হতে চায় না। কিন্তু এই মনোভাব সর্বদা ব্যাপক হলে এর ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে—হয় যেসব জনসেবা-মূলক কাজে এই জাতীয় যুবক-যুবতীর সেবা প্রয়োজন, সেসব বন্ধ করে দেওয়া, অথবা এইসব কর্মীদের মাসোহারা একধার থেকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে যাওয়া এবং এর ফলেও এই একই রকম অবাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছাতে হবে।

আমাদের পরিবেশের সঙ্গে তাল দিয়ে এইভাবে আমাদের প্রয়োজন ক্রমাগত দ্রুতহারে বেড়ে চলে—এই তথ্য জানার পর অসহযোগের কল্পনা মাথায় আসে। এইভাবে যে অসহযোগ আন্দোলনের কল্পনার উদ্রেক হয়, তা কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। যে পদ্ধতি আমাদের তার সর্পিল আলিঙ্গনে জড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছে, এ অসহযোগ সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে। দেশের সর্বসাধারণের

অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে এই পদ্ধতি আমাদের জীবনমান উন্নত করতে কৃতকার্য হয়েছে। আর ভারত অন্যদেশের শোষণের উপর নির্ভরশীল নয় বলে দেশের মধ্যবিত্ত অর্থাৎ মধ্যসত্বভোগীদের বিকাশের অর্থ দাঁড়িয়েছে সর্ব নিম্নশ্রেণীর বিলুপ্তি। সুতরাং ক্ষুদ্রতম পল্লীটিও অতি পরিশ্রমের চাপে মরণোন্মুখ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই আমাদের অনেকের কাছে একথা স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। এ আন্দোলনের এখন শৈশবাবস্থা। হঠাৎ কোন কিছু করে এ আন্দোলনের পথে বাধক হওয়া উচিত নয়।

পাশ্চাত্য প্রথায় যৌথ পরিবারের স্থান নেই বলে আমাদের এই কৃত্রিম প্রয়োজন বৃদ্ধি বড় বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। যৌথ পরিবার প্রথা প্রাচীন হবার সঙ্গে সঙ্গে এর ত্রুটীগুলি বড় রূঢ়ভাবে দেখা দিচ্ছে এবং এর যাবতীয় মাধুর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইভাবে দোষের উপর দোষ বাড়ছে।

সুতরাং আমাদের আত্মত্যাগ হবে দেশের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে। বাইরে থেকে ভিতরের সংস্কারের প্রয়োজন অধিক। গলিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ শাসনতন্ত্র হবে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত।

অতএব আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বিকাশ করতে হবে। আত্মত্যাগ বৃত্তির সম্প্রসারণ করতে হবে। অতীতের ত্যাগ মহান হলেও দেশমাতৃকার বেদীমূলে যে ডালি দেওয়া প্রয়োজন তার তুলনায় এযাবৎ কিছুই হয়নি। পরিবারের মধ্যে যিনি সুস্থ হয়েও কাজ করবেন না, তাঁকে দেখা আমাদের কর্তব্য নয়। এ ব্যাপারে নর বা নারীর পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই। সামাজিক ভোজ বা ব্যয়বহুল বিবাহের অনুষ্ঠানাদি নিরর্থক ও অজ্ঞতাপ্রসূত প্রথার জন্য আমাদের এক কপর্দক ব্যয় করা উচিত হবে না। প্রতিটি বিবাহ ও মৃত্যু পরিবারের প্রধানের উপর অহেতুক এক নিষ্ঠুর বোঝার মত চেপে বসে। এসব কাজকে আমরা আত্মত্যাগ ও আত্মসুখ বর্জনের দৃষ্টান্ত বলে মানব না। দৃঢ়তা ও সাহসিকতা সহকারে এসব পাপের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর আবার আমাদের অতীব ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের যখন দিন চালানো দায় এবং হাজার হাজার লোক যখন অনশনে মৃত্যুবরণ করছে, তখন নিজের আত্মীয়-স্বজনকে ব্যয়বহুল শিক্ষা দেবার কথা চিন্তা করাও পাপ। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ ঘটবে। এর জন্য স্কুল বা কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আটক থাকার দরকার নেই। আমাদের মধ্যে জনকয়েক যখন এই তথাকথিত উচ্চশিক্ষাকে অগ্রাহ্য করবে, তখন খাঁটি উচ্চশিক্ষা দেওয়া ও

নেওয়ার উপায় আবিষ্কৃত হবে। ছাত্রদের পক্ষে নিজ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের উপায় নেই, না খুঁজে পাওয়া যায় না? হয়তো এরকম কোন উপায় নেই। এরকম উপায় আছে কি নেই সেকথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা যখন দেখব যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা অতীব কাম্য, অথচ ব্যয়বহুল শিক্ষার শরণ নিতে আমরা রাজি নই, তখন অধিকতর মাত্রায় আমাদের পরিবেশের অনুকূল উচ্চশিক্ষা পাবার এবার একটি উপায় আবিষ্কৃত হবে। এসব ক্ষেত্রে সেরা নীতি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক যা পায় না তা নিতে অস্বীকার করা। এই অস্বীকার করার শক্তি অকস্মাৎ আমাদের মধ্যে উদিত হবে না। এর জন্য প্রথমে লক্ষ লক্ষ লোক যে সুযোগ-সুবিধা পায় না তা নিতে অস্বীকার করার মত চিত্তবৃত্তির অনুশীলন দরকার এবং তারপর অবিলম্বে আমাদের জীবনকে এই আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা দরকার।

আমার মতে এই জাতীয় এক বিশাল, অতি বিশাল আত্মোৎসর্গকারী দৃঢ়চেতা কর্মীবাহিনী বিনা জনগণের সত্যকার প্রগতি অসম্ভব এবং সেই রকম প্রগতি বিনা স্বরাজ বলে কোন কিছু পাওয়া যাবে না। দরিদ্রদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ কর্মীর সংখ্যা ঠিক যতটা বৃদ্ধি পাবে, আমাদের স্বরাজাভিমুখী প্রগতিও সেই অনুপাতে বাড়বে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৪-৬-১৯২৬

১৭। "মহাত্মাজীর নির্দেশ"

জনৈক শিক্ষক লিখছেন :—

"আমাদের স্কুলে অল্প কয়েকজন ছেলের একটি দল আছে যারা মাসকয়েক যাবৎ নিয়মিত ভাবে অখিল ভারত চরকা সঙ্ঘকে নিজ হাতে কাটা ১০০০ গজ করে সুতা পাঠাচ্ছে এবং আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তারা এই যৎসামান্য সেবা-কার্য করে থাকে। কেউ তাদের সুতা কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছাত্ররা জবাব দেয়, 'মহাত্মাজীর নির্দেশ এটা, এ মানতেই হবে।' আমার মতে ছোট ছোট ছেলের এরকম মনোভাবকে সর্ববিধ উপায়ে প্রোৎসহিত করা উচিত। দাসত্ব মনোবৃত্তি এবং বীরপূজা বা গভীর আনুগত্যের মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য। এইসব ছেলেরা আপনার হাতের প্রেরণাদায়ী আশীর্বাণী পেতে উদগ্রীব। এদের অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন, এবিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়।"

এই চিঠিতে যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা বীরপূজা না অন্ধ অনুকরণ তা

আমি বলতে পারি না। আমি মানি যে এমন অনেক সময় আসে যখন যুক্তির জন্য অপেক্ষা না করে গভীর আনুগত্যের প্রয়োজন ঘটে। নিঃসংশয়েই একে সৈনিকোচিতো গুণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আর দেশের বহুল সংখ্যক অধিবাসীর এগুণ না থাকলে জাতির পক্ষে প্রভূত পরিমাণে অগ্রগতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন সুসংবদ্ধ সমাজে এজাতীয় আনুগত্য প্রকাশের অবকাশ আসে কদাচিৎ এবং এ রকম অবকাশ বেশী আসা উচিতও নয়। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হীন অবস্থা যা আমি কল্পনা করতে পারি, তা হচ্ছে শিক্ষকের প্রতিটি কথা অন্ধভাবে অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে, শিক্ষকগণ যদি স্বীয় অধীনস্থ বালক-বালিকাদের মনের যুক্তিবাদকে বাড়িয়ে গেলেন, তাহলে ক্রমাগত তাদের বিবেচনা শক্তির চর্চা হবে ও তারা স্বয়ং ভাবতে শিখবে। যেখানে যুক্তির অবসান, বিশ্বাসের সূত্রপাত সেখানে। কিন্তু বিশ্বে এমন ব্যাপার অতি অল্পই ঘটে যার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন শিক্ষকের এমন অবস্থা বরদাস্ত করা উচিত নয়, যেখানে ছাত্ররা কুঁয়ার জলের বিশুদ্ধতার প্রতি সন্দেহের কারণ উদ্রেক হওয়ায় জল ফুটিয়ে খাচ্ছে অথচ এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিচ্ছে যে এটা কোন এক মহাত্মার নির্দেশ। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে ছাত্রদের উত্তর যদি সন্তোষজনক না হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহেই যে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সুতা কাটার কারণ সম্বন্ধে ঐ রকম জবাব দিয়েছে, তাদের উত্তরও অনুমোদন যোগ্য নয়। ঐ বিদ্যালয় থেকে আমার মহাত্মাগিরি যখন ছুটে যাবে (আমি ভালভাবেই জানি যে এরকম অনেক জায়গা থেকে আমার মহাত্মাগিরি ছুটে গেছে ; সেসব জায়গা থেকে অনেকে কৃপাপরবশ তাঁদের হৃত প্রীতির সংবাদ আমাকে জানিয়েছেন) তখন সেখানকার চরকা নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমার মনে আশঙ্কা বিদ্যমান। আদর্শ নিঃসন্দেহে ব্যক্তির চেয়ে বড়। চরকা নিশ্চয় আমার চেয়ে মহীয়ান। যখন আমি দেখব যে বীর বলে আমি যে পূজা পাচ্ছিলাম তা বন্ধ হয়ে যাবার দরুণ চরকার মত এক মহান আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন আমি সাতিশয় দুঃখিত হব। কারণ আমি হয়তো কোন রকম মূঢ়তা সঞ্জাত ভুল করতে পারি বা কোন না কোন কারণে লোকে হয়তো আমার প্রতি বীতস্পৃহ হতে পারে। সুতরাং স্বয়ং ছাত্রদের দ্বারা এসব ব্যাপারের কারণ আবিষ্কৃত হওয়া সর্বোত্তম পন্থা। চরকার আদর্শ অবশ্যই যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমার মতে এর মধ্যে ভারতের সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিহিত। ছাত্ররা সেইজন্য জনগণের তীব্র দারিদ্র্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবে। নিজের চোখে তারা এমন দুই একটি গ্রাম দেখবে, যা দারিদ্র্যের পেষণে চুরমার হয়ে পড়ছে। ভারতের জনসাধারণকে তারা চিনবে।

এই উপমহাদেশের সুবিপুল বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি আসা চাই এবং একথা বোঝা চাই যে দেশের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ব্যাক্তি তাদের যৎসামান্য সঙ্গতি বৃদ্ধির জন্য এই কাজটিই শুধু করতে পারে। এদেশের দীন ও দরিদ্রতম ব্যক্তির সঙ্গে তারা একাত্ম হতে শিখবে। দরিদ্রতম ব্যক্তিটি যেসব জিনিস পায় না, যথাসম্ভব সেসব বর্জন করার শিক্ষা তারা গ্রহণ করবে। তাহলে তারা সুতাকাটার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবে। তাহলেই আমার সম্বন্ধে মোহমুক্ত হওয়া বা ঐ জাতীয় আপাত-প্রাপ্তি সত্ত্বেও চরকা ঠিকমত চলবে। চরকার আদর্শ এত মহৎ ও এত মঙ্গলদায়ক যে এর জন্য শুধু বীরপূজার উপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানসম্মত অর্থশাস্ত্রের উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

আমি জানি যে পত্রলেখক যেরকম উদাহরণ পেশ করেছেন, দেশে এরকম অন্ধ বীরপূজার অপ্রতুলতা নেই। তবে আমি আশা করি যে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায় আমি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলাম তার কথা স্মরণ রাখবেন এবং কোন ব্যক্তির যত সুখ্যাতিই হোক না কেন, ছাত্রদের কোন কাজকে অন্ধভাবে তাঁদের বক্তব্যের আধারে পরিচালিত হবার সুযোগ দেবেন না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৪—৬—১৯২৬

১৮। প্রার্থনায় আস্থা নেই

একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে জনৈক ছাত্র প্রার্থনা সভায় উপস্থিতির হাত থেকে রেহাই চেয়ে যে পত্র লিখেছে তা উদ্ধৃত করছি :—

"ঈশ্বর বলে এমন কিছুর অস্তিত্ব আমি মানি না, যার কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজন আছে। সুতরাং আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমার প্রার্থনায় আস্থা নেই। আমার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমি যদি তাঁর প্রতি দৃকপাত না করে শান্ত সমাহিত চিত্তে নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে চলি, তবে তাতে ক্ষতি কি ?

সমবেত প্রার্থনার কথা বিবেচনা করলে মনে হয় যে এর কোন প্রয়োজন নেই। একত্র সমবেত এত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে কি যতই নগণ্য বিষয় হোক না কেন, কোন ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা সম্ভব? অপরিণত বয়স্ক ও অজ্ঞ শিশুর দল চপল চিত্তের প্রভাব কাটিয়ে আমাদের পুরাণাদিতে উক্ত ঈশ্বর, আত্মা, সকল জীবে সমভাব আদি উচ্চ কোটীর ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হবে—এই কি আমরা আশা করি ? এই আচারের অনুষ্ঠান হয় বিশেষ একটি মুহূর্তে বিশেষ এক

ব্যক্তির নির্দেশে। এইরূপ কোন যন্ত্রবৎ চালিত অনুষ্ঠানের দ্বারা কি ছেলেদের হৃদয়ে তথাকথিত প্রভুর প্রতি প্রেমভাব দৃঢ়মূল হতে পারে? সব রকম স্বভাবের মানুষের কাছ থেকে একই রকম ব্যবহার আশা করার চেয়ে অযৌক্তিক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং প্রার্থনা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। যাদের অভিরুচি আছে, তারা প্রার্থনায় যোগদান করুক এবং যাদের আগ্রহ নেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। হৃদয়ে অবিশ্বাস নিয়ে যা কিছু করা যায়, তা দুর্নীতিপূর্ণ হীন কার্য।"

প্রথমে আমরা শেষের কথাটার মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করব। নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার আগে তা মেনে চলা কি দুর্নীতিমূলক বা হীন কাজ? বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাবার পূর্বে সে বিষয় অধ্যয়ন করা কি দুর্নীতি বা নীচ কার্য? তাহলে কোন ছেলে মাতৃভাষা পড়া নিষ্প্রোয়জন বোধ করলে তাকে এর থেকে রেহাই দিতে হবে। তার চেয়ে এই কথাই কি অধিকতর সত্য নয় যে স্কুলের ছেলেদের কি শেখা উচিত এবং কি রকম নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করা দরকার—এ সম্বন্ধে কোন রকম বিশ্বাস অবিশ্বাসের বালাই নেই। যদি তার অভিরুচি বলে কিছু থেকেও থাকে, তবে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় এর নিয়মকানুন মেনে চলা। সে অবশ্য ইচ্ছা করলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে; কিন্তু কিভাবে কি শিখবে এ সম্বন্ধে তার কোন ইচ্ছা থাকতে পারে না।

আপাতদৃষ্টিতে ছাত্রদের যে বিষয় নীরস মনে হয় ও যার প্রতি তারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে তাকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তোলা।

"ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই"—একথা বলা খুব সহজ। কারণ তিনি বিন্দুমাত্র আক্রোশ পোষণ না করে তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু বলতে দেন। তিনি আমাদের কার্যকলাপের প্রতি চেয়ে থাকেন এবং তাঁর বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হলে সাজা পেতে হয়। তবে এ শাস্তি প্রতিশোধমূলক নয়। আমাদের সংশোধনের জন্যই এ আঘাত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না এবং এ বিষয় প্রমাণ সাপেক্ষ নয়ও। তাঁকে যদি না অনুভব করতে পারি তবে আমাদের পক্ষে তা দুঃখের কথা। অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকা একটা রোগ এবং কোন না কোনদিন আমরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ ব্যাধিমুক্ত হব।

কিন্তু ছাত্রের পক্ষে তর্ক নিষ্প্রোয়জন। যে প্রতিষ্ঠানের সে ছাত্র, সেখানে

যদি প্রার্থনা সভায় উপস্থিতি কাম্য হয়, তাহলে নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে তাকে এটা করতে হবে। তবে নম্রভাবে সে তার সন্দেহের কথা শিক্ষক মহাশয়ের কর্ণগোচর করতে পারে। যে বিষয় তার মনে ধরেনি তা সে বিশ্বাস না করতে পারে। তবে শিক্ষকদের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকলে তাকে যা বলা হবে, বিশ্বাস না থাকলেও তা সে করবে। তবে ভয়ে বা অসন্তুষ্ট অন্তরে সে এমন করবে না। একাজ তার করা উচিত এবং আজ যা তার কাছে অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, কোন না কোনদিন তা পরিষ্কার হয়ে যাবে—এই মনোভাব নিয়ে সে সেই কাজ করবে।

কিছু চাওয়াকে প্রার্থনা বলে না। এ হচ্ছে অন্তরের কামনা। মানুষের প্রাত্যহিক দুর্বলতা স্বীকার করাই প্রার্থনা। আমাদের মধ্যে মহাপরাক্রমশালীরও প্রতিনিয়ত একথা স্মরণ রাখা উচিত যে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও দুর্ঘটনা আদির কাছে সে কিছু নয়। আমরা মরণের মাঝে রয়েছি। চক্ষের নিমিষে সব কিছু যখন শূন্যে বিলীন হতে পারে বা এইভাবে আমাদের বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে তড়িৎবেগে যখন কর্মক্ষেত্র থেকে আমরা অপসারিত হতে পারি, তখন 'নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার' আর কি অর্থ আছে? কিন্তু হৃদয় দিয়ে যদি আমরা অনুভব করি যে আমরা 'ঈশ্বরের জন্য তাঁর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছি' তবে নিজেদের পাথরের মত শক্ত মনে হবে। তাহলে সবই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে। সে অবস্থায় কোন কিছুরই বিনাশ নেই। যা কিছু লয় পেতে দেখি, তখন সবই মায়া মনে হবে। অনুভূতির সেই অবস্থাতেই শুধু মৃত্যু ও ধ্বংসের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। কারণ সে অবস্থায় মরণ বা বিনাশ রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। আরও ভাল ছবি আঁকবে বলে শিল্পী তার ছবি নষ্ট করে। ঘড়ি-নির্মাতা খারাপ স্প্রিংটি ফেলে দিয়ে নূতন ও কার্যসাধনক্ষম স্প্রিং লাগায়।

সমবেত প্রার্থনা মহান ব্যাপার। অনেক সময় একা আমরা যে কাজ করি না, দলে পড়ে তা করে থাকি। ছেলেদের বিশ্বাসের দরকার নেই। অন্তরের বাধা মুক্ত অবস্থায় তারা শুধু নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে যদি প্রার্থনার ঘন্টি অনুযায়ী কাজ করে, তাহলেই তাদের মধ্যে উচ্চভাবের অনুভূতি আসবে। কিন্তু অনেকে এরকম করে না। তারা এমন কি খুনসুড়ি জুড়ে দেয়। তবে এর প্রচ্ছন্ন প্রভাব প্রতিরোধ করা যায় না। এমন অনেক ছেলে কি দেখা যায় না যে প্রথমাবস্থায় যারা সমবেত প্রার্থনার প্রতি বিদ্রূপ বাণী উচ্চারণ করত; কিন্তু পরে তারা এর উপকারিতার প্রচণ্ড সমর্থকে পরিণত হয়েছে? যেসব ব্যক্তির বিশ্বাসের জোর

অতীব তীব্র নয়, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সাময়িক প্রার্থনায় তারা শান্তি পেয়েছে। মন্দির, মসজিদ আর গীর্জায় যারা আসে, তাদের ভিতর সবাই বিদ্রূপকারী বা ভণ্ড নয়। এরা সৎ নরনারী। তাদের কাছে সাময়িক প্রার্থনা নিত্য-স্নানের মত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এইসব প্রার্থনা-স্থল দর্শনমাত্র অভিভূত হবার মত অন্ধ কুসংস্কারের কেন্দ্র নয়। এযাবৎ তারা প্রতিটি আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং মনে হয় অনন্তকাল ধরে তাই থাকবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৩—৯—১৯২৬

১৯। শব্দের জুলুম

ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ২৩শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত আমার "প্রার্থনায় বিশ্বাস নেই" নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে জনৈক পত্রলেখক লিখছেন :—

"আপনার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সেই ছেলেটির উপর বা একজন চিন্তানায়ক হিসাবে নিজের উপরও আপনি ন্যায়বিচার করেছেন বলে মনে হয় না। একথা সত্য যে সেই পত্রলেখক নিজ পত্রে যেসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, তার সবগুলি মধুর নয় ; কিন্তু সে যে নিজের মনোভাব স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছেলে বলতে যা বোঝায় পত্রলেখক যে তা নয়, একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার বয়স কুড়ির নীচে শুনলে আমি বিস্মিত হব। অল্পবয়স্ক হলেও ছেলেটি যথেষ্ট মানসিক অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে এবং এই কারণে তার প্রতি 'ছেলেদের তর্ক করা অনুচিত' এই রকম মন্তব্য করা উচিত হয়নি। পত্রলেখক হচ্ছে যুক্তিবাদী অথচ আপনি ভক্তিমার্গের লোক। বহুদিন ধরে এই দুটি ধারা চলে আসছে এবং এদের সংঘর্ষের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। এর একটি বলছে, 'আমাকে বোঝাও তাহলে আমি বিশ্বাস করব' এবং অন্যটি বলছে যে 'বিশ্বাস কর তারপর বোধোদয় হবে।' এর প্রথমটি যুক্তির উপর জোর দেয় এবং দ্বিতীয়টি কর্তৃত্ব নির্ভরিত। আপনি মনে করেন যে যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ, ক্ষণস্থায়ী বিচারধারা এবং শীঘ্র বা বিলম্বে তাদের মনে বিশ্বাসের উদ্রেক হবে। আপনার অভিমতের সমর্থনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বহুখ্যাত উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং 'ছেলেটির' মঙ্গলের জন্য আপনি তাকে বাধ্যতামূলক প্রার্থনার ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন। দু'রকম যুক্তি আপনি পেশ করেছেন। প্রথমতঃ নিজ ক্ষুদ্রতা ও কল্পিত উচ্চমার্গচারীর বিশালতা ও তার মহত্ব উবলব্ধি করে প্রার্থনার খাতিরেই প্রার্থনা করা এবং দ্বিতীয়ত এর প্রয়োজনীয়তার জন্য যারা সান্ত্বনা পেতে চায়, তাদের

সান্ত্বনা দেওয়া। প্রথমে দ্বিতীয় যুক্তিটি বিশ্লেষণ করব। এক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাপত্র কতকটা যেন দুর্বলদের জন্যই দেওয়া হয়েছে। মানুষের চলার পথে এসব পরীক্ষা আসে। এসব মানুষের যুক্তিবাদের দুর্গ এর দাপটে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ লোকেরই প্রার্থনা ও বিশ্বাসের শরণ নিতে হয়। এতে তাদের অধিকার আছে এবং এর জন্য তারা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এই দুনিয়ায় বরাবরই এমন কিছু খাঁটি যুক্তিবাদী আছে এবং চিরকালই এমন কিছু যুক্তিবাদী থেকে যাবে, যারা সংখ্যায় অত্যল্প হলেও প্রার্থনা বা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এছাড়া এমন একশ্রেণীর লোক থাকে যারা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তীব্র সন্দেহ পোষণ না করলেও কেমন যেন উদাসীন থাকে।

শেষ পর্যন্ত সবার পক্ষে যখন প্রার্থনার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন নয় এবং যারা এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তাদের যখন এর শরণাপন্ন হবার স্বাধীনতা আছে এবং প্রয়োজনবিধায়ে তারা যখন এর শরণ নিয়েও থাকে, তখন প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থনাকে বাধ্যতামূলক করার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য হয়তো বাধ্যতামূলক দেহচর্চা ও শিক্ষার প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিক উন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক প্রার্থনা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা নেই। এমন বহু নাস্তিক দেখা গেছে যাঁরা নীতি-বাগীশ হিসাবে উচ্চ মর্যাদা লাভ যোগ্য। আমার মনে হয় এইসব লোককে আপনার প্রথম যুক্তি অনুসারে আপনি প্রার্থনাকে শুধু প্রার্থনার খাতিরে নিজের দীনতা প্রকাশের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে বলবেন। এই দীনতা নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। জ্ঞান রাজ্যের বিশালতা এত অধিক যে ক্ষেত্র বিশেষে শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকও নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করেন, কিন্তু তাঁদের ভিতর প্রচলিত ধারা হচ্ছে প্রভুত্বব্যঞ্জক অনুসন্ধিৎসা। নিজ শক্তিতে তাঁদের আস্থা তাঁদের প্রকৃতি বিজয়ের মতই শক্তিশালী। এ না হলে আজও আমরা কন্দ বা মূলের জন্য আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তাম। তাই বা কেন, এতদিনে আমরা এই ধরাবক্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

"হিমযুগে মানুষ যখন শীতে মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল এবং যখন প্রথম আগুনের আবিষ্কার হয়, সেযুগে আপনার মত লোকেরা বোধহয় আবিষ্কারকদের বিদ্রূপ করে বলত, 'ঈশ্বরের শক্তি ও রোষের বিরুদ্ধে তোমাদের এসব তোড়-জোড়ের কি মূল্য আছে?' দীন ব্যক্তিদের জন্য তো পরকালে ঈশ্বরের রাজত্বের ব্যবস্থা রয়েছে। বলতে পারি না তারা সত্য সত্যই তা পাবে কিনা, তবে এদিকে এই পৃথিবীতে তাদের ভাগে তো দাসত্ব পড়েছে দেখা যাচ্ছে। আসল কথায়

এবার ফিরে যাওয়া যাক। 'বিশ্বাসের শরণ নাও, ভক্তি আপনি আসবে' বলে আপনি যা বলেছেন তা অতীব সত্য, মারাত্মক ভাবে সত্য। এই জাতীয় শিক্ষার মধ্যেই জগতের যাবতীয় ধর্মান্ধতার সূচনা খুঁজে পাওয়া যাবে। ছেলেবেলাতেই যদি ধরা যায় এবং বহুদিন ধরে তাদের কানের কাছে বারবার যদি জপা যায়, তবে মনুষ্য সমাজের অধিকাংশকে যা ইচ্ছা তাই বিশ্বাস করানো যায়। এইভাবে গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া মুসলমানের সৃষ্টি হয়। তবে অবশ্য উভয় সম্প্রদায়েই অল্পসংখ্যক এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁরা এসব উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠতে পারেন। আপনি কি জানেন যে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যদি হিন্দু বা মুসলমানদের নিজ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের কুসংস্কার সমূহের এরকম অন্ধ ভক্ত হবে না এবং এইসব গোঁড়ামি নিয়ে ঝগড়া করা ছেড়ে দেবে? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ওষুধ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা; কিন্তু আপনি ওভাবে গড়ে ওঠেননি বলে একথা সমর্থন করতে পারেন না।

"যে দেশের লোকেরা সদা সর্বদা অতিমাত্রায় ভয়ভীত থাকত, সে দেশে সাহস, কর্মশক্তি ও আত্মত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় আপনার কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম হলেও আপনার অবদান সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত জ্ঞাপনকালে একথা বলতেই হবে যে আপনার প্রভাব এদেশের বৌদ্ধিক প্রগতির পক্ষে প্রচণ্ডভাবে বাধক হয়েছিল।"

কুড়ি বছরের একটি বালক যদি ছেলে না হয়, তবে ছেলে বলতে 'সাধারণ অর্থে' কি বুঝায় তা আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, বয়সের খেয়াল না করে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে আমি ছেলে বা মেয়ে বলব। তবে উল্লিখিত ছাত্রটিকে ছেলে বা ব্যক্তি যাই বলা যাক না কেন, আমার যুক্তি এই ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য। কোন প্রতিষ্ঠানে নাম দাখিল করে সে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেবার পর প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাদি বিষয়ে ছাত্রের আর তর্ক-বিতর্ক করার অবকাশ থাকে না। কারণ ছাত্ররা হচ্ছে সৈনিকের মত এবং সৈনিকের বয়স চল্লিশ বছরও হতে পারে। নিজ বাহিনী হতে পৃথক হয়ে কোন সৈনিকের ইচ্ছামত কোন কিছু করা বা না করার অধিকার যেমন থাকে না, তেমনি কোন ছাত্র স্কুল বা কলেজে যোগদান করা মাত্র (তা সে যতই প্রবীণ বা জ্ঞানী হোক না কেন), সে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা অগ্রাহ্য করার অধিকারচ্যুত হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রটির বুদ্ধি কম ভাবা বা তার প্রতি হতশ্রদ্ধার কোন কথা উঠতে পারে না। বুদ্ধিমান হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পত্রলেখক স্বেচ্ছায় শব্দের জুলুমের ভারী জোয়াল কাঁধে নিয়েছেন। যেসব

কার্যসম্পাদনে আদেশপালনকারীর আগ্রহ নেই তার প্রত্যেকটিতে তিনি 'বাধ্যতা-মূলক নির্দেশের' গন্ধ পেয়েছেন। তবে বাধ্যতামূলক ক্রিয়ার প্রকার ভেদ আছে। স্বয়ং আরোপিত বাধ্যতামূলক নির্দেশকে আমরা আত্মসংযম বলি। একে জড়িয়ে ধরে এর ছত্রছায়ায় আমরা বড় হয়ে উঠি। কিন্তু জীবন দিয়ে যে বাধ্যতামূলক নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করতে হয়, তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযম বলতে হবে এবং আমাদের অপমান করা ও মানুষ হিসাবে (বা ইচ্ছা করলে ছেলে হিসাবেও বলতে পারেন) আমাদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করাই হয় তার লক্ষ্য। সামাজিক বিধিনিষেধসমূহ সাধারণতঃ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে ও নিজ দুর্বলতার জন্য আমরা তার বিরুদ্ধাচারণ করে থাকি। অবমাননাকর নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ করা ভীরুতা ও মনুষ্যত্ব বিরোধী। কিন্তু এর চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের চতুর্দিকে সঞ্চরণশীল রিপুর করায়ত্ত হয়ে তার ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া।

কিন্তু পত্রলেখক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এ হচ্ছে 'যুক্তিবাদ' নামক মহান শব্দ। আমি এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তবে অভিজ্ঞতা আমাকে এতটুকু বিনয়ী করেছে যে ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তির সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কোন জিনিস এলোমেলো থাকলে যেমন তা নোংরার সামিল হয়, তেমনি যুক্তির অপপ্রয়োগ বাতুলতা হয়ে দাঁড়ায়। যার যা পাওনা তাকে তা দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুক্তিবাদীরা প্রশংসার্হ ; কিন্তু নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে দাবী করলে যুক্তিবাদ বিকটদর্শন দৈত্য হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তিকে সর্বশক্তিমান মনে করা, গাছপালা, নুড়ি, পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করার মতই পৌত্তলিকতার প্রতীক।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করতে পেরেছে ? প্রার্থনা করতে করতে এর উপকারিতা বোঝা যায়। এই হচ্ছে বিশ্বের চির প্রচলিত রীতি। কার্ডিনাল নিউম্যান তাঁর যুক্তি বিসর্জন দেননি, কিন্তু 'পরবর্তী পদক্ষেপেই আমার কাছে যথেষ্ট' গাইবার সময় তিনি শুধু প্রার্থনাকে এর চেয়ে উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। শঙ্কর যুক্তিবাদীদের শিরোমনি ছিলেন। বিশ্ব সাহিত্যে বোধহয় এমন কিছু নেই যা শঙ্করের যুক্তিবাদের উপরে যেতে পারে। কিন্তু তিনিও প্রার্থনা ও বিশ্বাসকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন।

পত্রলেখক শিথিলভাবে আমাদের সমক্ষে সংঘটিত দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অস্বস্তিকর ঘটনাবলীর সমীকরণ করেছেন। কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের ব্যতিক্রম আছে। মনে হয় মানব সম্পর্কিত সকল বিষয়ের নিয়ামক এই নীতি। এ বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই যে এযাবৎ কাল ইতিহাসে যেসব বীভৎস অপরাধের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার অনেকগুলির জন্য ধর্মকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু তার জন্য দায়ী নরদেহস্থিত শাসনবিহীন পাশববৃত্তি ধর্ম নয়। মানুষ এখনও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পশুপ্রবৃত্তি বর্জন করেনি।

এমন কোন যুক্তিবাদীর খোঁজ আমি পাইনি, যাঁর প্রত্যেকটি কার্যের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি এবং সহজ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি কদাচ কিছু করেন নি। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এমন সব লক্ষ লক্ষ মনুর সন্তান বিদ্যমান, যারা আমাদের সকলের জনকের প্রতি শিশুর মত সরল বিশ্বাস পোষণ করে একরকম সুষ্ঠু ও সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করছে। এই বিশ্বাসের নামই প্রার্থনা। যে "বালকটির" চিঠির উপর ভিত্তি করে আমি প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, সে ঐ জাতীয় বিশাল মানব সাগরেরই অংশ এবং আমার প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল তাকে এবং তার সহযাত্রীদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করা। পত্রলেখকের মত যুক্তিবাদীদের আনন্দে বাধা সৃষ্টি করার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

তাবৎ যুবকের মনে তাদের গুরুজন ও শিক্ষকবৃন্দ যে ছাপ সৃষ্টি করতে চান, পত্রলেখক কিন্তু তাতেও আপত্তি করেছেন। এটা কিন্তু মনে হয় কচি বয়সের দরুণ অনতিক্রমনীয় বাধা (?)। একেবারে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ও শিশুমনকে বিশেষ একটি ধাঁচে গড়ার চেষ্টা। পত্রলেখক একথা মেনে নিয়ে ভালই করেছেন যে দেহ ও মনকে শিক্ষা ও নির্দেশ দেওয়া চলবে। যে আত্মা থেকে দেহ ও মনের সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে তিনি চিন্তিত নন বা হয়তো এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। কিন্তু তাঁর অবিশ্বাসে কাজ হবে না। তাঁর যুক্তির পরিণামের হাত তিনি এড়াতে পারেন না। কারণ একজন আস্তিক কেন এই যুক্তি পেশ করতে পারবে না যে, অন্য সকলে যেমন বালক-বালিকাদের দেহ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রভাবান্বিত করে, তখন সেই বা কেন তাদের আত্মাকে প্রভাবান্বিত করবে না? সত্যকার ধর্মীয়-বোধ জাগ্রত হলে ধর্ম শিক্ষার কুফল দূরীভূত হবে। ধর্ম শিক্ষা বর্জন করার অর্থ হচ্ছে জমির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য কৃষিক্ষেত্রকে অনাবাদী রেখে তাতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া।

পত্রলেখক পুরাকালের যে সকল মহান আবিষ্কারের পুনরুল্লেখ করেছেন, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। এসব আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা বা চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে কেউ কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং আমি তো করিই না। বিশ্বাসের প্রয়োগ ও অনুশীলনের জন্য ওগুলি ছিল উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু আমাদের পূর্বাচার্যেরা স্বীয় জীবন হতে বিশ্বাস ও প্রার্থনার গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার বিলোপ সাধন

করেন নি। বিশ্বাস ও প্রার্থনার সম্পর্কবিহীন কর্ম হচ্ছে সৌরভবিহীন কৃত্রিম পুষ্পের মত। যুক্তির অবদমন আমি চাই না। আমাদের অন্তঃস্থিত যে শক্তি স্বয়ং যুক্তিকে পরিশুদ্ধ করে, আমি তার যথোচিত স্বীকৃতিকামী।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৪-১০-১৯২৬

২০। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা

অনেকে গান্ধীজীকে বলেছেন, "ঢের হয়েছে এবার। এখন তো কেউ আর আপনার কথায় কান দিচ্ছে না। তাহলে খদ্দরের কথা আর কেন?" কিন্তু গান্ধীজী বললেন, "আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুর অধিক অত্যাচারের সম্মুখীন প্রহ্লাদের রাম নাম না ছাড়ার উদাহরণ থাকতে আমি আমার প্রিয় মন্ত্র জপ করা ত্যাগ করব কেন? আর আমাকে তো এখনও কোন অত্যাচার সইতে হয়নি। দেশের বর্তমান অবস্থা আমাকে আভাসে যে বাণী শুনিয়ে যায়, তা আমি ছাড়ি কেমন করে? পণ্ডিতজী রাজা মহারাজদের কাছ থেকে তোমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন ও এখনও তা করে যাচ্ছেন। দৃশ্যতঃ মনে হয় ও অর্থ আসছে ঐসব ধণাঢ্য রাজন্য-বর্গের কাছ থেকে; কিন্তু বস্তুতঃ দেশের কোটী কোটী দরিদ্র ব্যক্তি ঐ অর্থ জোগাচ্ছে। কারণ ইউরোপের অবস্থা থেকে আমাদের অবস্থা পৃথক। আমাদের দেশের ধনীক সম্প্রদায় গ্রামবাসীদের মেরে বড়লোক হয় এবং এই গ্রামবাসীদের অধিকাংশ দৈনিক একবেলাও পেট ভরে খেতে পায় না। এইভাবে বুভুক্ষু জনগণ আজ তোমাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করছে এবং এরা কোন দিনই এ শিক্ষার স্বাদ-গ্রহণ করার সুযোগ পাবে না। দরিদ্ররা যে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে পায় না তা প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের কর্তব্য হলেও আজ আমি তোমাদের কাছ থেকে অতটা দাবী করব না। তাদের জন্য একটুখানি যাজন করে আমি তোমাদের দরিদ্রদের এই আত্মত্যাগের কথঞ্চিৎ প্রতিদান দিতে বলছি। কারণ গীতায় বলছে যে যাজন না করে যে খাদ্য গ্রহণ করে, সে চুরি করছে। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নাগরিকদের যাজন ছিল প্রত্যেকের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে কিছু আলু উৎপন্ন করা ও কিছু সেলাইএর কাজ করা। আমাদের কাছে ও আমাদের কালে এখন যাজন অর্থে সুতা কাটা। দিনরাত আমি একথা বলছি ও এ সম্বন্ধে লিখছি। আজ আর নতুন কিছু বলব না। ভারতের দরিদ্রদের কথা যদি তোমাদের অন্তর স্পর্শ করে থাকে, তাহলে আমি চাই যে কাল তোমরা কৃপালিনীর খদ্দরের কাহিনী পড়বে ও ঐ বইটির মজুদ ভাণ্ডার নিঃশেষ করবে এবং আজ তোমরা খদ্দর কিনে

তোমাদের সঞ্চয় নিঃশেষ করবে। পণ্ডিতজী ভিক্ষাকে কলারূপে চর্চা করেছেন। এ বিদ্যা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি এবং তিনি যদি রাজন্যবর্গের ভার লাঘব করার বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন, তবে অধিকতর দরিদ্রদের জন্য দরিদ্রদের পকেট খালি করার ব্যাপারেও আমি নির্লজ্জ রকমের ওস্তাদ।

তোমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা করা ও এইসব রাজোচিত অট্টালিকা নির্মাণের পিছনে মালব্যজীর একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে এবং তা হচ্ছে দেশে নির্মল জ্যোতি বিকীর্ণকারী রত্ন সৃষ্টি করা। এরা সুস্থ ও সবল নাগরিক হয়ে দেশমাতৃকার সেবা করবে। পশ্চিম থেকে আজ যে অপবিত্রতার বায়ু আসছে তাতে যদি তোমরা বয়ে যাও, তবে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আর এ পদ্ধতির প্রতি ইউরোপের সর্বসাধারণের সমর্থন নেই। ইউরোপে আমাদের এমন সব সাথী আছেন, অবশ্য সংখ্যায় তাঁরা অতি অল্পই, যাঁরা এই বিষাক্ত ধরণধারণের প্রতিরোধ করার জন্য কঠিন সংগ্রাম করছেন। কিন্তু তোমরা যদি সময়মত না জাগো তাহলে দুর্নীতির যে লহরী দ্রুত শক্তি সঞ্চার করছে, তা হয়তো শীঘ্রই তোমাদের পরিবেষ্টন করে পরাভূত করবে। তাই কণ্ঠে শেষ বিন্দু শক্তি প্রয়োগ করে আমি চীৎকার করে বলছি, "অগ্নিশিখায় ভস্মসাৎ হবার পূর্বে সতর্ক হয়ে দূরে পালাও।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২০-১-১৯২৭

২১। বিহার বিদ্যাপীঠে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণ

শুধু ছাত্রদেরই নয়, উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেও সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে গান্ধীজী যে অভিভাষণ দেন, তাকে বক্তৃতা আখ্যা দেবার পরিবর্তে বরং প্রাণখোলা আলাপ বলাই অধিকতর সঙ্গত। অবশ্য তাঁর পক্ষে জনসাধারণের মনে প্রতীতি জন্মানো অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তারা শুধু কণ্ঠনিসৃত বাণী শোনে না, হৃদয়ের না বলা ভাষাও তারা বোঝে। সেখানকার সেই আলোচনা ছিল রসঘন ব্যঞ্জনায় সমুজ্জ্বল ও নিজ স্মৃতিকথার উক্তিতে পরিপূর্ণ।

প্রথমেই তিনি এই আশা প্রকাশ করলেন যে, সেদিন স্নাতকরা যে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছে তদনুযায়ী তারা জীবন যাপন করবে। গুজরাট বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উপলক্ষে তিনি যা বলেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন যে, যদি একজন মাত্র আদর্শ শিক্ষক ও একজনও আদর্শ ছাত্র তৈরী হয়, তাহলে এই

বিদ্যাপীঠ প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ করেছে বলে মানতে হবে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ কি ? এদের কাজ হচ্ছে সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন, সাঁচ্চা রত্ন খুঁজে বার করা।

এরপর তিনি অসহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াত্মক এবং নেতিবাচক দিকের উল্লেখ করেন। প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি এর নেতিবাচক দিক অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কাজে সফল হয়েছে। যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকদের তিনি সরকারী বিদ্যালয় ছাড়িয়েছেন, তার কথা মনে পড়লে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। এদের মধ্যে অনেকেই আবার পুরাতন জায়গায় ফিরে গেছে এবং আরও অনেকে বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট জেনেও তাঁর মনে তিলমাত্র অনুতাপ জন্মায়নি। এদের জন্য তাঁর দুঃখ হয়, এদের প্রতি তিনি সহানুভূতি বোধ করেন ; কিন্তু মনে কখনও অনুতাপ বা অনুশোচনা হয়নি। "এই সব দুঃখ কষ্ট আমাদের দৈনন্দিন ললাট লিখন এবং এ আমাদের নিত্যসাথী। সত্যপালন যদি কুসুমাকীর্ণ শয্যায় শয়নতুল্য হয়, সত্যের জন্য যদি ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন নিষ্প্রোয়জন হয় ও এ পথে সবাই যদি সুখ ও আরাম পায়, তাহলে সত্যের কোন সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকবে না। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও আমাদের সত্য আঁকড়ে থাকতে হবে। সত্যপথাশ্রয়ী হবার জন্য আমাদের যদি ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্ব হারাতে হয়, তবে তাতে ক্ষতি কি ? ঈশ্বরকৃপা লাভে সমর্থ হলে ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্ব আমাদের হবে এই বিশ্বাস হৃদয়ে নিয়ে জীবনে মরণে সত্যকে অনুসরণ করলে আমরা খাঁটি সত্যাশ্রয়ী বলে পরিগণিত হব। আমি জানি যে আমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। দেশের আবহাওয়ায় পবিত্রতার পরশ দিতে হলে এই হচ্ছে খাঁটি প্রায়শ্চিত্ত।"

এ হচ্ছে নেতিবাচক কার্যক্রম এবং এ কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যথোচিত পরিমাণ প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে জেনে তিনি সুখী। কিন্তু এই দ্বৈত বিশ্বের একটি ক্রিয়াত্মক দিকও আছে। এই দিকটিকে অধিকতর কঠিন আবার স্থায়ী ফলপ্রদ দুই বলা চলে। এই জাতীয় বিদ্যাপীঠ ছাড়া আর কোথায় সে আদর্শ মূর্ত হতে পারে ? এরপর তিনি ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক সমালোচনা করেন। "ইউরোপে ছাত্রের যেদিকে প্রতিভা আছে তার কথা খেয়াল করে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের সংস্কৃতি ও প্রতিভার কথা স্মরণে রেখে একই বিষয় তিনটি দেশে হয়ত ত্রিবিধ উপায়ে শেখানো হয়ে থাকে। আমরা শুধু ইংরাজী পদ্ধতির দাসোচিত অনুকরণে আনন্দ পেয়ে থাকি। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের পাশ্চাত্য পদ্ধতির একান্ত বশম্বদ অনুকরণ-

কারীতে পরিণত করা। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কারণ নেই। কারণ আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছুক একদল ব্যক্তিকে দেশের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের অধিনায়কপদে বরণ করার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এই। মেকলে বেচারী আর কি করতে পারেন? তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃত সাহিত্যই আমাদের যাবতীয় কুসংস্কারের মূল এবং তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরূপী জীবন রসায়ন দিয়ে তিনি আমাদের পুষ্ট করতে মনস্থ করেছিলেন। অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়েছিলেন বলে মেকলেকে তাই নিন্দা করার প্রয়োজন নেই। ইংরাজী ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় আমরা সবটুকু স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের অবস্থা পক্ষবিহীন পক্ষীর ন্যায়। আমাদের জীবনের চরমকাম্য হচ্ছে কেরানীগিরি বা সম্পাদকত্ব। এই পদ্ধতিতে আমাদের ভিতর একজন হয়ত লর্ড সিনহা হয়েছেন; কিন্তু বাদবাকি সকলেই খুব বেশী হলে এই বিরাট বিদেশী যন্ত্রের অংশমাত্র। মজঃফরপুরে একটি ছেলে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে জাতীয় বিদ্যালয়ে গিয়ে সে লাটসাহেব হতে পারবে কিনা? আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম, "না, তুমি গ্রাম্য লাট হতে পার; কিন্তু লর্ড সিনহা হতে পারবে না। সে ক্ষমতা আছে শুধু লর্ড বার্কনহেডের।"

দরিদ্রের পক্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাদগ্রহণ করা অসম্ভব, তার পীঠস্থান রচনার জন্য দরিদ্রেরই অর্থে নিত্য নূতন প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজি নির্মাণ করার যে উন্মত্ততা দেশে প্রকট হচ্ছে, এরপর তিনি তার উল্লেখ করলেন: "একবার এলাহাবাদের ইকনমিক ইনস্টিটিউটে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রফেসর জীভনস্ আমাকে প্রতিষ্ঠানটি দেখাতে দেখাতে যখন বললেন যে এর ঘরবাড়ী তৈরী করতে ৩০ লক্ষ টাকার মত লেগেছে, তখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে অনশনে না রেখে এসব প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। নূতন দিল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখ, ঐ একই কাহিনী শুনতে পাবে। রেলগাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে চমকপ্রদ উন্নতি সাধন করা হয়েছে তার দিকে তাকাও। এর মধ্যে সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কথা খেয়াল করে দরিদ্রদের অবহেলা করার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। শয়তানী না বলে একে আর কি আখ্যা দেওয়া যায়? সত্যি কথা বলতে গেলে এর চেয়ে আর কতটুকু কম বলা যায়? এ পদ্ধতির জনকদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। তাদের অন্য উপায় ছিল না। হাতী কি কখনও পিঁপড়ের কথা মনে রাখে? আমাদের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাঁদের হাতে এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও যদি বিশ্বের যাবতীয় সদিচ্ছা নিয়ে একাজে নামেন, তবু আমাদের মত সুষ্ঠুভাবে একাজ নিষ্পন্ন করতে পারবেন না। কারণ তাঁদের

দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেন। আমাদের চিন্তা করতে হবে বুভুক্ষু জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে।"

এর থেকে স্বভাবতই চরকার কথা উঠল এবং তিনি মন্তব্য করলেন যে চরকাই হবে আমাদের জাতীয় কার্যকলাপের অক্ষদণ্ড বা কেন্দ্রবিন্দু।

"স্নাতকরা ডিগ্রী নিক এবং যা ইচ্ছা শিখুক। কিন্তু এ শিক্ষা যেন চরকা-কেন্দ্রিক হয়। তারা যে অর্থশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিখবে তা যেন চরকার সহায়তার্থ প্রযুক্ত হয়। চরকাকে যেন এক কোণে নির্বাসন না দেওয়া হয়। আমাদের যাবতীয় কর্মের সৌরজগতে চরকার স্থান সূর্যের মত। চরকা বিনা বিদ্যাপীঠ শুধু নামেই। লর্ড আরউইন একটি অতি সত্য কথা বলেছেন যে আইন পরিষদ আদির ভিতর দিয়ে যে কোন উন্নতির কথা চিন্তা করতে হলে, আমাদের ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে চোখের সামনে রাখতে হবে। তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। এ পদ্ধতির সূর্য লণ্ডন এবং আমাদের পদ্ধতির সূর্য চরকা। আমি হয়ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছি ; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমার মত পরিবর্তন হবে না। চরকা আর যাই করুক, কারও ক্ষতি করে না এবং চরকাকে বাদ দিলে আমরা (এবং আমি বলব যে সমগ্র বিশ্ব) উৎসন্নে যাবে। যে যুদ্ধের সময় অসত্য ভাষণকে উচ্চ কোটির ধর্ম আখ্যা দেওয়া হত, তার অবসানের পর ইউরোপের কি মনে হচ্ছে তা আমরা জানি। যুদ্ধোত্তর প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব আজ ক্লান্ত এবং ভারতের আজকের অভয়দাতা চরকা কাল বিশ্বত্রাতার রূপ নিতে পারে। কারণ চরকার বনিয়াদ 'অধিক সংখ্যকের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থার' উপর নয়, এর লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা। কোন মানুষকে যখন আমি ভুল করতে দেখি, তখন মনে হয় ও ভুল আমারও। ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ দেখলে আমার মনে পড়ে যে আমারও একদিন অমন গেছে। এইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি ও মনে হয় আমাদের মধ্যে দীনতম ব্যক্তিটি সুখী না হওয়া পর্যন্ত আমার সুখ নেই। এইজন্য আমি চরকাকে তোমাদের অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু করতে চাই। প্রহ্লাদ যেমন সর্বত্র রামকে দেখত এবং তুলসীদাস যেমন কৃষ্ণের বিগ্রহতেও রামের মূর্তি দেখতেন, তেমনি তোমাদের সকল জ্ঞান যেন চরকার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিয়োজিত হয়। আমাদের বিজ্ঞান, সূত্রধরবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্রআদি সকল বিষয়ই যেন চরকাকে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিটির মুখ্য অবলম্বনে রূপায়িত করার কার্যে প্রযুক্ত হয়।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১০-২-১৯২৭।

২২। সম্মেলনে ছাত্রদল

সিন্ধুর ষষ্ঠ ছাত্র সম্মেলনের সম্পাদক আমার কাছে বাণী চেয়ে একটি ছাপানো চিঠি পাঠান। ঐ একই অনুরোধ জানিয়ে আমার কাছে একটি তারও পাঠানো হয়। কিন্তু সে সময় আমি প্রায় এক দুর্গম এলাকায় ছিলাম বলে ঐ চিঠি ও তার এমন সময় হাতে এলো যখন আর বাণী পাঠাবার সময় নেই বললেই চলে। এছাড়া বাণী, রচনা এবং ঐ জাতীয় যত কিছু পাঠানোর জন্য আমার কাছে এত অনুরোধ আসে যে তার প্রত্যেকটি রক্ষা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে নিজেকে আমি ছাত্রদল সংশ্লিষ্ট সব কিছু সম্বন্ধে কৌতূহলী বলে প্রচার করি এবং তাছাড়া সমগ্র ভারতের ছাত্র সমাজের সঙ্গে আমি কথঞ্চিৎ সম্পর্কিত বলে সেই ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্রে যে কার্যসূচীর খসড়া দেখেছিলাম, মনে মনে তার সমালোচনা না করে থাকতে পারলাম না। হয়ত কারও কোন উপকারে লাগবে এই ভেবে আমি আমার মনের কথার কতকাংশ কাগজে লিপিবদ্ধ করছি এবং ছাত্র সমাজের কাছে তা পেশ করছি। নিমন্ত্রণ পত্রটি ভালভাবে ছাপা নয় এবং তাতে এমন সব ভুল ছিল যা ছাত্র সমাজের পক্ষে শ্লাঘনীয় নয়। যাই হোক, নিমন্ত্রণ পত্রটির নিম্নলিখিত অংশসমূহ প্রথমে উদ্ধৃত করছি।

"সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সম্মেলনকে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।…আমরা ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষামূলক আলোচনার অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক এবং আপনার কাছে এজন্য সহযোগিতাকামী।…সিন্ধুর নারী শিক্ষার বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।…ছাত্রদের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা চোখ বুঁজে নেই। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আশা করা যায় যে বিতর্ক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে এই কর্মসূচী সম্মেলনকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করবে। আমাদের কার্যসূচী থেকে নাটকাভিনয় ও সঙ্গীত বাদ পড়েনি।…উর্দু এবং ইংরাজী নাটকের অংশ বিশেষ অভিনীত হবে।"

সম্মেলনের নির্ধারিত কর্মসূচী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা উদ্রেক সক্ষম কোন বাক্য আমি নিমন্ত্রণপত্র থেকে বর্জন করে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি রচনা করিনি। তবু ওর মধ্যে কেউ এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ পাবেন না যার স্থায়ী মর্যাদা আছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে নাটক, সঙ্গীত এবং দৈহিক কসরতের অনুষ্ঠানগুলি "অতীব সুন্দর ভাবে" অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধনীর ভিতরে লিখিত কথাটি আমি নিমন্ত্রণ পত্র

থেকে উদ্ধৃত করেছি। সম্মেলনে নারী শিক্ষা সম্বন্ধে যে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল, এবিষয়ে আমার মনে সংশয় নেই। কিন্তু যে "দেতি লেতি" (পণ) প্রথার প্রভাব ছাত্ররাও কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং যার জন্য সিন্ধী মেয়েদের জীবন অনেকক্ষেত্রে নরকসদৃশ এবং মেয়েদের অভিভাবকদের কাছে যা জুলুমতুল্য, সেই প্রথা সম্বন্ধে সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পত্রে কোনরূপ উল্লেখ নেই। নিমন্ত্রণ পত্রে এমন কিছু ছিল না যাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সম্মেলন ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির বিষয়ে কিছু করতে চায়। ছাত্রদের ভয়লেশহীন জাতি গঠনকারীরূপে গড়ে তোলার জন্য যে সম্মেলন কিছু করতে চায়, তারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এটা একটা কম কথা নয় যে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিন্ধু প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকদল সরবরাহ করছে। কিন্তু যারা বেশী দেয়, তাদের কাছেই না সর্বদা আরও বেশী আশা করা হয়। বিশেষ করে গুজরাঠ বিদ্যাপীঠে উচ্চ কোটার সহকর্মী সংগ্রহ করে দেবার জন্য আমার যখন সিন্ধু বন্ধুদের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন, তখন আমি অন্ততঃ শুধু অধ্যাপক ও খাদি কর্মী পেয়ে সন্তুষ্ট থাকব না। সিন্ধুতে সাধু ভাস্বানীর জন্ম। একাধিক মহান সমাজ সংস্কারকের কারণ সিন্ধু গর্ব করতে পারে। কিন্তু যদি শুধু সিন্ধুর সাধু বা সংস্কারকদের প্রশংসা আত্মসাৎ করে ছাত্ররা সন্তুষ্টি বোধ করে, তবে তারা অন্যায় করছে বলতে হবে। তাদের জাতি গঠনকারী হতে হবে। পশ্চিমের মেকী অনুকরণ এবং শুদ্ধ ও স্খলিত ইংরাজী বলা ও লেখার ক্ষমতা মুক্তি মন্দির নির্মাণ কার্যে বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। বুভুক্ষু ভারতের পক্ষে অতীব ব্যয়বহুল এক শিক্ষাপদ্ধতির সুযোগ ছাত্ররা পাচ্ছে এবং এ শিক্ষা পাবার আশা পোষণ করতে পারে অতীব স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন মাত্র। জাতির বেদীমূলে নিজেদের হৃৎপিণ্ড ডালি দিয়ে ছাত্রদের এই শিক্ষার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। প্রাচীনপন্থী প্রথার সংস্কার কার্যে ছাত্রদের অগ্রদূতের পদ গ্রহণ করতে হবে এবং জাতির জীবনযাত্রায় যা কিছু শুভ তা বজায় রেখে সমাজে যে বহুবিধ কদাচার অনুপ্রবেশ করেছে তার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে।

এইসব সম্মেলনের কাজ হচ্ছে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ছাত্রদের চক্ষুরুন্মীলন করে দেওয়া। বিদেশী ধাঁচে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায় ক্লাসে যেসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়, এইসব সম্মেলন সে সম্বন্ধে ছাত্রদের চিন্তা করতে শেখাবে। যেসব বিষয়কে নিছক রাজনীতি বলে মনে করা হয়, ছাত্ররা হয়তো এসব সম্মেলনে তার আলোচনার সুযোগ পাবে না। তবে জাতির কাছে গভীরতম রাজনৈতিক সমস্যার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আর্থিক প্রশ্নাবলী তারা অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করতে পারে এবং এ করাই উচিত। জাতির এমন কোন

অংশ নেই যা জাতিগঠনমূলক কার্যসূচীর আওতায় পড়ে না। মূক জনগণের মনে ছাত্রদের প্রভাব স্থষ্টি করতে হবে। ছাত্রদের কোন প্রদেশ, শহর, জাতি বা বর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে চলবে না। আমাদেরই জন্য এই বিশাল মহাদেশের প্রতিটি অধিবাসী অস্পৃশ্য, মদ্যপ, গুণ্ডা এবং এমন কি বেশ্যা আদির অস্তিত্ব সমাজে সম্ভবপর হয়েছে। ছাত্রসমাজকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা শিখতে হবে। প্রাচীনকালে ছাত্রদের বলা হত ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ঈশ্বরের সংসর্গে পরিভ্রমণকারী। রাজন্যবর্গ এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের সম্মান করতেন। জাতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের ভার নিত এবং এর পরিবর্তে তারা জাতিকে দিত শত শত ব্রজ্র কঠিন আত্মা, তীক্ষ্ণ মেধা এবং বলশালী ভুজসমূহ। বর্তমান বিশ্বে দুর্দশাগ্রস্ত জাতিসমূহের মাঝে ছাত্রদের সর্বত্র ভবিষ্যৎ আশাস্থল বলে বিবেচনা করা হয় এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সংস্কারের জন্য আত্মোৎসর্গকারী নেতার পদাভিষিক্ত হয়। ভারতে যে এর নিদর্শন নেই এমন কথা নয়, তবে তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত এইসব কাজ করাই হবে ছাত্র সম্মেলনের আদর্শ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—৯-৬-১৯২৭।

২৩। বাঙ্গালোর বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাষণ

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "কোথায় যে এসেছি একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! আমার মত যে গ্রামবাসী এসব দেখে ভীতিজড়িত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হয়ে পড়ে, তার এখানে স্থান নেই। বেশী কিছু বলার অবস্থা আমার নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে এখানের এইসব বিরাট বিরাট গবেষণাগার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখার স্থযোগ পাওয়া গেছে লক্ষ লক্ষ জনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের কারণে। কারণ টাটার ত্রিশলক্ষ টাকা বাইরে থেকে আসেনি, আর মহীশূর রাজের দানের উৎস ও বেগার প্রথা ছাড়া আর কি? যেসব অট্টালিকা ও যন্ত্রপাতি কোন কালেই গ্রামবাসীদের উপকারে আসবে না, হয়ত ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাজে লাগবে, তার জন্য কিভাবে আমরা তাদের অর্থের সদ্ব্যয় করছি একথা যদি আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বুঝাতে যাই, তাহলে তারা তা বুঝতেই পারবে না। এসব কথায় তারা কোন উৎসাহ প্রকাশ করবে না। আমরা কিন্তু তাদের আস্থা অর্জনের কোন চেষ্টাই করি না এবং এসব স্থবিধা পাওয়া স্বতঃসিদ্ধ অধিকার বলে মনে করি। আমরা ভুলে যাই যে 'প্রতি-

নিবিত্বের অধিকার না দিলে কর দেব না'—এই নীতি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নিয়ম যদি সত্যি সত্যি তাদের প্রতি প্রয়োগ কর এবং তাদের টাকা পয়সার হিসাব-কিতাব তাদের কাছে দাখিল করার দায়িত্ব যদি বোধ কর, তবে দেখতে পাবে যে এইসব গবেষক নিয়োগের অন্য আর একটি দিক আছে। তখন তোমরা নিজ হৃদয়ে এদের জন্য সংকীর্ণ স্থান নয়, অনেকখানি জায়গা আছে দেখতে পাবে। হৃদয়ের এই বিস্তীর্ণ স্থানটুকুর যদি তোমরা উচিতমত হেফাজত কর, তাহলে যেসব লক্ষ লক্ষ জনগণের মেহনতের উপর তোমাদের শিক্ষা নির্ভরশীল, তাদের মঙ্গলের জন্য তোমরা তোমাদের জ্ঞান নিয়োগ করবে। তোমরা আমাকে যে টাকার থলি দিয়েছ, তা আমি দরিদ্রনারায়ণের কাজে নিয়োগ করব। সত্যকার দরিদ্রনারায়ণকে আমি চোখে দেখি নি, শুধু তার কল্পনা করে নিয়েছি। সুদূর যোগাযোগ বিহীন গ্রামের নিভৃত পল্লীর অধিবাসী যেসব কাটুনী এই অর্থ পাবে, তারাও সত্যকার দরিদ্রনারায়ণ নয়। তোমাদের অধ্যাপকদের কাছে শুনেছি যে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণ সন্ধান করতে একাধিক বৎসরের গবেষণা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এইসব গ্রামবাসীর সন্ধান করবে কে ? তোমাদের গবেষণাগারের কোন কোন গবেষণা কার্য যেমন চব্বিশ ঘণ্টাই চলে, তেমনি তোমাদের হৃদয়ের সুবিস্তীর্ণ অংশ যেন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির হিতকামনায় সদাই উষ্ণ থাকে।

"পথে ঘাটে বিচরণশীল সাধারণ মানুষের তুলনায় তোমাদের কাছে আমি অনেক বেশী আশা করি। যেটুকু তোমরা করেছ, তাতে তৃপ্তি বোধ করে একথা বোলো না, 'আমরা যা পেরেছি, করেছি। এবার টেনিস কিংবা বিলিয়ার্ড খেলা যাক।' আমি বলব যে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে আর টেনিসের ময়দানে তোমাদের নামে প্রতিদিন যে বিরাট ঋণের অঙ্ক চাপছে তার কথা স্মরণ করো। তবে ভিক্ষার চাল আবার কাড়া-আকাড়া কি ? তোমরা আমাকে যা দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে প্রার্থনা আমি জানালাম তার কথা ভেবো এবং তাকে কার্যান্বিত করার চেষ্টা করো। দরিদ্র রমণীরা তোমাদের জন্য যে বস্ত্র উৎপাদন করে, তা পরতে শঙ্কিত হয়ো না এবং খাদি পরিধান করার জন্য তোমাদের নিয়োগকর্তা যদি সিধা দরজা দেখিয়ে দেন, তাতে ভয় পেয়ো না। আমি চাই যে তোমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে বিশ্বের সামনে নিজ বিশ্বাসের বলে অকম্পিত পদে দাঁড়াও। মূক জনগণের জন্য তোমাদের মনে যে উদ্যম আছে তা যেন অর্থের সন্ধানে নিষ্প্রভ না হয়। আমি বলছি যে জড়জগতে সংশ্লিষ্ট কোন পদার্থের গবেষণা বিনা শুধু আভ্যন্তরীণ (আভ্যন্তরীণ গবেষণা ছাড়া সব গবেষণাই তো নিষ্ফল) গবেষণার ফলে তোমরা এমন বেতার যন্ত্রের আবিষ্কার করতে পার, যা লক্ষ লক্ষ জনগণের

হৃদয়ের সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করবে। তোমাদের সকল আবিষ্কারের লক্ষ্য যদি দারিদ্রের মঙ্গল সাধন না হয়, তাহলে রাজাগোপালাচারী ঠাট্টা করে যে কথা বলেছেন তাই সত্য হবে—তোমাদের এসব কর্মশালা শয়তানের কারখানার চেয়ে ভাল হবে না। যাক, গবেষণায় নিযুক্ত ছাত্রদের যেমন মননশীল স্বভাবের হওয়া উচিত, সেরকম মানসিক স্থিতি যদি তোমাদের এতক্ষণ থেকে থাকে তাহলে বুঝবে আমি যথেষ্ট চিন্তার খোরাক দিয়েছি।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া—২ -৭ ১৯২৭।

২৪। ছাত্রসমাজ ও গীতা

কয়েকদিন আগে জনৈক মিশনারী বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভারতবর্ষ যদি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি হয়, তবে অধিকাংশ ছাত্রেরই নিজ ধর্ম এবং এমন কি ভাগবদ্‌গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান নেই কেন? বন্ধুটি স্বয়ং শিক্ষাব্রতী এবং নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি জানালেন যে নূতন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের নিজ ধর্ম বা ভাগবদগীতা সম্বন্ধে জানা আছে কিনা? দেখা গেছে যে ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

কিছু সংখ্যক ছাত্রের নিজধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বলে ভারত আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি নয় বা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ছাত্রদের অজ্ঞতার অর্থ যাদের মধ্যে তারা বাস করে, সেই ভারতবাসীর ভিতর যাবতীয় ধর্মীয় ভাবনা ও আধ্যাত্মিকতার অভাব সূচক নয় ইত্যাদি যেসব সিদ্ধান্ত ঘটনা পূর্বোক্ত থেকে করা সম্ভব, এক্ষেত্রে আমি তার আলোচনা করব না। তবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সরকারী শিক্ষায়তনে যেসব ছাত্র আসে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধ বিহীন। আমার মিশনারী বন্ধুটি মহীশূরের ছাত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন এবং দেখে আমার দুঃখ হল যে মহীশূর রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্ররা কোন ধর্ম শিক্ষা পায় না। আমি খবর রাখি যে একদল ব্যক্তি মনে করেন যে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। এ কথাও আমি জানি যে, ভারতের মত যে দেশে প্রায় প্রত্যেকটি প্রচলিত ধর্মমত এবং তাদের শাখা প্রশাখা রয়েছে, সেখানে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা কত কঠিন। কিন্তু ভারতকে যদি আধ্যাত্মিক দেউলিয়া বৃত্তি ঘোষণা না করতে হয়, তবে যুব সম্প্রদায়কে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া অন্তত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার মত সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে

করতে হবে। একথা সত্য যে ধর্মপুস্তকের জ্ঞান আর ধর্ম—এ দুই এক জিনিস নয়। কিন্তু আমরা যদি ধর্ম শিক্ষা না-ই দিতে পারি তবে যেন অন্ততঃ আমাদের ছেলে-মেয়েদের তার চেয়ে আর একটু নীচের জিনিস—ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারি। তবে বিদ্যালয়ে এ জাতীয় শিক্ষা দেওয়া হোক, বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্ম সম্বন্ধে নিজ প্রচেষ্টায় জ্ঞানার্জন করা। বিতর্ক সভা বা আজকাল যে সুতাকাটার বর্গ চলছে, তারা তার অনুকরণে এ রকম বর্গ নিজেদের জন্য চালাবে।

শিমোগা কলেজিয়েট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, শতাধিক হিন্দু ছাত্রের মধ্যে খুব বেশী হলে আটজন মাত্র ভাগবদগীতা পড়েছে। যে কয়জন গীতা পড়েছে, তাদের মধ্যে কেউ গীতার অর্থ বুঝেছে কিনা এ প্রশ্ন করা হলে কেউ হাতই তুললো না। পবিত্র কোরান পড়েছে কিনা জানতে চাওয়ায় পাঁচ-ছয় জন মুসলমান ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকেই হাত তুলেছিল। তবে একজন মাত্র বলেছিল যে সে এর অর্থ বোঝে। আমার মতে গীতার অর্থ বোঝা খুবই সহজ। এতে অবশ্য এমন কতকগুলি মৌলিক সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সমাধান করা নিঃসংশয়ে কঠিন। তবে আমার মতে গীতার সাধারণ ভাবধারা গ্রহণ করতে খুব বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সম্প্রদায় একে প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। গীতা যাবতীয় গোঁড়ামির স্পর্শ মুক্ত। এতে সংক্ষিপ্ত আয়তনের ভিতর পূর্ণাঙ্গ যুক্তিসঙ্গত নৈতিক বিধান পাওয়া যায়। বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়েরই এ সন্তোষ বিধান করে। সেইজন্য একে দার্শনিক ও ভক্তিমূলক দুই বলা চলে। এর আবেদন সার্বিক। এর ভাষা অতীব সরল। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি যে ভারতের প্রত্যেকটি কথ্য ভাষায় এর প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং অনুবাদ কার্য যেন জটিলতা দোষমুক্ত হয়। অনুবাদ যেন এমন হয় যে সাধারণ মানুষকে গীতা পড়ানো সহজসাধ্য হয়। তবে অনুবাদকে মূলের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য এ প্রস্তাব নয়। কারণ আমি আমার অভিমতের পুনরুক্তি করতে চাই যে প্রতিটি হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃত শেখা উচিত। কিন্তু আগামী বহুদিন পর্যন্ত এমন অনেকে থাকবে, যারা সংস্কৃত জানবে না। শুধু সংস্কৃত না জানার অপরাধে তাদের ভাগবদগীতার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে রাখা আত্মহত্যার সামিল হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—২৫-৮-১৯২৭।

২৫। ছাত্রদের অংশ *

টাকার থলির অর্থ

আমি জানি যে আমার বহু বিশিষ্ট ও জ্ঞানী দেশবাসী এই বলে চরকার দাবীকে নস্যাৎ করেছেন—যে ছোট্ট চরকাটিকে আমাদের মাতা ও ভগ্নী সমাজ হাসিমুখে বাতিল করে দিয়েছেন, তা দিয়ে কখনও স্বরাজ অর্জিত হতে পারে না। তথাপি তোমরা আমার দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছ এবং আমি এতে অত্যন্ত সুখী হয়েছি। তোমরা ছাত্ররা এ সম্বন্ধে অভিনন্দনপত্রে খুব বেশী না বললেও যা বলেছ তাতে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে চরকা তোমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন পরিগ্রহ করেছে। সুতরাং এই টাকার থলিই তোমাদের চরকা-প্রীতির প্রথম ও শেষ নিদর্শন যেন না হয়। এ যদি তোমাদের ভালবাসার শেষ চিহ্ন হয় তবে তোমাদের বলে রাখছি যে আমার পক্ষে এ বড় অস্বস্তিকর বোধ হবে। কারণ এই টাকা বুভুক্ষু জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে যে খাদি উৎপাদন করা হবে তা যদি তোমরা না ব্যবহার কর, তাহলে এ টাকার আমি সদ্ব্যয় করতে পারব না। সত্যিকথা বলতে গেলে চরকার প্রতি মৌখিক বিশ্বাস জ্ঞাপন করে কতকটা পিঠ চাপড়ানো গোছের মনোভাব নিয়ে আমার দিকে কয়েকটি টাকা ছুঁড়ে দিলে না আসবে স্বরাজ আর না হবে বুভুক্ষু ও মেহনতী জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যরূপী সমস্যার সমাধান। একটু ভুল হয়ে গেছে। আমি মেহনতী জনসাধারণ বলেছি। বিবরণটা সত্য হলে ভাল ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় আমাদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন না করায় সারা বছর এই বুভুক্ষু জনসাধারণের মেহনত করার রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তাদের উপর আমরা এমন একটা অবকাশের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি যা কিনা বছরে চার মাস অন্ততঃ তারা চায় না। এ কথা আমার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা নয়। এই জনগণের ভিতর তোমাদের যে স্বদেশবাসী গভীরভাবে মিশেছে তার কথা বাতিল করলেও আমি বলব যে বহু ব্রিটিশ শাসক এই সত্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুতরাং এই টাকার থলি নিয়ে অনশনরতা ভগ্নীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। পক্ষান্তরে এতে তাদের আত্মার দৈন্য সৃষ্টি করা হবে। তারা ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে দয়ার দানে জীবনধারণের স্বভাব প্রাপ্ত হবে। যে দেশ বা ব্যক্তিকে ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ করতে হয়, তাদের যেন ভগবান দয়া করেন।

* মাদ্রাজের পাচিয়াপ্পা কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা।

তোমাদের বা আমার কর্তব্য হচ্ছে আমাদের এইসব ভগ্নীরা যাতে নিজ গৃহে সুরক্ষিত অবস্থায় থেকে কাজ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং চরকা চালানো ছাড়া এ জাতীয় আর কি কাজ হতে পারে ? এ পেশা মর্যাদাকর ও সৎ এবং এটা কাজের মত কাজ। তোমাদের কাছে এক আনা পয়সার হয়ত কোন মূল্য নেই। দুই, তিন, চার বা পাঁচ মাইল হেঁটে খানিকটা ব্যায়াম করার বদলে তোমরা হয়ত এক আনা ফেলে দিয়ে ট্রামে বসে সময়টা আলস্যভরে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু এই আনিটি যখন কোন দরিদ্র ভগ্নীর হাতে পড়ে তখন এ সার্থক হয়ে ওঠে। এর জন্য সে পরিশ্রম করে ও এর বিনিময়ে সে আমাকে তার নিষ্কলঙ্ক হাতে কাটা সুতা দেয় এবং এই সুতার পিছনে ইতিহাস রয়েছে। এ সুতা রাজা-রাজড়াদের পরিচ্ছদে পরিণত হবার মর্যাদার অধিকারী। কলের কাপড়ের এ ঐতিহ্য নেই। আমার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার প্রায় সর্বক্ষণের কার্য হওয়া সত্ত্বেও একটিমাত্র বিষয়ে আমি তোমাদের আর আবদ্ধ রাখব না। তোমরা যদি অন্তত অতঃপর (অবশ্য ইতিপূর্বেই যদি এ সংকল্প না নিয়ে থাক) খাদি ছাড়া অন্য কিছু না পরার আদর্শে দৃঢ়সংকল্প না হও, তবে তোমাদের এই টাকার থলি আমার কাজে সহায়ক হবার বদলে বাধা হবে।

ব্রাহ্মণত্ব না পশুত্ব

তোমরা বাল্য বিবাহ ও বালবিধবাদের কথা উল্লেখ করেছ। জনৈক জ্ঞানী তামিল ভদ্রলোক আমার কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছেন যে এই বালবিধবাদের সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের কিছু বলতে চান। তিনি জানিয়েছেন যে এই প্রদেশের বালবিধবাদের ভারতের চতুষ্পার্শে অন্য সকল এলাকার বালবিধবাদের চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়। একথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করার অবকাশ আমার ঘটেনি। এসম্বন্ধে তোমরা আমার চেয়ে ভাল জান। আমার চতুষ্পার্শে এই যে তোমরা যুবকের দল রয়েছ, আমি চাই যে তোমাদের নিজেদের প্রতি আচরণ আর একটু সৌজন্যমূলক হোক। এতে তোমরা রাজি হলে আমার একটি ভাল প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত এবং অনেকে হয়ত ব্রহ্মচর্যের সংকল্প গ্রহণ করেছ। "অনেকে হয়ত" কথাটি আমি এইজন্য বললাম যে, ছাত্রদের আমি জানি এবং যে ছাত্র তার ভগ্নীর প্রতি কামনা-লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ করে, সে ব্রহ্মচারী নয়। তোমরা এই পবিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে তোমরা বিধবা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না এবং বিবাহযোগ্যা কোন বিধবা পাত্রী না পেলে অবিবাহিত থাকবে। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্বে এ সিদ্ধান্তের কথা

ঘোষণা কর। পিতামাতা জীবিত থাকলে তাঁদের একথা জানাও এবং নিজের বোনদেরও এর কথা বল। কথাটা আমি 'বিধবা' বললাম বটে ; কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ আমি মনে করি যে দশ-পনের বছরের যে মেয়েটির তথাকথিত বিবাহ সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপনের সুযোগ ছিল না এবং বিবাহের পর যে হয়ত কোনদিন তথাকথিত স্বামীর সঙ্গে বাস করেনি, তাকে অকস্মাৎ একদিন বিধবা বলে ঘোষণা করলেই সে বিধবা হয়ে যায় না। এরকম মেয়েকে বিধবা আখ্যা দেওয়া এই শব্দটির অপপ্রয়োগ এবং ভাষা ও যা কিছু পবিত্র—তার অপপ্রয়োগ। হিন্দুধর্মে "বিধবা" কথাটির এক পবিত্র তাৎপর্য আছে। পরলোকগতা শ্রীমতী রামাভাই রাণাড়ের মত বিধবা যাঁরা "বিধবা" কথাটির অর্থ জানেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু নয় বৎসর বয়স্ক একটি শিশু স্বামীর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এ প্রদেশে যদি অবশ্য এই ধরণের বিধবা না থেকে থাকে তাহলে আমার কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু এখানে যদি এইরকম বালবিধবার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে পূর্বোক্ত সংকল্প গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমার মধ্যে এইটুকু গোঁড়ামি আছে যে আমি বিশ্বাস করি যে জাতির এই জাতীয় পাপের প্রতিক্রিয়া স্থূল বস্তুর উপর পড়ে। আমি বিশ্বাস করি যে এই জাতীয় পাপের একত্র সমাবেশের ফলেই আজ আমরা পরাধীন। হাউস অফ কমন্স থেকে হয়ত বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা শাসনতন্ত্র তোমরা পেতে পার। কিন্তু এ শাসনতন্ত্রকে রূপ দেবার উপযুক্ত নরনারী দেশে পাওয়া না গেলে এসব নিষ্প্রয়োজন সাবুদ হবে। দেশে যতদিন এমন একজনও বিধবা থাকবে, যে তার মৌলিক অধিকার পূর্তির জন্য আগ্রহশীল অথচ বলপ্রয়োগে তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, ততদিন কি করে তোমরা আশা কর যে আমরা ত্রিশ কোটী লোকের এই জাতির শাসনভার বহন করতে পারি বা এর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ ? এর নাম ধর্ম নয়—অধর্ম। হিন্দুধর্মে জারিত হওয়া সত্ত্বেও আমি একথা বলছি। তোমরা যেন এ ভুল করো না যে পাশ্চাত্য প্রভাব আমাকে দিয়ে একথা বলাচ্ছে। আমি দাবী করি যে আমার মধ্যে নির্ভেজাল ভারতীয়ত্বের ধারা উপচে পড়ছে। পাশ্চাত্য জগতের অনেক কিছু আমি নিজের করে গ্রহণ করলেও এ বিষয়টি গ্রহণ করিনি। হিন্দুধর্মে এ জাতীয় বৈধব্যের কোন সমর্থন নেই।

বালবিধবারের সম্বন্ধে আমি যা কিছু বলেছি, স্বভাবতই তা অপরিণত বয়স্কা স্ত্রীদের প্রতিও প্রযোজ্য। তোমরা নিজেদের বাসনার অন্তত এতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে যে ১৬ বছরের কম বয়সের কোন মেয়েকে বিয়ে করবে না। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি মেয়েদের সর্বনিম্ন বিবাহযোগ্য বয়স ২০ বলে নির্ধারণ করতাম।

এমন কি ভারতে কুড়ি বছর বয়সটাও যথেষ্ট তাড়াতাড়ি হয় বলতে হবে। মেয়েদের অকাল বার্ধক্যের জন্য দায়ী আমরাই, ভারতের আবহাওয়া নয়। কারণ আমি কুড়ি বছর বয়সের এমন অনেক মেয়েদের জানি, যারা পবিত্র ও সারল্যের প্রতিমূর্তি স্বরূপ এবং তারা চতুর্দিকের লোলুপ-কামনার নিশ্বাস-ঝটিকার সম্মুখে আত্মরক্ষায় সক্ষম। অসময়ে মেয়েদের প্রবীণা করে দেবার দায়িত্ব আমরা যেন সযত্নে বুকে আঁকড়ে না ধরে থাকি। অনেক ব্রাহ্মণ ছাত্র আমাকে বলে যে তাদের পক্ষে এ আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। কারণ ব্রাহ্মণ কন্যারা দশ থেকে বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে পাত্রস্থ হয়ে যায় ও কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ ষোল বছর পর্যন্ত নিজ কন্যাকে অবিবাহিত রাখে বলে ও বয়সের পাত্রী পাওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ যুবকদের প্রতি আমার বক্তব্য হচ্ছে, নিজেকে সংযত করতে না পারলে ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দাও। ষোল বছরের প্রাপ্তবয়স্কা বালবিধবা কোন পাত্রী নির্বাচন করো। এ বয়সের ব্রাহ্মণ বংশজাত বালবিধবা না পেলে যে কোন জাতের মেয়েকে বিয়ে কর। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে বারো বছরের একটি বালিকার উপর বলপ্রয়োগ করার বদলে কোন ছেলে যদি জাতির বাইরে বিবাহ করে, তাহলে হিন্দুদের যাবতীয় দেব-দেবী তাকে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। তোমাদের হৃদয় পবিত্র না হলে এবং তোমরা নিজ কামনা-বাসনাকে সংযত করতে সমর্থ না হলে কিছুতেই শিক্ষিত আখ্যা পেতে পার না। নিজ প্রতিষ্ঠানকে তোমরা প্রমুখ আখ্যায় ভূষিত করেছ। আমি চাই যে তোমরা প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ছাত্ররূপে চরিত্রবলে মহীয়ান হয়ে বিশ্বে বিচরণ কর। আর চরিত্র গঠন ছাড়া শিক্ষার মূল্য কি এবং প্রাথমিক ব্যক্তিগত শুচিতা ছাড়া চরিত্রেরই বা মূল্য কি? ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। বর্ণাশ্রম ধর্মের পক্ষ নিয়ে আমি বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব অস্পৃশ্যতা, কুমারীর বৈধব্য এবং শিশু সরল কুমারীর উপর নিপীড়ন সমর্থন করে, তা আমার নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ বিতরণ করে। এ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যঙ্গ। এর ভিতর ব্রহ্ম জ্ঞানের তিলমাত্র নেই। শাস্ত্র গ্রন্থরাজির সঠিক ব্যাখ্যাও এ নয়। এর নাম নিছক পশুপ্রবৃত্তি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপাদান এর চেয়ে অনেক কঠিন। আমি চাই যে আমার এই কথাকটি তোমাদের অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে পৌঁছাক।

ধূমপানের উপকারিতা

কালিকটের জনৈক অধ্যাপকের অনুরোধক্রমে আমি এবার সিগারেট সেবন এবং চা ও কফি পান সম্বন্ধে কিছু বলব। এগুলি জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়

নয়। এমন অনেকে আছে যারা দিনে দশ পেয়ালা কফি খায়। তাদের স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু বিকাশ এবং কাজের খাতিরে জাগরিত রাখার জন্য কি এটা অপরিহার্য ? জেগে থাকার জন্য যদি তাদের চা বা কফি পান করা অপরিহার্য বোধ হয়, তাহলে তাদের রাত না জেগে শুয়ে পড়াই ভাল। আমরা যেন এ সবের ক্রীতদাসে পরিণত না হই। কিন্তু চা বা কফি পানকারীদের মধ্যে অধিকাংশই এর দাস। চুরুট ও সিগারেট দেশী বা বিদেশী যাই হোক না কেন, তার থেকে দূরে থাকতে হবে। সিগারেট সেবন করা কতকটা আফিং খাওয়ার মত এবং যে চুরুট তোমরা খাও তাতে সামান্য মাত্রায় আফিং মেশানো থাকেও। এর প্রভাব তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীর উপর পড়ে এবং পরে এ আর তোমরা ছাড়তে পার না। একজন ছাত্র কি করে তার মুখকে চিমনীতে রূপান্তরিত করে কলুষিত করে! এইসব চুরুট, সিগারেট, চা ও কফির অভ্যাস বর্জন করলে দেখবে তোমাদের কতটা সাশ্রয় হচ্ছে। টলস্টয়ের একটি গল্পে আছে যে একজন মাতাল ধূমপান না করা পর্যন্ত খুন করতে ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ার পরই সে সহাস্য বদনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আরে, আমি কি ভীরু!" আর তারপরই ছুরি নিয়ে নিজ কার্য সাধন করল। টলস্টয়ের এ বর্ণনা অভিজ্ঞতালব্ধ। তাঁর যাবতীয় রচনার ভিত্তি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিনি মদ্যপান করার চেয়েও ধূমপানের অধিকতর বিরোধী। তবে তোমরা যেন এই ভুল করো না যে মদ্যপান এবং ধূমপানের ভিতর মদ্যপান অপেক্ষাকৃত কম হানিকর। সিগারেট যদি বেলজিবাব (জনৈক নরকদূত) হয়, তবে মদ হচ্ছে শয়তান।

হিন্দী

এরপর হিন্দীর কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন : উত্তর ভারতে জনসাধারণের সমর্থনে হিন্দী প্রচার দপ্তর চলছে। তারা প্রায় লাখখানেক টাকা খরচ করেছেন এবং হিন্দী শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে নিজ কর্তব্য করে যাচ্ছেন। কথঞ্চিৎ অগ্রগতি হলেও এ বিষয়ে আরও উন্নতির অবকাশ আছে। দৈনিক একঘন্টা সময় দিলে এক বছরের মধ্যে তোমরা হিন্দী শিখে যাবে সাধারণ হিন্দী তোমরা ছয় মাসের মধ্যে বুঝতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে আমি হিন্দীতে কথা বলতে পারছি না; কারণ তোমাদের মধ্যে অনেকেই এ ভাষা জান না। ভারতবর্ষে হিন্দীকে সর্বসাধারণের ভাষায় পরিণত করতে হবে। তোমাদের সংস্কৃতও শেখা উচিত। তাহলে ভাগবদগীতা পড়তে পারবে। একটি প্রমুখ হিন্দু প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসাবে তোমাদের ভাগবদগীতা শেখা উচিত। আমি চাই যে মুসলমান ছাত্ররাও এ

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করুক। (একটি কণ্ঠস্বর : এখানে পঞ্চমদের স্থান নেই) একথা আমি নূতন শুনলাম। এ প্রতিষ্ঠানের দ্বার পঞ্চম এবং মুসলমানদের কাছে খুলে দিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে পঞ্চমরা প্রবেশাধিকার না পেলে আমি এর হিন্দুত্ব ঘুচাব। (হর্ষধ্বনি) এটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে পঞ্চম বা মুসলমানরা যে এখানে শিক্ষা পাবে না, এর কোন যৌক্তিকতা নেই। আমার মতে ট্রাস্টিদের সামনে এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীর সংশোধন করার সময় এসে গেছে। আমি একজন নিষ্ঠাবান ও ঈশ্বরবিশ্বাসী হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের নীতিতে জারিত। আমি হিন্দুধর্মের কোন কেউকেটা ধরণের সংস্কারক নই। হিন্দুধর্মের সেরা যা, তাই অবলম্বন করে আমি চলার চেষ্টা করছি। এই আমি আজ অনুরোধ জানাচ্ছি যে এ প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীর সংশোধন করা হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি দয়া করে এই অনুরোধ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করবেন এবং এই প্রদেশে আমার সাময়িক উপস্থিতি কালের মধ্যেই যদি খবর পাই যে আমার আবেদন ফলপ্রসূ হয়েছে, তাহলে আমি অত্যন্ত প্রীত হব।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১৫-৯-১৯২৭।

২৬। সবেদন প্রতিবাদ

একটি বাঙলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখছেন :

"মাদ্রাজের ছাত্রদের আপনি যে শুধু বিধবা বিবাহ করার উপদেশ দিয়েছেন, তাতে আমরা আতঙ্কিত হয়েছি। আমি আপনার বক্তব্যের বিনম্র অথচ সবেদন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

"এই জাতীয় উপদেশের ফলে বিধবাদের আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে এক জন্মে মুক্তি পাবার প্রবৃত্তি শিথিল হবে। অথচ এই কারণেই ভারতীয় নারীর স্থান বিশ্বে অনন্য। আপনার উপদেশের ফলে তারা ঐহিক ভোগ বিলাসের পুঁতিগন্ধময় পথে নিক্ষিপ্ত হবে। বিধবাদের জন্য এই জাতীয় গভীর সহানুভূতি তাদের অহিত সাধন করবে এবং যেসব কুমারীদের পাত্রস্থ করা এমনিতেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রতিও অবিচার করা হবে। আপনার বিবাহ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হিন্দুদের জন্মান্তর, পুনর্জন্ম এবং এমন কি মুক্তি সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে হিন্দু সমাজকে অবাঞ্ছনীয়রূপে অন্যান্য সমাজের সমপর্যায়ে টেনে নামাবে। আমাদের সমাজেও অবশ্য দুর্নীতির সঞ্চার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের হিন্দু আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব উচ্চে ওঠার প্রচেষ্টা করতে হবে। অন্য কোন

সমাজ বা আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, বেহুলা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদির উদাহরণ হিন্দু সমাজকে পরিচালিত করবে এবং আমাদেরও কাজ হবে সমাজকে তাঁদের আদর্শে পরিচালিত করা। এই কারণে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে এইসব জটিল বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা থেকে আপনি বিরত থাকুন এবং সমাজকে যথা অভিরুচি চলতে দিন।"

এই সবেদন প্রতিবাদে আমার মত পরিবর্তন হয়নি বা আমি অনুতপ্তও বোধ করছি না। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজ ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত ও সেপথে চলতে দৃঢ়সঙ্কল্প একজনও বিধবা আমার উপদেশে নিজ পথ বর্জন করবে না। তবে আমার উপদেশ অনুসৃত হলে যেসব অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বিবাহানুষ্ঠানের সময় বিবাহের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য উপলব্ধি করেনি, তারা প্রাণে বেঁচে যাবে। তাদের ক্ষেত্রে 'বিধবা' কথাটি ব্যবহার করা অর্থ একটি পবিত্র শব্দের উৎকট অপপ্রয়োগ মাত্র। সত্য কথা বলতে কি পত্রলেখকের মনোগত ভাবের সম্মানার্থই আমি দেশের যুবকদের পরামর্শ দিয়েছি যে হয় তারা এইসব তথাকথিত বিধবাদের বিবাহ করবে, নয় চিরকুমার থেকে যাবে। এ প্রথার পবিত্রতা তখনই রক্ষিত হবে, যখন বালবিধবাদের এর আওতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্মচর্য পালন করলে বিধবাদের যে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এ কথাটি ভিত্তিহীন। এই চরম আশীর্বাদ অর্জন করতে হলে ব্রহ্মচর্য ছাড়া আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। আর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্রহ্মচর্যের কোন মূল্য নেই। বরং বহু ক্ষেত্রে এর ফলে সমাজে গোপন দুর্নীতির প্রসার হয়। পত্র-লেখক যেন অবগত থাকেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা লিখছি।

আমার উপদেশের ফলে কুমারী বিধবাদের প্রতি যদি প্রাথমিক ন্যায় বিচার করা হয়, তাহলে আমি সত্য সত্যই সুখী হব এবং এর ফলে যদি অন্যান্য কুমারীরা অকালে পুরুষের কামনা-বহ্নির ইন্ধনে পরিণত না হয়ে বয়স ও জ্ঞানের দিক থেকে পরিণত হবার অবকাশ পায়, আমি তাতে আনন্দিত হব।

আমি বিবাহ সম্বন্ধে এমন কোন সিদ্ধান্ত প্রচার করিনি, যা পুনর্জন্ম, জন্মান্তর বা মুক্তির প্রতিকূল। পাঠকদের বোধহয় জানা আছে যে, যেসব লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে আমরা আক্রোশবশতঃ নীচ জাতীয় বলে আখ্যা দিই, তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা নেই। প্রবীণ বয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা যদি না ওঠে, তাহলে ভ্রমবশতঃ যাদের বিধবা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাদের সত্যকার বিবাহ কি করে যে সেই মহান মুক্তির বিশ্বাসের পথের বাধা হতে পারে, একথা বুঝতে আমি অক্ষম। পত্রলেখক একথা জেনে বোধ হয় আনন্দিত হবেন যে আমার কাছে

জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম শুধু সিদ্ধান্ত নয়, প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ের মত আমার কাছে এ এক প্রত্যক্ষ ঘটনা। মুক্তি-উপলব্ধিসিদ্ধ ব্যাপার এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে আমি এর জন্য চেষ্টা করছি। কুমারী বিধবাদের প্রতি যে নিদারুণ অবিচার হচ্ছে তার প্রতি আমাকে সচেতন করে তুলেছে মুক্তির এই অপরিসীম অনুভূতি। আমরা যেন দুর্বলতা তাড়িত হয়ে আধুনিক যুগের নিপীড়িতা কুমারী বিধবাদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে পত্রলেখক কর্তৃক উল্লিখিত সীতাদেবী ইত্যাদির অমর নামোচ্চারণ না করি।

পরিশেষে আমি বলব যে হিন্দুধর্মে সত্যকার বৈধব্য ব্রতের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ভাবে মর্যাদা আরোপিত হলেও আমি যতদূর জানি বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ করার স্বপক্ষে বৈদিকযুগে কোন সমর্থন ছিল না। তবে আমার জেহাদ সত্যকার বৈধব্য ব্রতের বিরুদ্ধে নয়। এর মারাত্মক ব্যঙ্গের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। সেরা উপায় হচ্ছে এই যে আমি যেসব মেয়েদের কথা বলছি, তাদের বিধবা বলেই মনে না করা। যেসব হিন্দুর মধ্যে বিন্দুমাত্র সৌজন্য বোধ আছে, তাঁরা এই সব মেয়েদের এই অসহ্য বোঝার ভার থেকে নিশ্চয় মুক্তি দেবেন। সুতরাং যথোচিত বিনয় সহকারে সরবে আমি আবার আমার বক্তব্যের পুনরুক্তি করছি যে প্রত্যেক হিন্দু যুবকের কর্তব্য হছে ভ্রমবশতঃ যেসব কুমারীদের বিধবা বলা হয়, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিবাহ না করা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—৬-১০-১৯২৭।

২৭। তিরুপুরের বক্তৃতা *

"ভক্তিভাবে গীতা পাঠ করার চেয়ে আর কোন শ্রেয়তর জীবন রসায়ন আছে বলে আমি জানি না। ছাত্ররা যেন এই কথা খেয়াল রাখে যে তাদের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের পরিচয় দান বা এমন কি গীতার জ্ঞানের বহর দেখাবার জন্য ভাগবদগীতা পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঘটছে না, গীতার প্রয়োজন আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জন্য এবং নৈতিক ধর্মসংকটে পথ খুঁজে পাবার জন্য। যে কেউ সশ্রদ্ধচিত্তে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করুক, তাকে এর ফলে জাতি এবং এর মারফত সমগ্র মানব সমাজের সাঁচ্চা সেবক হতেই হবে।" ঘটনাচক্রের বিচিত্র আবর্তে সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালোরের মত আজকের এই দিনটিও রবিবার এবং এইদিনে সেবা ও কর্মের এষণাদ্যোতক গীতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করার বিধি। ছাত্রদের আশীর্বাদ করণান্তর গান্ধীজী বললেন, "গীতায় কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই ত্রিবিধ বাণী বিদ্যমান। জীবন হবে এই ত্রিযোগের

* তিরুপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে

সুষ্ঠ সমন্বয়। তবে সেবার বাণীই হবে সব কিছুর ভিত্তি এবং জাতির সেবায় আত্ম-নিয়োগেচ্ছুকদের কাছে কর্মযোগের অধ্যায় দিয়ে গীতা সুরু করার চেয়ে কাম্য আর কি হতে পারে ? তবে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ও অস্তেয় এই পঞ্চায়ুধে সজ্জিত হয়ে তোমাদের এর দিকে অগ্রসর হতে হবে। শুধু তাহ'লেই তোমরা এর সঠিক ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। আর তবেই তোমরা গীতা পাঠে অহিংসার আবিষ্কার করবে, হিংসা নয়। আজ অনেকে এর ভিতর শুধু হিংসাই দেখার চেষ্টা করেন। প্রয়োজনীয় গুণ সমন্বিত হয়ে গীতা অধ্যয়ন কর এবং আমি তোমাদের কাছে বচনবদ্ধ হচ্ছি যে এর ফলে তোমরা মনোরাজ্যে এমন এক শান্তির উৎসের সন্ধান পাবে, যার সমাচার ইতিপূর্বে অবিদিত ছিল।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩-১১-১৯২৭

২৮। ব্যক্তিগত শুচিতার স্বপক্ষে *

একটু পূর্বেই ট্রিনিটা কলেজের ছাত্রদের আমি যা বলেছি তার পুনরুক্তি করে বলব যে, সত্য ও শুচিতার সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তোমাদের শিক্ষা একেবারে মূল্যহীন। তোমরা ছেলের দল যদি ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি না দাও এবং তোমাদের চিন্তায়, বচনে ও কর্মে যদি শুচিতার পরশ না লাগে, তাহলে পাণ্ডিত্যের আকর হলেও তোমরা শেষ হয়ে গেছ বলতে হবে।

একটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। শুচিতার প্রথম সোপান হচ্ছে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। তবে একথাও ঠিক যে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহারে মনের কথা বেরিয়ে আসেই। যে ছেলেটি নিজের মুখ পবিত্র রাখতে চায় তার কু-কথা উচ্চারণ করা চলবে না। কথাটা অবশ্য অতীব প্রাঞ্জল। এতদ্ব্যতিরেকে এমন কোন জিনিস সে মুখে দেবে না, যা কিনা তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে এবং যা তার বন্ধুদের ক্ষতি করবে।

আমি জানি যে অনেক ছেলে ধূমপান করে। ধূমপানের এই কদভ্যাসের কথা বিবেচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সর্বত্র ছেলেদের অবনতি হচ্ছে। তবে সিংহলের তোমরা বোধ হয় এদিক দিয়ে ব্রহ্মদেশের ছেলেদেরই মত খারাপ। আর তোমরা জান যে পার্শীদের অগ্নি-উপাসক বলা হয়। ভগবানকে তারা অগ্নির দেবাদিদেব সূর্যরূপী মহান পাবকের মাধ্যমে দেখলে কি হবে, তারা তোমাদের চেয়ে বড় অগ্নিপূজক নয়।

* ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ক্যাণ্ডির ধর্মরাজ কলেজে প্রদত্ত অভিভাষণ

পার্শীদের মধ্যে তোমরা অনেকে ধূমপান কর না এবং তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ছেলে থাকলে তোমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা হয় যাতে তারা ধূম্রজালে মুখমণ্ডল কলঙ্কিত না করে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ধূমপান কর, তবে অতঃপর এ বদভ্যাস পরিহার করবে। ধূমপানে শ্বাসপ্রশ্বাস কলুষিত হয়। অভ্যাসটি বিরক্তিকরও বটে। রেলের কামরায় উপবেশনকালীন ধূমপায়ী এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না যে গাড়ীতে অন্য যেসব ধূমপানে অনভ্যস্ত মহিলা বা পুরুষ রয়েছেন, তাদের পক্ষে তার মুখ-নিস্থত দুর্গন্ধ বিরক্তির কারণ হয়।

দূর থেকে সিগারেট জিনিসটিকে ছোট্ট মনে হতে পারে। কিন্তু এর ধোঁয়া যখন মুখের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে আসে, তখন সে হয়ে ওঠে বিষ। ধূমপায়ীদের খেয়াল থাকে না যে তারা কোথায় থুথু ফেলছে। অতঃপর গান্ধীজী টলস্টয় লিখিত একটি গল্পের উল্লেখ করলেন, যাতে দেখানো হয়েছে যে তাম্রকূট সেবনের প্রতিক্রিয়া মদ্যপানের চেয়েও মারাত্মক এবং তারপর বললেন :—

ধূমপানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয় এবং অভ্যাসটি খারাপ। তোমরা যদি কোন ভাল চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা কর তবে শুনবে যে বহুক্ষেত্রে এই ধোঁয়া হচ্ছে কর্কট রোগের কারণ বা অন্তত এ রোগের মূলে আছে তামাকের ধোঁয়া।

যখন এর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে না, তখন ধূমপান করাই বা কেন? এ তো কোন খাদ্য নয়। সিগারেট ধরার সময় পরের শোনা কথায় যেটুকু আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল, তা ছাড়া তো আর কোন আনন্দ নেই এতে।

তোমরা ছেলের দল যদি ভাল হও, তোমরা যদি তোমাদের শিক্ষকবর্গ ও অভিভাবকদের অনুগত হও, তাহলে ধূমপানের অভ্যাস বর্জন কর এবং এর দ্বারা যেটুকু অর্থ বাঁচাবে তা আমাকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সহায়তার্থ পাঠিয়ে দাও।
সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ৭৫—৭৭

২৯। ছাত্রদের প্রতি উপদেশ *

শুদ্ধ চরিত্রের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এই মহান শিক্ষায়তনের তোমরা যা-কিছু শিক্ষা পাচ্ছ তা ব্যর্থ হবে।

তোমাদের পত্রিকাটি পড়ার সময় এখানকার কর্মকর্তাদের উদ্যম এবং অল্প কয়েকবছরে এখানকার যে প্রগতি হয়েছে তার প্রশংসা না করে থাকতে পারিনি।

* কলম্বোর জহিরা কলেজে ২৩-১১-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতা

কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে গভর্ণরের সামনে পঠিত বিবরণী পড়ার সময় আমার মনে এই চিন্তা এসেই গেল যে আমরা যদি সচ্চরিত্রতার ভিত্তি স্থাপন করে তার উপর পাথরের পর পাথর বসিয়ে এক চারিত্রিক ইমারৎ গড়তাম, তাহলে গর্ব ও আনন্দ সহকারে আমরা আমাদের স্থষ্ট-সৌধের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতাম। শুধু কাদামাটি আর পাথর দিয়ে চরিত্র নির্মাণ হয় না। নিজের হাত ছাড়া আর কারও পক্ষে চরিত্র গঠন সম্ভব নয়। পুঁথিপত্রের পাতা থেকে অধ্যাপক-বর্গ বা অধ্যক্ষ মহোদয় তোমাদের চরিত্রবল দিতে অসমর্থ। চরিত্র-গঠন কর্মের প্রেরণা আসে তাঁদের জীবন থেকে এবং সত্যিকথা বলতে কি এর অনুপ্রেরণা তোমাদেরই ভিতর থেকে আসা উচিত।

খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রমুখ ধর্মধত অধ্যয়ন করার কালে আমি দেখেছি যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভেদ সত্বেও এসবের মাঝে এক মহান মৌলিক ঐক্য আছে এবং এ হচ্ছে সত্য ও নিষ্কলুষতা। তোমাদের 'নিষ্কলুষতা' কথাটির শব্দগত অর্থ নিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে জীবহত্যা না করা ও অহিংসা। আর তোমরা ছেলের দল যদি সত্য ও নিষ্কলুষতার আদর্শের প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন হও, তাহলে বুঝতে পারবে যে তোমরা দৃঢ়মূল ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছ।

তোমাদের সদাশয়তার প্রতীক এই টাকার তোড়ার জন্য তোমাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ভারতের বুভুক্ষু জনগণকে কর্মে নিয়োগ করার জন্য এ অর্থ নিয়োজিত হবে। এর ভিতর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই পড়বে। তোমরা তাই আমার হাতে এই দান অর্পণ করে সেই বুভুক্ষু জনগণকে ও তোমাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত করেছ এবং এ কাজ ঈশ্বরের কাছে প্রীতিপদ। তবে কোন্ কাজে এ অর্থ ব্যয়িত হবে তা যদি তোমরা না জান তবে এ সংযোগ-সূত্র হবে অতীব ক্ষীণ। এই অর্থ নিয়োগ করে আমার দেহে যে বস্ত্র রয়েছে ঐ জাতীয় বস্ত্র উৎপাদনের জন্য সহস্র সহস্র নরনারীকে নিযুক্ত করে তাদের কর্মের সংস্থান করা হবে। কিন্তু এসব টাকাই ব্যর্থ যাবে যদি না তোমরা এমন সব ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পার যারা এই ভাবে উৎপন্ন খাদি পরিধান করবেন।

আজ আমরা খাদি দ্বারা সবরকমের রুচি ও ফ্যাশানের চাহিদা মেটাতে পারি। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে চিরস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক হলে অতঃপর তোমরা শুধু খাদিই পরিধান করবে।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ৮৮—৯

৩০। মাহিন্দা কলেজে *

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে তোমাদের বলতে পারি যে কাদামাটি আর ইটকাঠই শিক্ষা সম্প্রসারণ নয়। খাঁটি ছেলেমেয়েরা নিয়ত প্রযত্নে সত্যকার শিক্ষা সৌধ রচনা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামে আখ্যাত স্থপতিকলার দিক থেকে নিখুঁত এমন অনেক হর্ম্যের কথা আমি জানি, যা নিস্প্রাণ সমাধিস্থল ছাড়া আর কিছু নয়। এরই ঠিক বিপরীত ব্যাপারও আমি দেখেছি। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, প্রতিনিয়ত যাদের অর্থ-কষ্টের কারণে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, অথচ প্রতিষ্ঠানগুলি এই অভাবের জন্যই প্রতিদিন আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রগতি করছে। মানবসমাজের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, যাকে তোমরা একমাত্র রাজাধিরাজ বলে অন্তরে আসন দিয়েছ, তিনি কোন মরমানব রচিত সৌধ হতে নিজ প্রাণবন্ত বাণী বিতরণ করেন নি। এক বিশাল মহীরুহের নীচে তাঁর মঞ্জু-কণ্ঠ গুঞ্জরিত হয়েছিল। অতএব সবিনয়ে আমি এই প্রস্তাব করেছি যে এই জাতীয় এক মহান প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রণালী এমন হওয়া উচিত যাতে সিংহলের যে কোন ছেলেমেয়ে অবাধভাবে এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ভারতবর্ষ এবং এই দেশে আমি লক্ষ্য করেছি যে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রত্যহ তোমরা এমন ব্যয়বহুল করে তুলছ যে দরিদ্রতম ছাত্রটির পক্ষে বাণীদেবীর পীঠ-স্থানের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে। আমরা সকলে যেন এই গুরুতর ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হই এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছ থেকে সঙ্গতভাবে যে ভর্ৎসনা পাওয়া উচিত, যেন তার হাত এড়াতে পারি। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমি এখানকার ছেলেদের আগাগোড়া শিক্ষা সিংহলী ভাষার মাধ্যমে দেবার প্রতি জোর দেব। আমি এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় যে কোন জাতির ছেলেরা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষায় শিক্ষা পেলে তারা আত্মহত্যা করছে বলতে হবে। এর ফলে তারা নিজ জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিদেশী মাধ্যমের অর্থ হচ্ছে শিশুদের উপর অন্যায় চাপ দেওয়া এবং এতে তাদের সমস্ত স্বকীয়তা কেড়ে নেওয়া হয়। এতে তাদের বুদ্ধি ব্যহত হয় এবং তারা গৃহ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণে এই

* ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর গালার মাহিন্দা কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

জাতীয় ব্যাপারকে আমি বড় দরের জাতীয় দুর্গতি বলে মনে করি। এ ছাড়া আমার আর একটি প্রস্তাব আছে। সংস্কৃত সমস্ত ভারতীয় ভাষার মাতৃস্থানীয়া এবং তোমরা তোমাদের যাবতীয় ধর্ম শিক্ষা পেয়েছ এমন একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে, যিনি ছিলেন ভারতের মুকুটমনি স্বরূপ ও সংস্কৃত ভাষা ছিল যাঁর সকল প্রেরণার উৎস। সুতরাং তোমাদের বিদ্যানিকেতনে সংস্কৃতকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করা অতীব সমীচীন কার্য হবে এবং ছাত্ররা সানন্দে এই ভাষা শিখবে। আমি চাই যে এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান যেন সিংহলের সমগ্র বৌদ্ধ সমাজকে সিংহলী ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাজী সরবরাহ করে এবং অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহের পুনরুদ্ধার করে।

আমার মনে হয় না যে তোমরা একথা ভাববে যে তোমাদের সামনে আমি এক অসাধ্য আদর্শ পেশ করেছি। মাতৃভাষার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অতীতের বিস্মৃতপ্রায় জ্ঞানভাণ্ডারের পুনরুদ্ধারার্থ অমিত প্রচেষ্টা করার নিদর্শন ইতিহাসে যথেষ্ট আছে।

শরীর চর্চার প্রতি তোমরা যথোচিত মনযোগ দিয়েছ জেনে আমি খুশী হয়েছি এবং খেলাধূলায় সাফল্য অর্জন করেছ বলে তোমাদের অভিনন্দন জানাই। তোমাদের এখানে দেশী খেলা চলে কিনা আমার জানা নেই। আমি যদি একথা শুনি যে এই পবিত্রভূমিতে ক্রিকেট বা ফুটবলের আবির্ভাবের পূর্বে তোমাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলার নামই জানত না, তাহলে আমি শুধু চরম বিস্মিত হব না, দুঃখিতও হব। তোমাদের যদি জাতীয় খেলাধূলা থাকে, তাহলে আমি বলব যে, তোমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়ার পুনরুদ্ধার ব্রতের পুরোধা হওয়া। আমি জানি ভারতে বহুবিধ সুন্দর স্বদেশী খেলা প্রচলিত আছে। এগুলি ক্রিকেট বা ফুটবলের মতই চিত্তাকর্ষক এবং উত্তেজনাকর। ফুটবলেরই মত ঝুঁকি নিয়ে এসব খেলায় যোগদান করতে হয়। অধিকন্তু দেশী খেলায় বাড়তি একটি সুবিধা আছে এবং তা হচ্ছে এই, এতে কোন খরচ নেই। এর খরচ প্রায় শূন্যের কোঠায় পড়ে।

'প্রাচীন' নামে আখ্যাত সবকিছুর বিচারবিহীন অন্ধ উপাসক আমি নই। যতই প্রাচীন হোক না কেন, অন্যায় বা দুর্নীতি মণ্ডিত সব কিছু ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করতে আমি কখনও ইতস্ততঃ করিনি। তবে তোমাদের কাছে আমি স্বীকার করছি যে প্রাচীন প্রথাগুলিকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং লোকে সব কিছুকে আধুনিক করার প্রচণ্ড তাড়নায় তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বিসর্জন দেবে এবং নিজ জীবনে তাদের অস্বীকার করবে, এ ভাবতেও আমি ব্যথা পাই।

প্রতীচির আমরা সময় সময় হঠকারিতা বশতঃ এই মনে করি যে আমাদের পূর্বজগণ যা কিছু বলে গেছেন, তা সব এক কুসংস্কারের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচ্যের অমূল্য রত্নরাজির অনুসন্ধান কার্যে আমি বহুদিন আত্মনিয়োগ করার ফলে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে আমাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার থাকলেও তার চেয়েও বেশী এমন অনেক জিনিস আছে যা কিনা কদাচ কুসংস্কার পদবাচ্য নয়। বরং এসব জিনিস ঠিকমত বুঝে তদনুযায়ী আচরণ করলে আমাদের ভিতর প্রাণ সঞ্চার হবে এবং আমরা মহীয়ান হয়ে উঠব। আমরা যেন তাই পশ্চিমের সম্মোহনকারী চটকে অন্ধ না হই।

পশ্চিমাগত সবকিছুর আমি নির্বিচারে বিরোধী—তোমাদের এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি আবার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করব। পাশ্চাত্যের এমন অনেক জিনিস আছে যা আমি নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছি। বাঞ্ছনীয় এবং অবাঞ্ছনীয় ও সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য মানুষের মধ্যে যে গুণটি বিদ্যমান, সংস্কৃত ভাষায় তার মহান ও কার্যকরী নাম হচ্ছে 'বিবেক'। আমি আশা করি যে পালি এবং সিংহলী ভাষায় তোমরা এ শব্দটিকে গ্রহণ করবে।

তোমাদের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আমি আর একটি কথা বলব। আমি আশা করেছিলাম যে এতে আমি কোন হস্তকর্ম সন্নিবিষ্ট দেখব এবং বাস্তবিক তোমরা যদি তোমাদের অধীনস্থ ছেলেদের কোন হস্তকর্ম না শেখাচ্ছ তাহলে আমার অনুরোধ হচ্ছে এই যে অনতিবিলম্বে এই দ্বীপে প্রচলিত কোন কুটীর শিল্প তোমরা শেখানো সুরু কর। এই প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব ছেলে বেরোবে তারা সকলে নিশ্চয় কেরানী বা সরকারী কর্মচারী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করবে না। জাতির শক্তিবৃদ্ধিকামী হলে সুনিপুণভাবে তাদের দেশীয় শিল্পকলা শিখতে হবে এবং সুতা কাটার চেয়ে মহত্তর এমন কোন শিল্পের কথা আমি জানি না যা সাংস্কৃতিক শিক্ষনের এত সুন্দর মাধ্যম এবং যা দীনতম ব্যক্তিটির সঙ্গে একাত্ম করার এত সুন্দর প্রতীক। প্রক্রিয়া সরল ও অতি সহজে শেখা যায়। সুতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মনে যখন এই ভাব জাগবে যে নিজের জন্য নয়, এ শিক্ষা জাতির দরিদ্রতম ব্যক্তিটির জন্য, তখন এ এক মহান যজ্ঞের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই যজ্ঞের সঙ্গে এমন একটি বৃত্তি ও হস্তকর্মের সমন্বয় সাধন করতে হবে, যার সাহায্যে ছেলেটি উত্তরকালে নিজ জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হবে বলে মনে করবে।

ধর্মশিক্ষাকে তোমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছ। ধর্মশিক্ষা দেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা জানার জন্য অনেকগুলি বালককে নিয়ে আমি পরীক্ষা করেছি। আমি দেখেছি যে বই এ বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করলেও তার কোন স্বকীয় মূল্য নেই। আমি লক্ষ্য

করেছি যে অতীতে এমন সব ধর্মগুরু ধর্মশিক্ষা দিতেন, যাঁরা ধর্মমত সঙ্গত জীবন-যাপন করতেন। আমি দেখেছি যে শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে যে বই পড়েন বা তাদের কাছে যে মৌখিক বক্তৃতা দেন, তার চেয়ে তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে ছাত্ররা অনেক বেশী শেখে। ছেলেমেয়েদের ভিতর সকলের অজ্ঞাতসারে অপরের মনে অনুপ্রবেশ করার গুণ আছে এবং এর দ্বারা তারা শিক্ষকদের মনোভাব অধ্যয়নে সমর্থ হয়, একথা আবিষ্কার করে আমি উল্লসিত হয়েছি। যে শিক্ষক মনে এক রকম কথা রেখে মুখে আর এক কথা শেখান, তাঁর জন্য দুঃখ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

তোমাদের ভাগ্য তোমাদেরই হাতে। দুটি সর্ত তোমরা যদি পালন কর, তবে স্কুলে তোমরা কি শেখ না শেখ তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। প্রথম সর্ত হচ্ছে এই যে সম্ভাব্য যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন রকম বিপদ দেখা দিক না কেন, নির্ভয়ে তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সত্যবাদী ও সাহসী বালক কদাচ একটি মক্ষিকাকেও আঘাত করার কথা মনে স্থান দেবে না। নিজ বিদ্যালয়ের প্রতিটি দুর্বল বালককে সে রক্ষা করবে এবং বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে সর্বত্রই সে প্রতিটি সাহায্যকামী বালককে সহায়তা দেবে। যে ছেলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক প্রবিত্রতা পালন না করে, সে যে কোন শিক্ষায়তন থেকে বিতাড়িত হবার উপযুক্ত। সৌজন্য গুণান্বিত যে কোন বালক সর্বদা মনকে পবিত্র রাখবে, তার দৃষ্টি সরলরেখার মত হবে এবং তার হস্তদ্বয় হবে নিষ্কলুষ। জীবনের এই মৌলিকব্রত শিক্ষার্থ কোন বিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। তোমাদের চরিত্রে এই ত্রিবিধ-গুণের সমাবেশ হলে তোমাদের ভিত্তি দৃঢ়মূল বলে মনে করা যেতে পারে।

তাই সারা জীবন যেন সত্যকার অহিংসা ও পবিত্রতা তোমাদের বর্ম হয়। ঈশ্বর যেন তোমাদের সকল মহান আদর্শ পূরণে সহায়ক হন।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১০৫—১০৯

৩১। দান ব্রতের লক্ষ্য *

লক্ষপতিদের কাছ থেকে যদিও আমি দান পাই এবং যদিও সকৃতজ্ঞচিত্তে আমি সে দান গ্রহণ করি, তবু যেসব ছেলেমেয়ের দল এখনও তাদের জীবন গড়ার কাজে মগ্ন, তাদের কাছ থেকে যতই অল্প হোক না কেন, স্বল্প পরিমাণ দান পাওয়া আরও বেশী আনন্দের কথা। দুটি কারণে আমি এতে অধিকতর প্রসন্ন হই। প্রথমতঃ

* জাফনার সেণ্ট জনস কলেজে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতা।

অপাপবিদ্ধ বালক-বালিকার কাছ থেকে যে দান আসে তা তথাকথিত ইহজাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের দানের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে তোমাদের এই উপহারের মত দান আমার মনে এমন এক গভীরতর কর্তব্য বোধ জানায়, যা হয়ত অন্য উপায়ে সম্ভব হোত না।

তোমরা জান যে এই থলির প্রত্যেকটি টাকায় ভারতের দূরতম গ্রামের বাসিন্দা ষোলজন বুভুক্ষু রমণী কাজ পাবে এবং তাদের কাজের বিনিময়ে দৈনিক এক আনার সংস্থান করে দেবে। স্মরণ রেখো যে তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি দুবেলা ভর-পেট খাওয়া বলতে যা বুঝায় তা পায় না এবং একথা আমি বলছি আমার ভারতের শত শত গ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাই তোমাদের উপহারকে সত্যকার দানের এক আদর্শ বলা যায়। যৌবনকালে যখন তোমাদের কোন দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে না, তখন থেকেই তোমরা শুধু নিজের জন্য নয়, তোমাদের চেয়েও অনেক গরীব এবং দুর্ভাগাদের জন্য ভাবছ। এতদাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও মহত্তর আর কি হতে পারে?

তোমাদের বিদ্যালয়ে যে কোন ভেদাভেদ নেই এবং কাউকে যে অস্পৃশ্য বিবেচনা করা হয় না, নিঃসন্দেহেই এ একটা বিরাট ব্যাপার। এই মহত্ত্ব নিসিক্ত টাকার তোড়া আমাকে অর্পণ করে তোমরা আসলে তোমাদের দ্বারা অনুসৃত আদর্শেরই পরিপূর্তি করেছ। কারণ এই যে সব শিশু ও নারীর প্রতিভূস্বরূপ আমাকে এই তোড়া দেওয়া হয়েছে, তারা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের চেয়েও হতভাগ্য। তোমাদের দয়া ও মহত্ত্বের প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই। আমি শুধু ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করতে পারি যে তোমাদের জীবনের সকল সৎকার্যের জন্য তিনি যেন তোমাদের আশীর্বাদ করেন। কারণ আমি জানি যে হৃদয়ের সত্যিকার শিক্ষা বিনা শুধু বৌদ্ধিক শিক্ষার কোন মূল্য নেই। তোমাদের মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও যেন বিকশিত হয়ে ওঠে।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ১৪১—৪২

৩২। যীশুর স্থান *

এক কথায় বলতে গেলে বহু বহু বৎসর যাবৎ যীশুকে আমি বিশ্বের অন্যতম ধর্মগুরুর মর্যাদা দিয়ে আসছি এবং একথা আমি উচ্চারণ করছি যথোচিত দীনতা সহকারে। এই কথাটি বলতে দৈন্যের উল্লেখ করার সহজ কারণ হচ্ছে এই যে

* জাফনার সেন্ট্রাল কলেজে ২৯-১১-২৭ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আমার মনে ঠিক এই ভাবই জাগে। অগ্রীষ্টান বা হিন্দু হিসাবে আমি যীশুকে যা মনে করি, গ্রীষ্টানরা অবশ্য যীশুর জন্য তার চেয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদা দাবী করেন। "মর্যাদা দিই" কথাটির বদলে ইচ্ছে করেই আমি "মনে করা" ব্যবহার করেছি। কারণ আমার মতে আমার নিজের বা অন্য কারও কোন মহাপুরুষকে মর্যাদা দান করার মত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা অনুচিত। বিশ্বের কোন মনীষীকে মর্যাদা দিতে হয় না, স্বতঃসিদ্ধ অধিকার বলে তাঁরা এ সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁরা যে সেবা দেন, তার বিনিময়েই তাঁরা এ স্থান পান। কিন্তু আমাদের মত দীনহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা দেওয়া হয় যাতে ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ একটা মনোভাব জাগে। কোন মহান ধর্মগুরু এবং আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে কতকটা স্বামী-স্ত্রীর মত। আমার স্ত্রীর স্থান আমার হৃদয়ের কোন স্থানটিতে, তা যদি আমাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে হয় তাহলে তাকে এক চরম বিপত্তিকর এবং শোকাবহ ব্যাপার বলতে হবে। কথাটা আমার 'স্থান' দেওয়া নয়। স্বাধিকার বলেই তিনি আমার হৃদয়ে তাঁর নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। এ হচ্ছে স্রেফ অনুভূতির ব্যাপার। সুতরাং আমি একথা বলতে পারি যে যীশু আমার হৃদয়ে বিশ্বের অন্যতম মহান ধর্মনায়করূপে অধিষ্ঠিত ও আমার জীবনকে তিনি প্রভূতরূপে প্রভাবিত করেছেন। এখনকার মত গ্রীষ্টানদের কথা বাদ দেওয়া যাক। এই কলেজের বিদ্যার্থী-দের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন হিন্দু। তাদের আমি বলব যে যীশুর বাণী শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন না করলে তাদের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যে কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিই হোক না কেন, সে যদি ভক্তিভরে অন্যধর্মের উপদেশাবলী পাঠ করে, তাহলে তার হৃদয় সংকীর্ণ হবার বদলে উদার হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি পৃথিবীর কোন বিখ্যাত ধর্মমতকে মিথ্যা বলে মনে করি না। এর প্রত্যেকটিই মানব সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করেছে এবং এখনও একাজ করে চলেছে। আগেই আমি বলেছি যে উদার শিক্ষা বলতে আমি বুঝি তার সঙ্গে অন্য ধর্মমতের শ্রদ্ধাযুক্ত চর্চার ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করা। কিন্তু এ নিয়ে আর আমি আলোচনা করতে চাই না, আর তার সময়ও নেই।

প্রথম জীবনে বাইবেল পাঠকালে আমার মনে যে কথাটি জেগেছিল, তার কথা বলব। "এই বিশ্বকে দেবলোক ও তাঁর ন্যায় রাজ্যে পরিণত কর। এই হলেই আর সব আপনি হবে"—এই অনুচ্ছেদটি পাঠমাত্র আমি চমকিত হলাম। আমি বলছি যে তোমরা যদি এই অনুচ্ছেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর ও একে প্রশংসনীয় আদর্শ বিবেচনা করে যদি এই নীতি অনুযায়ী চল, তাহলে যীশু বা অন্য কোন ধর্মগুরুর

আসন তোমাদের হৃদয়ের কোন্‌খানে, সেকথা জানারই আর প্রয়োজন ঘটবে না। দক্ষ ঝাড়ুদারের মত যদি তোমরা নিজ অন্তঃকরণকে পরিষ্কার করে শুদ্ধকরতঃ প্রস্তুত হও, তাহলে দেখবে যে এইসব মহান ধর্মগুরু আমাদের আমন্ত্রণ বিনাই স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হবেন। আমার মতে সকল দৃঢ়মূল শিক্ষার এই হচ্ছে বনিয়াদ। মনের অনুশীলনের স্থান হৃদয়ের নীচে। ভগবান যেন তোমাদের পবিত্র হতে সহায়তা দেন।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১৪৩—৪৪

৩৩। উদিভিল গার্ল'স কলেজ *

তোমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুষ্টিভরা দান। এ দান সর্বসাধারণের টাকার তোড়ায় মিশে গিয়ে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলুক এ আমি চাই না। তবে তোমাদের উপহার সর্বসাধারণের দানের সঙ্গে মিশে গেছে বলে সমস্ত অর্থেরই আমি যথাসম্ভব আদর্শ উপযোগ করব। তোমরা ছেলেদের চেয়েও বিনয়ী বলে বোধ হয় জানতেই দিতে চাও না যে তোমরা আমাকে কিছু দিয়েছ। কিন্তু ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছি বলে আজকাল মেয়েদের পক্ষে তাদের যে কোন সৎকাজের কথা আমার কাছ থেকে লুকানো কঠিন।

আবার এমন অনেক মেয়ে আছে, যারা আমার কাছে তাদের দুষ্কৃতির কথাও প্রকাশ করে। আমি আশা করি আমার সামনে যেসব মেয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কোন কুকার্য করে না। জেরা করার সময় নেই বলে তোমাদের প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করব না। তবে আমাদের ভিতর যদি এমন কোন মেয়ে থাকে যে অপকার্য করে, তাহলে আমি বলব যে সেক্ষেত্রে তার শিক্ষাই ব্যর্থ। তোমাদের অভিভাবকরা তোমাদের পুতুল গড়ে তুলতে স্কুলে পাঠান না। তোমাদের বরং "সিস্টারস অফ মার্সি" হতে হবে। একথা যেন ভুলেও ভেব না যে যারা কোন বিশেষ ধরণের পোশাক পরে তাদেরই শুধু "সিস্টারস অফ মার্সি" বলা হয়। যে মুহূর্তে সে নিজের সম্বন্ধে কম ভেবে, তার চেয়েও গরীব ও দুর্ভাগাদের জন্য বেশী করে ভাবে, সেই মুহূর্তেই সে "সিস্টারস অফ মার্সি" হয়ে যায়। আর আমাকে যে টাকার তোড়া দেওয়া হয়েছে, তাতে যথাসাধ্য দান করে তোমরা "সিস্টারস অফ মার্সি" হয়ে গেছ; কারণ এ টাকা এমন লোকদের জন্য দেওয়া হয়েছে, যারা দুর্ভাগ্যবশতঃ

* ২৯-১১-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতা।

তোমাদের চেয়েও গরীব।

সামান্য দু'চার টাকা দিয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু ছোট্ট একটুখানি কাজ করা কঠিন। যাদের জন্য তোমরা আমাকে টাকা দিলে, তাদের প্রতি তোমাদের যদি সত্যকার সহানুভূতি থেকে থাকে, তাহলে তোমাদের আর এক পা এগিয়ে তাদের দ্বারা উৎপন্ন খাদি পরিধান করতে হবে। তোমাদের সামনে খাদি আনলে তোমরা যদি বল, "খাদি একটু মোটা, আমরা এ পরতে পারব না"—তাহলে বুঝব যে তোমাদের ভিতর স্বার্থত্যাগ বৃত্তি নেই।

খাদি এমন সুন্দর জিনিস যে এতে উচ্চনীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ নেই। আর তোমাদের হৃদয়ের টান যদি ঐদিকে থাকে ও তোমরা যদি এই অহমিকা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে না ভাব যে তোমরা অন্য মেয়েদের চেয়ে উঁচুদরেরর, তাহলে খুব ভাল হয়।

ঈশ্বরের করুণা ধারা তোমাদের শিরোপরি বর্ষিত হোক।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১৪৪—৪৬

৩৪। রামনাথন্ গার্ল'স কলেজে

আজকের সকালের এই অনুষ্ঠান যে নিরুপম সুরুচি এবং অনাড়ম্বরতা মণ্ডিত হয়েছে, তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পার। তোমাদের অকৃপণ হস্তের দানের প্রতীক এই ১১১১৲ টাকার জন্য তোমাদের প্রশংসা জানাই। এই টাকাটাও তোমরা আবার খাদির থলিতে করে দিয়েছ, যা অন্যত্র বিশেষ কোথাও দেখা যায়নি। সর্বোপরি স্যার পি. রামনাথন্ স্বয়ং এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে পারায় যে তারবার্তাটি পাঠিয়েছেন, লেডি রামনাথন্ তা আমার হাতে দিয়েছেন।

স্যার রামনাথনের মহানুভবতা এবং মননশীলতার প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটি দেখতে না পেলে আমার মনে চিরকালেই খেদ থেকে যেত। তোমাদের অভিনন্দন পত্রের একটি নকল এবং এই প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী ও তোমাদের পত্রিকার দুটি সংখ্যা আমাকে অগ্রিম দিয়ে লেডি রামনাথন্ অতীব সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

আজকের দিনটিকে তোমরা নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানরূপে পালন করবে এবং খাদি কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ মানসে এদিন চেষ্টা করবে—তোমাদের এই সংকল্প আমার হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে অনুরণণ সৃষ্টি করেছে। আমি জানি

তোমরা লঘুভাবে এ শপথ গ্রহণ করনি, ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমরা এ সংকল্প পূর্ণ করবে। যে দৈন্যপীড়িত জনগণের প্রতিভূরূপে আমি সফর করে বেড়াচ্ছি, তারা যদি তাদের ভগ্নীদের এই সংকল্পের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত, তবে আমি জানি যে এতে তাদের বুক ফুলে উঠত। তোমরা কিন্তু আমার কাছে একথা শুনে দুঃখিত হবে যে, যাদের জন্য তোমরা এবং তোমাদের মত আরও অনেকে সিংহলে আমাকে এই টাকার তোড়া দিল, তারা, আমি বোঝাতে চেষ্টা করলেও, এর বিন্দুবিসর্গ বুঝবে না। তাদের শোচনীয় জীবন সম্বন্ধে আমি যত বর্ণনাই করি না কেন, তোমরা হয়ত কিছুতেই সে অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না।

এ থেকে স্বতঃই এই প্রশ্নটি জাগে—এই সব এবং এই জাতীয় লোকদের জন্য তোমাদের কি করা উচিত? আর একটু অনাড়ম্বর হওয়া বা জীবনে আর একটু কৃচ্ছ্রতা আনয়ন করা ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া সহজ। কিন্তু তাতে প্রশ্নটির মূল স্পর্শ করা হবে না। এ সম্বন্ধে ভেবে ভেবে আমি চরকার কথায় উপনীত হয়েছি। তোমাদের আজ যে কথা বলছি সেই কথাই নিজের মনে মনে আমি বললাম—এই বুভুক্ষু জনসাধারণের সঙ্গে কোন জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে তোমাদের, তাদের এবং সারা জগতের পক্ষে একটা আশাস্থল দেখা যাবে।

তোমাদের এ প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং থাকা উচিত। এখানে একটি মনোরম দেব-দেউলও আছে। তোমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে দেখছি যে তোমাদের দিনের কাজ সুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। এ সবই ভাল এবং আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সে প্রার্থনা যদি কোন নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তব কর্মে প্রকট না হয়, তবে এর শুধু এক প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবার আশঙ্কা আছে। প্রার্থনার এই ধারা অনুসরণ করার জন্যই আমি বলি যে চরকা ধর, আধঘণ্টা সুতা কাট এবং যেসব জনগণের কথা আমি তোমাদের বলেছি তাদের কথা ভাব। এরপর মনে ঈশ্বর স্মরণ করে বল, "আমি এই জনগণের জন্য সুতা কাটছি।" হৃদয় মন দিয়ে তোমরা যদি একাজ কর, তোমাদের মনে যদি এই ভাবনা থাকে যে, সেই খাঁটি উপাসনা কার্যের তোমরা আদর্শ, দীন এবং সম্পন্ন পাত্র, তোমাদের পরিচ্ছদ পরিধানের কারণ যদি সাজগোজ করা না হয়ে দেহাচ্ছাদন হয়, তাহলে খাদি পরতে এবং নিজেদের সঙ্গে জনগণের সেই যোগসূত্র স্থাপন করতে তোমাদের মনে কোনরকম ইতঃস্তত ভাব আসার কথা নয়।

এই প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের কাছে আমার বক্তব্য কিন্তু এখানেই শেষ হল না। স্যার রামনাথন্ তোমাদের প্রতি যে যত্ন ও দৃষ্টি দিয়েছেন এবং লেডি রামনাথন্

ও তাঁর পরিচালনাধীনে যেসব কর্মচারী তোমাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি নজর রাখছেন, তোমরা যদি তার যোগ্য হতে চাও, তাহলে তোমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে। তোমাদের পত্রিকায় দেখলাম ঈষৎ গর্ব সহকারে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রীর কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। অমুকে অমুককে বিবাহ করেছে—এই মর্মে চার-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তিও দেখলাম। পঁচিশ বা এমন কি বাইশ বছরের মেয়েদের বিবাহ করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। কিন্তু এইসব বিজ্ঞপ্তিতে আমার এমন একটি নামও চোখে পড়ল না যে জনসেবার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে। সুতরাং বাঙ্গালোরের মহারাজ কলেজের মেয়েদের আমি যা বলেছিলাম, তার পুনরুক্তি করে বলব যে এইসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্রব ছাড়লেই তোমরা যদি স্রেফ পুতুলটি হয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হও, তাহলে বলতে হবে যে শিক্ষাবিদ্‌রা যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন এবং দানবীরেরা দানের যে ধারা বইয়ে দিচ্ছেন, তার বিনিময়ে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদান মিলছে না।

স্কুল-কলেজ থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র অধিকাংশ মেয়ে প্রকাশ্য জনসেবামূলক জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীর দল, তোমাদের এমন করলে চলবে না। তোমাদের সামনে কুমারী এমারীর উদাহরণ রয়েছে এবং এছাড়া আমার মনে হয় এখনকার কর্মচারীদের মধ্যে আরও অনেক অবিবাহিতা মহিলাও রয়েছেন।

প্রত্যেক মেয়ে, প্রতিটি ভারতীয় মেয়েকে যে বিয়ে করতেই হবে এমন কথা নয়। এমন অনেক মেয়ে আমি দেখাতে পারি যারা একজন মাত্র লোকের সেবা না করে নিজেদের সকলের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছে। হিন্দু মেয়েদের সীতা বা পার্বতীর নবীন এমন কি অধিকতর গৌরবমণ্ডিত সংস্করণ সৃষ্টি করার দিন এসে গেছে।

তোমরা নিজেদের শৈব বল। পার্বতী যে কি করেছিলেন, তা তোমরা জান? স্বামীলাভের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নি বা নিজেকে তিনি বিক্রয়োপযোগী পণ্যে পরিণত হতে দেন নি। আজ কিন্তু তিনি সপ্ত-সতীর অন্যতমরূপে পরিগণিত হয়ে হিন্দু-কুল-চূড়ামণি রূপে শোভিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জোরে নয়, এ গৌরব তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অশ্রুতপূর্ব তপস্যার বলে।

আমার মনে হয় এখানে সেই ঘৃণ্য পণপ্রথা বিদ্যমান এবং এর জন্য তরুণীদের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী পাওয়া অতীব দুষ্কর হয়ে পড়ে। তোমাদের মধ্যে অনেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে এই জাতীয় প্রলোভনের প্রতিরোধ করা। এই কু-প্রথার প্রতিরোধ করতে গেলে তোমাদের মধ্যে অনেককে আজীবন এবং

অনেককে বেশ কয়েক বৎসর কুমারী থেকে যেতে হবে। তারপর যখন তোমাদের বিবাহকাল সমাগত হবে এবং তোমরা যখন মনে করবে যে এবার একজন জীবনসঙ্গী প্রয়োজন, তখন তোমরা এমন কাউকে খুঁজো না, যার ধন, যশ বা দেহসৌষ্ঠব আছে। পার্বতীর মতই তোমরা এমন লোকের সন্ধান করবে, যার মধ্যে সৎচরিত্র গঠনের উপযোগী গুণাবলী বিদ্যমান। নারদ যে পার্বতীর কাছে মহাদেবের কিরকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা তোমরা জান—"গায়ে ছাইমাথা ভিখারী, রূপের কোন বালাই নেই, তায় আবার ব্রহ্মচারী।" পার্বতী এর জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, তিনিই আমার পতি।" তোমাদের ভিতর কেউ কেউ তপস্যা করতে মনস্থ না করলে একাধিক শিবের সৃষ্টি হবে না। অবশ্য পার্বতীর মত তোমাদের সহস্র বৎসর তপস্যা করতে হবে না। আমাদের মত ক্ষীণজীবি মানব অতটা পারব না, তবে তোমাদের জীবদ্দশায় তোমরা এই তপস্যা চালিয়ে যেতে পার।

পূর্বোক্ত সর্তগুলি স্বীকার করলে তোমরা পুতুলের দেশে নিরুদ্দেশ হতে অস্বীকার করবে। তোমরা তখন পার্বতী, দময়ন্তী, সীতা এবং সাবিত্রীর মত সতী হতে চাইবে। আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তির অভিমতে তখনই তোমাদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায় আসার অধিকার জন্মাবে।

ভগবান যেন তোমাদের এই আশায় উদ্দীপ্ত করে তোলেন এবং তোমাদের মধ্যে প্রেরণা জাগলে তিনি যেন সে আশার পরিপূর্তির জন্য তোমাদের সহায়তা করেন।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১৪৬—৪৯

৩৫। ছত্রদের মহান সত্যাগ্রহ

এই পত্রিকায় সত্যাগ্রহের বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে একাধিকবার আমি বলেছি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মত সামাজিক ক্ষেত্রেও এ সমভাবে প্রযোজ্য। সরকার, সমাজ বা নিজ পরিবারের পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী—ক্ষেত্রানুসারে সকলের উপরই এর প্রয়োগ চলতে পারে। কারণ এই আধ্যাত্মিক আয়ুধটির গুণই হচ্ছে এই যে হিংসা স্পর্শরহিত হয়ে শুধুমাত্র প্রেমভাব দ্বারা পরিচালিত হলে একেবারে একে যত্রতত্র এবং যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়। খেদা জেলার ধার্মাজের সাহসী ও তেজস্বী ছাত্রের দল কয়েকদিন আগে এর একটি জলন্ত উদাহরণ পেশ করেছে। বিভিন্ন বিবরণী থেকে এ ঘটনা সম্বন্ধে আমি নিম্নরূপ তথ্য পেয়েছি।

ধার্মাজের জনৈক ভদ্রলোক মাতার মৃত্যুর দ্বাদশদিনে স্বজাতীয়দের একটি ভোজ

দেন। এই প্রথার তীব্র বিরোধী সেখানকার যুব সম্প্রদায় ও স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী পূর্বাহ্নে এ নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ করেন। তাঁরা মনে স্থির করলেন যে এই সময়ে কিছু করা উচিত। এতদানুযায়ী তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নলিখিত তিনটি সংকল্পের ভিতর কয়েকটি বা সবগুলি গ্রহণ করলেন :—

১। তাঁদের গুরুজনদের সঙ্গে তাঁরা সেই ভোজ খেতে যাবেন না বা কোন-রকমে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না।

২। এই প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থ সেদিন তাঁরা উপবাস করবেন।

৩। এই পন্থানুসরণ করার জন্য গুরুজনরা যে কোন রূঢ় আচরণ করুন, তা তাঁরা সানন্দে বরণ করবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকটি নাবালকসহ বহু ছাত্র ভোজের দিন উপবাস করল এবং এই অবাধ্যতার জন্য তাদের তথাকথিত গুরুজনদের রোষবহ্নির দহন বরণ করে নিল। এর ফলে ছাত্রদের গুরুতর আর্থিক ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল। 'গুরুজনরা' নিজ নিজ সন্তানের খরচ বন্ধ করে দেবার হুমকি দিলেন এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সাহায্য দিচ্ছিলেন, তাও বন্ধ করে দেবার শাসানী দিলেন। ছাত্ররা কিন্তু অটল রইল। দুইশত পঁচাশিজন ছাত্র এইভাবে জাতের ভোজে অংশ গ্রহণ করেনি এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ সেদিন উপবাসী রয়ে গেল।

এইসব ছেলেদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে প্রত্যেক জায়গায় ছাত্ররা এইভাবে প্রমুখ অংশ গ্রহণ করবে। তাদের কাছে যেমন স্বরাজের চাবিকাঠি রয়েছে, তেমনি তাদের পকেটে রয়েছে সমাজ সংস্কার ও ধর্মরক্ষার চাবি। নিজেদের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য তারা বোধহয় এর খবর রাখে না। তবে আমি আশা করি যে ধার্মাজের ছাত্রদের উদাহরণ নিজশক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করবে। আমার মতে পরলোকগতা মহিলাটির সত্যকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিল ঐ উপবাসী ছেলেগুলি। আর যাঁরা ভোজ খাওয়ালেন, তাঁরা অর্থের অপচয় করার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদের সামনে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ধনী ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত অর্থকে মানব হিতৈষণায় নিয়োগ করা। তাঁদের বোঝা উচিত যে দরিদ্রদের পক্ষে বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বজাতীয়দের ভোজন করানো অসম্ভব। এই কুপ্রথা বহু দরিদ্রের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। ভোজের জন্য ধার্মাজে যে অর্থ ব্যয় হল, তা যদি দরিদ্র ছাত্র বা গরীব বিধবাদের সাহায্যের জন্য অথবা খাদি, গোরক্ষা কিংবা হরিজনদের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হত, তাহলে এর সদুপযোগ হত এবং মৃতাত্মাও শান্তি পেতেন। কিন্তু

ব্যাপার হয়েছে এই যে ভোজের কথা এখনই লোকে বিস্মৃত হয়েছে, এতে কারও উপকার হয়নি। উপরন্তু এ ধার্মাজের ছাত্র সম্প্রদায় ও বিবেকবান অধিবাসীদের দুঃখের কারণ হয়েছে।

কেউ যেন এমন কথা না ভাবেন যে ভোজ বন্ধ করা যায়নি বলে ঐ সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্ররা স্বয়ং জানত যে তাদের সত্যাগ্রহ অবিলম্বে নয়নগোচর কোন ফল প্রসব করবে না। কিন্তু নির্ভয়ে আমরা একথা ধরে নিতে পারি যে তাদের সতর্কতা বৃত্তি যদি ঘুমিয়ে না পড়ে, তাহলে ওখানে কোন শেঠিয়া ভবিষ্যতে আর শ্রাদ্ধ ভোজের আয়োজন করতে সাহসী হবে না। দীর্ঘকালের কোন সামাজিক কুপ্রথাকে একবারেই বিলুপ্ত করা যায় না, সর্বদাই এর জন্য স্থৈর্য ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

আমাদের সমাজের "গুরুজনরা" কালের ইঙ্গিত কবে বুঝতে শিখবেন? কোন প্রথাকে সমাজ ও দেশের উন্নতির বাহন মনে করার বদলে আর কতদিন তারা এই প্রথার দাস হয়ে থাকবেন? নিজ সন্তান-সন্ততিদের তাঁরা যে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করছেন, তার বাস্তব প্রয়োগ থেকে আর কতদিন তাঁরা ছেলেদের নিবৃত্ত রাখতে পারবেন? তাঁদের ন্যায়-অন্যায় বিচার বোধকে কবে তাঁরা বর্তমানের সম্মোহন পাশ মুক্ত করে নিজেদের মধ্যে মহাজন কথাটির সঠিক অর্থের বিকাশ সাধন করবেন?

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১-৩-১৯২৮

৩৬। জাতীয় বনাম বিদেশী শিক্ষা

আমি আশা করি যে তোমাদের সাম্প্রতিক অবকাশকালে গুজরাট বিদ্যাপীঠ যে নূতন মূলনীতি গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে তোমরা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেছ। বহুবার আমি একথা বলেছি যে সংখ্যাধিক্য আমাদের শক্তির উৎস নয়। অবশ্য সংখ্যাধিক্যকে আমরা অবজ্ঞা করি না; কিন্তু সংখ্যাল্পতা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। মৌলিক বিষয়াবলী সঠিকভাবে উপলব্ধি করে গ্রহণ করা এবং বিনীতভাবে তাকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের আসল শক্তি নিহিত আছে। বিদ্যাপীঠের প্রতি অনুগত ছাত্ররা যদি এর আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করে তবে অবশ্যই আমরা তাদের মাধ্যমে আমাদের স্বরাজ অর্জন করা রূপী বাঞ্ছিত আদর্শে উপনীত হব। ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং ভয়লেশ-শূন্য হয়ে আদর্শাভিমুখে অভিযান—এরই প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশী। আমি চাই যে তোমরা তোমাদের শিক্ষকদের এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত কর ও প্রতিশ্রুতি দাও

যে বিদ্যাপীঠের আদর্শের পরিপূর্তির জন্য যে কোনরকম দৈব-দুর্বিপাক আসুক না কেন, তোমাদের আনুগত্য অবিচল থাকবে। সত্য এবং অহিংসা যেন আমাদের কেন্দ্র বিন্দু হয় এবং এতে যাদের আস্থা নেই তাদের স্থানও এখানে নেই।

সরকারী ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি সুস্পষ্ট পার্থক্যের কথা জেনে নেওয়া যাক। আমাদের একটি ছাত্র বারদোলির ব্যাপারে জেলে গেছে এবং আরও অনেকে যাবে। এরা বিদ্যাপীঠের গৌরব। আমাদের ছাত্রদের মনে এই জাতীয় ইচ্ছা উদিত হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কি এর কথা কল্পনাতেও ঠাঁই দিতে পারে? তোমাদের মত বরদোলিতে গিয়ে বল্লভভাইকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। তারা শুধু গোপনে সহানুভূতি পোষণ করতে পারে। জাতীয় জীবনের সংকট মুহূর্তে যদি আমাদের আবদ্ধ ও বন্দী করে রাখা হয়, তাহলে সাহিত্য কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল্য কি? জ্ঞান বা সাহিত্য শিক্ষা দ্বারা পুরুষত্ব-হীন করার ক্ষতিপূরণ করা যায় না।

ওদের এবং আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমরা ওদের মত করে ইংরাজী শেখাই না। ইংরাজীর কাজ চলা গোছের জ্ঞান আমরা দিতে পারি। কিন্তু জাতিগত ভাবে আত্মহত্যা না করে নিজের মাতৃভাষার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করতঃ আমরা ইংরাজীকে আমাদের চিন্তার বাহন করতে পারি না। আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা এই ক্ষতিকর প্রথা সংশোধন করতে চাই। শিক্ষণীয় প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের গুজরাটীর মাধ্যমে শিখতে হবে। একে সমৃদ্ধ করে সর্বপ্রকারের চিন্তা ও ভাবধারা প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলব। কুত্রাপি আমরা এদেশের মত ব্যাপার দেখি না। এই কয় বৎসর ইংরাজীর মাধ্যমে সবকিছু শিক্ষা করার জন্য আমাদের উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে। আমরা কর্তব্যচ্যুত হয়েছি।

এরপর অর্থশাস্ত্র শিক্ষা দেবার প্রণালীর কথা ধর। সরকারী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পদ্ধতি আতঙ্কজনক। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অর্থশাস্ত্র রয়েছে। জার্মান পাঠ্যপুস্তকগুলি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবাধ বাণিজ্যাধিকার ইংলণ্ডের বাঁচার উপায় হতে পারে। আমাদের কাছে এ কিন্তু মৃত্যুতুল্য। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র রচনা করার কাজ এখনও বাকি আছে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। কোন ফরাসী দেশীয় ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখলে নিজের মত করে তা লিখবে। ইংরেজরা আবার সম্পূর্ণ পৃথকভাবে লিখবে। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লেখক অনুসারে ভিন্ন হবে। কোন ভারতীয় দেশপ্রেমিক কর্তৃক মূল সূত্রাবলম্বনে লিখিত

ইতিহাস কোন আমলাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ইংরেজ লিখিত ইতিহাস হতে পৃথক হবে, যদিচ দুজনেই হয়ত ইতিহাস রচনা ব্যাপারে সততা অবলম্বন করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ব্যাপারে ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে আমরা প্রচণ্ড ভুল করেছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তোমাদের ও তোমাদের শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণা করার বিশাল ক্ষেত্র আছে।

এমন কি আমাদের গণিতের মত বিষয়ের শিক্ষা প্রণালীও পৃথক হবে। আমাদের গণিত শিক্ষকরা ভারতীয় পরিবেশ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি গণিত শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভূগোলও শিখিয়ে ফেলবেন।

তাছাড়া আমরা শরীর-চর্চা এবং হস্তশিল্প শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দিচ্ছি। একথা মনেও ঠাঁই দিও না যে এতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল হয়ে যাবে। আমাদের মস্তিষ্ককে কতগুলি ঘটনার বিবরণ বোঝাই করার গুদাম বানালে মোটেই বোধ-শক্তির উন্মেষ হয় না। সময় সময় বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য অধ্যয়ন করার চেয়ে বুদ্ধি সহকারে শিল্পশিক্ষা করলে মস্তিষ্কের বিকাশের পক্ষে তা অধিকতর সহায়ক হয়।
ইয়ং ইণ্ডিয়া ২১-৬-১৯২৮

৩৭। যুবকদের পক্ষে লজ্জাজনক

জনৈক পত্রলেখকের কাছ থেকে একটি সংবাদপত্রের কাটিং পেয়েছি। এতে সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদের একটি সংবাদে জানানো হয়েছে যে সম্প্রতি পাত্রপক্ষের দাবী সেখানে অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজকীয় টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগের একজন কর্মচারী বাক্‌দানের দিন ২০,০০০৲ টাকা নগদ পণ নিয়েছেন এবং বিবাহের দিন ও তৎপরবর্তী বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য মোটা রকম প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। বিবাহের সর্ত স্বরূপ যে যুবক পণ দাবী করে, সে নিজ শিক্ষা ও মাতৃভূমির অমর্যাদা করে এবং নারীজাতিকে অসম্মান করে। দেশে বহুবিধ যুব আন্দোলন চলছে। এইসব আন্দোলন এই জাতীয় সমস্যার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হলে কত ভাল হত। এই ধরণের সমিতিগুলি সমাজের ভিতর থেকে কার্যকরী সংস্কার সাধনের দূর্গ হওয়ার পরিবর্তে প্রায়ই পারস্পারিক পৃষ্ঠ কণ্ডূয়ন বৃত্তির কেন্দ্র হয়ে পড়ে। এইসব সমিতি যখন গণ আন্দোলনের সহায়ক হয়, তখন তাদের সে কাজ অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা যেন খেয়াল রাখি যে জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হওয়াই দেশের যুবকদের কাছে পুরস্কার স্বরূপ। তাদের এইসব কাজ যদি আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে যুবকদের মধ্যে বৃথা

আত্মসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি করে এ তাদের নীতিভ্রষ্ট করবে। এই হীন পণপ্রথার বিরুদ্ধে সবল জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং এইরূপ অসদুপায়ে প্রাপ্ত স্বর্ণে যেসব যুবক তাদের হস্ত কলুষিত করে, তাদের সামাজিক-বয়কট করা উচিত। মেয়ের জন্য সুযোগ্য এবং সাহসী পাত্র জোগাড় করার সময় মেয়ের অভিভাবকদেরও ইংরাজী ডিগ্রীর মোহমুক্ত হতে হবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে নিজ জাতি বা প্রদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৬-৬-১৯২৮

৩৮। স্বাবলম্বনই আত্মমর্যাদা

এই পত্রিকার মারফত অনেকবার এইরকম প্রস্তাব করা হয়েছে যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে, বা অন্তত শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুক প্রতিটি বালক-বালিকার কাছে শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে হলে আমাদের স্কুল-কলেজগুলিকে পূর্ণত না হলেও অন্তত প্রায় তারই সমান স্বাবলম্বী করা উচিত। চাঁদা তুলে, সরকারী সাহায্য নিয়ে বা ছাত্রদের বেতনে স্বাবলম্বী হলে চলবে না, ছাত্রদের স্বীয় উৎপাদনমূলক কর্মের দ্বারা স্বাবলম্বী হতে হবে। এ শুধু সম্ভব হবে শিল্পশিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে। যেসব কারণে কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা দেবার প্রয়োজন দৈনিক অধিকতর মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে, তা ছাড়াও শিক্ষাকে প্রত্যক্ষরূপে স্বাবলম্বী করার জন্য এদেশে শিল্পশিক্ষা দেবার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের ছাত্ররা যখন শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে শিখবে এবং যখন শ্রমমূলক বৃত্তি না জানা অগৌরবজনক বলে বিবেচিত হবার প্রথা প্রবর্তিত হবে, তখনই এ সম্ভবপর হবে। আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধণাঢ্য দেশ এবং সেইজন্য সেখানে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে কম। কিন্তু এই আমেরিকাতেও শিক্ষার পূর্ণ বা আংশিক ব্যয় ছাত্রদের শ্রমে নির্বাহ করা অতীব স্বাভাবিক ঘটনা। নিউ ইয়র্ক সিটির ৫০০নং রিভার সাইড ড্রাইভে অবস্থিত আমেরিকার হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের সরকারী মুখপত্র 'হিন্দুস্থানী স্টুডেণ্ট' বলছেন :

"আমেরিকার শতকরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশে বা স্কুল-কলেজ খোলা থাকাকালীন কিছুটা সময়ে অর্থোপার্জন করেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে 'স্বাবলম্বী ছাত্রদের সম্মান করা হয়।' শিক্ষায়তন খোলা থাকার সময় নিজ অধ্যয়ন নিষ্ঠার কোনরকম গুরুতর ক্ষতি না করেও যে কোন ছাত্র

সপ্তাহে ১২ থেকে ২৫ ঘণ্টা বাইরের কাজ করতে পারে। কলেজের ১২ থেকে ১৬টি পিরিয়ডের জন্য সপ্তাহে মোট ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। ছাত্রদের নিম্নলিখিত বিষয়ে কিছুটা ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা চাই : সূত্রধরের কাজ, জরিপ করা, নক্সা তৈরী, রাজমিস্ত্রীর কাজ, মোটর চালানো, ফটো তোলা, কলকব্জা মেরামত, রন্ধন বিদ্যা, কৃষিকর্ম, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আহার্য পরিবেশকের কাজ করা ইত্যাদি সাধারণ কাজ তো কলেজ খোলা থাকার সময়ে অনেকেই করে। এতে ছাত্রদের নিজ ভোজন ব্যয় নির্বাহে সুবিধা হয়। কোন আংশিক স্বাবলম্বী ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশে কাজ করে ১৫০ থেকে ২০০ ডলার বাঁচাতে সমর্থ হয়। কানসাস, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, পিটস্‌বার্গ ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়, এন্টিওয়ক কলেজ ইত্যাদি ইনডাস্‌ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 'কো-অপারেটিভ' শিক্ষণক্রমের ব্যবস্থা করেছেন এবং এর ফলে ছাত্ররা কোন কারখানায় কাজ করে এক বছরের শিক্ষণ বেতন উপার্জন করতে পারে। এতে তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও বাড়ে।

"মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় সিভিল ও ইলেট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর এই জাতীয় কোঅপারেটিভ শিক্ষণক্রম প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করছেন। কো-অপারেটিভ শিক্ষণক্রম গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিংএর স্নাতক হতে একবছর বেশী লাগে।"

আমেরিকা যদি সে দেশের স্কুল-কলেজগুলিকে এমন ধাঁচে গড়ে তোলে যাতে ছাত্ররা শিক্ষণ ব্যয় উপার্জন করতে পারে, তাহলে আমাদের স্কুল-কলেজে এটা আরও কত প্রয়োজনীয়। দরিদ্র ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়তে দেবার ব্যবস্থা করে তাদের ভিখারী করে দেবার বদলে তাদের কাজ জোগাড় করে দেওয়া কি শ্রেয় নয়? জীবিকা বা শিক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের হাতপায়ে খাটা অভদ্রতা—এই ভুল ধারণা ভারতীয় যুবকদের মনে ঢুকিয়ে দেবার জন্য তাদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হচ্ছে। নৈতিক এবং ভৌতিক দ্বিবিধ অপকারই এতে হচ্ছে, বোধ হয় নৈতিক হানির পরিমাণই বেশী। যে কোন বিবেকবান ছেলের কাছে বিনা বেতনে পড়া সারা জীবন বোঝার মত মনে হয় এবং হওয়া উচিত। কেউ চায় না যে উত্তরকালে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হোক যে শিক্ষা পাবার জন্য তাকে দয়ার দানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে এমন কি কেউ আছে যে নিজ দেহ, মন ও আত্মার শিক্ষার জন্য সূত্রধর বা ঐ জাতীয় কোন কাজ করার সৌভাগ্যের কথা ভবিষ্যৎ জীবনে সগৌরবে স্মরণ করবে না?

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২-৮-১৯২৮

৩৯। শিক্ষায় অহিংসা *

আমাকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিম্নরূপ :—

"যখন কেউ অহিংসার কথা বলা সুরু করে অমনি একগাদা ছোটখাট প্রশ্ন এসে ভিড় করে। যথা, কুকুর, বাঘ, নেকড়ে, সাপ এবং উকুন ইত্যাদি মারা উচিত কিনা এবং বেগুন বা আলু খাওয়া সঙ্গত কিনা। এছাড়া সৈন্যদল রাখা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্বন্ধেও বিতর্ক ওঠে। শিক্ষার অঙ্গরূপে অহিংসনীতিকে কিভাবে কার্যান্বিত করতে হবে, একথা জানার জন্য কেউ উদগ্রীব বলে মনে হয় না। এ প্রশ্নটির উপর আপনি আলোকপাত করবেন কি ?"

এ সমস্যা নবীন নয়। এই পত্রিকায় প্রায়ই কোন না কোন ভাবে এ সমস্যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে আমি জানি যে পাঠকগোষ্ঠীর কাছে এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করার ব্যাপারে এখনও আমি সফল হইনি। আমার ভয় হয় যে একাজ আমার ক্ষমতা বহির্ভূত। তবে এর সমাধানের জন্য একটু কিছু করতে পারলেই আমি কৃতার্থ বোধ করব।

এ প্রশ্নের সূচনাতে দেখা যাচ্ছে যে সময় সময় সংকীর্ণ দৃষ্টি সঞ্জাত প্রশ্ন করা হয়। মানুষের নিম্নস্তরের জীবজন্তু হত্যা করা উচিত কিনা—এই ধাঁধা নিয়ে অহেতুক নাস্তানাবুদ হয়ে সময় সময় আমরা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্যের কথা ভুলে যাই। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যহ ঘৃণিত জীবজন্তু মারার সমস্যার সম্মুখীন হ'ন না। বিষধর সরীসৃপদের সঙ্গে অহিংস আচরণ করার উপযুক্ত সাহস ও প্রেমভাব আমাদের মধ্যে অনেকেরই নেই। নিজ হৃদয়ে অবস্থিত অসদাভিপ্রায় ও ক্রোধরূপী বিষধর সর্পকে হত্যা না করেই আমরা নিম্নস্তরের প্রাণীহত্যা করার ঔচিত্য নিয়ে বৃথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই এবং এইভাবে আমরা এক দুষ্টচক্রে আবর্তিত হই। প্রাথমিক কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে আমরা হৃদয়ে এই অভিলেপন প্রলেপ করি যে আমরা নিম্নস্তরের প্রাণীহত্যা থেকে বিরত আছি। অহিংস আচরণে অভিলাষী ব্যক্তিকে আপাততঃ সাপ ইত্যাদির কথা বিস্মৃত হতে হবে। এসব না মেরে যদি তাঁর না চলে, তবে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বিশ্ব সৌভ্রাত্রের

---

* আহমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা গান্ধীজীকে এই প্রশ্নগুলি করেছিল। সেখানে তিনি এক সময়ে সপ্তাহে একবার আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করতেন।

প্রথম সোপানরূপে ধৈর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের কু-ইচ্ছা ও রোষবহ্নি জয় করার চেষ্টা করলেই তাঁর চলবে।

ইচ্ছা হলে বেগুন বা আলু খাওয়া অবশ্যই বন্ধ করতে পার। তা বলে ভগবানের দোহাই, ধর্মাভিমানী হয়ে পোড়ো না বা মনে ভেব না যে এতেই অহিংস আচরণ করা হয়ে গেল। একথা ভাবতেই লোকের লজ্জা হবে। অহিংসা শুধু খাদ্যাখাদ্য বিচারের জিনিস নয়, এ এর অনেক উর্ধ্বে। মানুষ কি খায় দায় তার বিশেষ মূল্য নেই ; গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার আত্মত্যাগ ও সংযম। আহার্য বস্তু নির্বাচনকালে অবশ্যই যথাসাধ্য সংযম পালন করবে। এ সংযম প্রশংসনীয় এবং এমন কি প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ শুধু অহিংসার সামান্য একটু কিনার ছুঁয়ে যায়। ভোজ্য নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেও কেউ অহিংসার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে। তবে তার হৃদয়ে প্রেমের বন্যা বওয়া চাই এবং অপরের দুঃখে তার হৃদয় বিগলিত হওয়া চাই। তিনি যেন অন্তর থেকে যাবতীয় বাসনা বিদূরিত করেন। পক্ষান্তরে খাদ্যাখাদ্য ব্যাপারে অতিমাত্রায় সৎ কোন ব্যক্তি যদি স্বার্থ ও রিপুর দাস হয় এবং তার হৃদয় যদি প্রস্তর-কঠিন হয়, তবে অবশ্যই সে অহিংসার রাজ্যে অজানা আগন্তুক ও কৃপাযোগ্য হতভাগ্য ব্যক্তি।

ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনী থাকবে কিনা এবং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে আগুয়ান হওয়া উচিত কিনা—এসব আবশ্যক প্রশ্ন এবং একদিন এর সমাধান আমাদের করতেই হবে। কংগ্রেস তার কর্মনীতিতে এখনই এর আংশিক জবাব দিয়েছে। তবে এসব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক নেই এবং ছাত্র বা শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে অহিংসার যে অংশটুকুর সম্বন্ধ, তার সঙ্গেও এর কোন সম্পর্ক নেই। ছাত্রদের জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত অহিংসা উচ্চতর রাজনীতির ক্ষেত্রোদ্ভূত ঐসব প্রশ্ন থেকে ভিন্ন। ছাত্রদের পারস্পারিক সম্পর্কের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের অহিংসার গভীর যোগাযোগ থাকবে। সমগ্র পরিবেশ যেখানে বিশুদ্ধ অহিংসার সুরভি দ্বারা আমোদিত, সহপাঠী বালক-বালিকারা সেখানে ভাইবোনের মত থাকবে। তারা স্বাধীন হবে, কিন্তু স্বতঃ আরোপিত সংযম দ্বারা পরিচালিত হবে। ছাত্ররা শিক্ষকদের সঙ্গে সন্তানোচিত বাৎসল্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকবে। এই পবিত্র পরিবেশই অহিংসার পাঠের বিরামহীন পাঠ্যক্রম হবে। এই পরিবেশে পালিত ছাত্রের দল সর্বদা বদান্যতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেবাকার্যের দক্ষতার জন্য বিশিষ্ট মর্যাদা পাবে। সামাজিক দুরাচার তাদের কাছে বাধাস্বরূপ প্রতীয়মান হবে না। তাদের প্রেমভাবের গভীরতা এসব বাধাকে ভস্মীভূত করার পক্ষে

যথেষ্ট বিবেচিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বাল্য বিবাহের কল্পনাতেই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। পাত্রীর পিতামাতার কাছ থেকে পণদাবী করে তারা তাঁদের সাজা দেবার কথা মনেও আনবে না। আর বিবাহের পর তারা কি সহধর্মীণীকে এক জাতীয় অস্থাবর সম্পত্তি মনে করতে পারে, না তাকে শুধু নিজ লালসা নিবৃত্তির সাধন বলে ভাবতে পারে? এইরূপ অহিংস পরিবেশে লালিত পালিত কোন যুবক নিজের বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক ভাইএর সঙ্গে লড়াই করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। যাই হোক, নিজেকে অহিংসার অনুবর্তী আখ্যা দিয়ে কেউ এইসব বা এর মধ্যে যে কোন একটি কাজ করতে পারে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে অহিংসা হচ্ছে অতুলনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন আয়ুধ। এ হচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র। এ হচ্ছে সাহসীদের ভূষণ এবং এমনকি তাদের সবকিছু। এ জিনিস ভীরুর আয়ত্বাধীন নয়। এ কোন নির্জীব নিষ্প্রাণ গোঁড়ামি নয়। এ হচ্ছে এক জীবন্ত এবং জীবনদায়ী শক্তি। এ হচ্ছে আত্মার বিশেষ গুণ। এই জন্যই একে সর্বোচ্চ ধর্ম (নিয়ম) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শিক্ষাশাস্ত্রীদের হাতে এর রূপ হবে পবিত্রতম প্রেম ও প্রতিটি কর্মে প্রকাশমান জীবন নির্ঝরিণীর সতত সজীব এবং চিরোৎসারিত প্রবাহের মত। অসদভিপ্রায় এর সামনে টিকতে পারে না। অহিংসা-সূর্য ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি যাবতীয় অন্ধকারকে নিজ কক্ষপথ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। দিবাকরকে যেমন কোন উপায়ে গুপ্ত রাখা যায় না, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে অহিংসাকেও আর গোপন করা যাবে না ও এর জ্যোতি উজ্জ্বল হয়ে দূর-দূরান্তে বিকীর্ণ হবে। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে যে বিদ্যাপীঠ এই জাতীয় অহিংস বায়ুমণ্ডলে পূর্ণ হলে এর ছাত্ররা আর কোনরকম হতবুদ্ধিকারক প্রহেলিকা দ্বারা উত্যক্ত হবে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৬-৯-১৯২৮।

৪০। উৎসব পালন

জনৈক পত্রলেখক আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে দেওয়ালী উৎসবোপলক্ষে যারা বাজি, খারাপ মিষ্টি এবং অস্বাস্থ্যকর আলোক সজ্জার পিছনে বহু অর্থের অপচয় করার কথা ভাবছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমি যেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করি। এ অনুরোধে আমি সোৎসাহে সাড়া দেব। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি এই দিনটিতে জনসাধারণকে দিয়ে নিজ গৃহ এবং অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করাতাম এবং বালক-বালিকাদের জন্য নির্দোষ ও শিক্ষামূলক আমোদ-

প্রমোদের ব্যবস্থা করতাম। আমি জানি যে বাজি পোড়ানতে ছেলেপিলেরা আনন্দ পায়। তবে এর কারণ হচ্ছে এই যে তাদের পূর্বজ আমরা তাদের ভিতর বাজি পোড়ানর অভ্যাস প্রবর্তন করেছি। বাজি সম্বন্ধে অজ্ঞ আফ্রিকার ছেলে-মেয়েরা বাজি চায় বা এতে আনন্দ পায় বলে আমি শুনিনি। এর বদলে তাদের মধ্যে নাচের প্রথা আছে। নানারকমের লাফঝাঁপ করে খেলা করা ও বন-ভোজনের চেয়ে ছেলেমেয়েদের পক্ষে আর কি শ্রেয়তর ও স্বাস্থ্যকর হতে পারে? তবে এসব চড়ুইভাতিতে তারা এমন সব মিষ্টান্ন খাবে না যার উপকার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তারা খাবে শুকনা বা টাটকা ফলমূল। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে বালক-বালিকাদের ঘর পরিষ্কার ও চুনকাম করা শেখানো যেতে পারে। সুরুতে যদি অন্ততঃ একাজ ছুটির দিনেও আরম্ভ হয়, তবুও এর ফলে তারা শ্রমের মর্যাদা কতকটা বুঝতে শিখবে। কিন্তু যে কথাটার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, এইভাবে বাজি এবং অন্যান্য খাতে যে টাকাটা বাঁচবে, তার পুরোটা না হলেও অন্ততঃ একাংশ খাদি কার্য সম্প্রসারণের জন্য দান করা উচিত। আর খাদির ব্যাপারে যদি একেবারে দিব্যি দেওয়া থাকে, তাহলে এ অর্থ এমন কোন সৎকাজে দান করা যেতে পারে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিটি উপকৃত হতে পারে। উৎসবের দিনে দেশের দীনতম ব্যক্তিটিও সঙ্গে আছে—এই অনুভূতি হৃদয়ে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে হতে পারে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৫-১০-১৯২৮

৪১। সিন্ধুর অভিশাপ

সিন্ধুর "অমিল"রা বোধ হয় ঐ প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর সম্প্রদায়। কিন্তু তাঁদের সমস্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও তাঁদের ভিতর এমনসব গুরুতর কুপ্রথা আছে, যা তাঁদের একেবারে একচেটিয়া বলে মনে হয়। এর মধ্যে "দেতি-লেতি" প্রথা কম নিন্দনীয় নয়। এমন একজন অমিলের কথা আমি জানি না, যিনি কিনা এই নীচ প্রথাকে সমর্থন করেন। অমিল সমাজের শিক্ষিত যুবকরা পৃষ্ঠপোষকতা করে বলেই এ প্রথা দীর্ঘজীবি হয়েছে। তারা সৎভাবে যা উপার্জন করতে পারে, তাদের জীবনযাত্রার মান তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং তারা সবরকমের নীতিবোধ জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং নিজেদের অকিঞ্চিৎকর লক্ষ্য পূরণের জন্য বিবাহ প্রথা নিয়ে বেনিয়াগিরি করে নিজেদের খাটো করতে তাদের বাধে না। আর এই একটি পাপ অভ্যাসের প্রভাবে তাঁদের জাতীয় কর্মপ্রেরণা হীনবল। নচেৎ তাঁদের

বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষা দ্বারা তাঁরা দেশের বহু উপকার সাধন করতে পারতেন।

"দেতি-লেতি" প্রথার বিরুদ্ধে এমন জনমত সৃষ্টি করা উচিত, যা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এ প্রথার বিরুদ্ধে কোন সদা জাগ্রত জনমত না থাকার জন্যই যুবক অমিলরা বিবাহ-যোগ্যা কন্যাদের পিতাকে দোহণের ব্যবস্থা করতে পারে। স্কুল, কলেজ এবং মেয়েদের অভিভাবকদের ভিতর কাজ করতে হবে। অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষিত করবেন যে, তারা যেন যেসব যুবক তাদের বিবাহ করার মূল্যপ্রার্থী, তাদের সঙ্গে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করে এবং মেয়েরা যেন এই জাতীয় অপমানজনক সর্তে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে অনূঢ়া থেকে যায়। বিবাহের একমাত্র সম্মানজনক সর্ত হচ্ছে পারস্পারিক ভালবাসা ও সম্মতি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৭-১২-১৯২৮

৪২। ছাত্র ধর্মঘট

আহ্মেদাবাদের গুজরাট কলেজের ছাত্র ধর্মঘট অপ্রশমিত বেগে চলেছে। ছাত্ররা অতীব প্রশংসনীয় দৃঢ়তা, স্থৈর্য এবং সংহতির পরিচয় দিচ্ছে। এইবার তারা নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে সুরু করেছে এবং আমার মনে হয় যে কোন রকম গঠনমূলক কাজ করলে তারা অধিকতর শক্তি অনুভব করবে। আমার বিশ্বাস এই যে এদেশের স্কুল-কলেজগুলি আমাদের মানুষ করার বদলে পরের আজ্ঞানুবর্তী, ভীরু, অস্থিরমতি এবং অবিমৃষ্যকারী করে গড়ে তোলে। মনুষ্যত্বের অর্থ ধাপ্পা দেওয়া, স্পর্ধা প্রদর্শন বা লাটসাহেবী করা নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত কাজ করার সৎসাহস প্রদর্শন এবং তার প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়াই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এর পরিচয় কথায় নয়, কাজে। আজ পর্যন্ত ছাত্রদের দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ এদিকে গেলেও তাদের নিরুৎসাহ হবার কিছু নেই। এ অবস্থায় এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা জনসাধারণের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সারা ভারতের ছাত্র সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রদের এই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার্থ অগ্রসর হওয়া। এ ব্যাপার সম্বন্ধে যারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান অর্জন করতে চান, শ্রীযুক্ত মভলঙ্কর তাঁদের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্রের নকল দেবেন। আহমেদাবাদের ছাত্র সংগ্রাম তাদের কোন ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, এ সংগ্রাম সমগ্র ছাত্র সমাজের সম্মানের জন্য এবং সেই জন্যই এক দিক থেকে এ হচ্ছে জাতীয়

মর্যাদার প্রশ্ন। এইরকম তেজস্বিতা সহকারে যেসব ছাত্র লড়াই করছে, তাদের পূর্ণ জনসমর্থন পাওয়া উচিত।

কোন রকম গঠনমূলক জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলে ছাত্ররা এ সমর্থন পাবেই পাবে। জাতির সেবায় তাদের কোন লোকসান নেই। কংগ্রেসের কর্মসূচী মনঃপূত না হলে শুধু এতেই তাদের আবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই। আসল কথা হচ্ছে এই যে তাদের স্বীয় ঐক্যবদ্ধ থাকার ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে ও দেখাতে হবে যে তারা স্বাধীনভাবে খাঁটি কাজ করতে পারে। সময় সময় আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে বক্তৃতা দেবার বেলায় আমরা খুব পটু এবং নিষ্ফল ক্ষণস্থায়ী কাজও আমরা ভাল পারি ; কিন্তু সংঘশক্তি, সহযোগিতা, তেজ ও অদম্য দৃঢ়তার পরিচায়ক আসল কাজ করার বেলায় আমরা অকার্যকারী সাবুদ হই। এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার সুবর্ণ-সুযোগ ছাত্রদের হাতে। তারা কি কালের দাবী শুনবে ?

যাই হোক না কেন, তারা যেন বিশ্বাস না হারায়। কলেজ জাতির সম্পত্তি। আমরা যদি নিতান্ত মেরুদণ্ডবিহীন না হই, তবে কোন বিদেশী শাসকের সাধ্য নেই যে, জাতির যে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করা ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্য, তাতে তারা ছাত্রদের যোগদানকে প্রায় অপরাধের পর্যায়ে ফেলে এবং আমাদের এই সম্পত্তি অধিকার করে বসে থাকে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩১-১-১৯২৯

৪৩। করাচীর ছাত্রদের প্রতি *

"হে তরুণের দল", বলে গান্ধীজী বক্তৃতা সুরু করে বললেন, "ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, 'অনুকরণ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা আন্তরিক তোষামোদের প্রক্রিয়া ; কিন্তু অভিনন্দন পত্রে আমাকে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে তোমরা আমার সব আদর্শের বিরোধিতা করছ। মনে হয় তোমরা বোধ হয় এই কথা বলতে চাও—'আপনি কি চান তা আমরা জানি, তবে আমরা কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করব।' তোমরা অবশ্য আমাকে জেনে শুনে অপমান করতে চাও না, তবে কি তোমরা গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নেবার মত আমাকে 'মহাত্মাগিরির' সুউচ্চ শিখরে উঠিয়ে দিয়ে শেষকালে নিজেদের বেলায় আমার

*করাচীর কলেজ সমূহের ছাত্রদের সম্মিলিত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা।

পদাঙ্ক অনুসরণ করার দায় নেই বলে বলছ? যাই হোক তোমরা যখন আমাকে এখানে ডেকেই ফেলেছ, তখন তোমাদের প্রত্যেকটি দুষ্কৃতির হিসাব আমার কাছে পেশ করতে হবে।" আর তিনি এর ভালরকম হিসাবই নিলেন। বোধ হয় সারা জীবনে তাদের এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। গান্ধীজী তাদের উদ্দেশ্যে যা বললেন, তা ছুরির ফলার মত তাদের বিঁধল। তবে পার্থক্য এইটুকু যে সে ছুরি তাদের আঘাত করার জন্য নয়, শল্য চিকিৎসকের ছুরিকার মত তাদের নিরাময় করার জন্য গান্ধীজীর ছুরি প্রযুক্ত হয়েছিল। প্রথমেই তিনি বিদেশী ভাষায় অভিনন্দনপত্র রচনা করার জন্য তাদের ভর্ৎসনা করলেন। সৌজন্যের খাতিরেও তাদের অন্তত এটা হিন্দীতে রচনা করা উচিত ছিল ও নিতান্ত তা না পেরে উঠলে সিন্ধী ভাষায় অভিনন্দনপত্র রচনা করা যেত এবং তাহলে অন্তত তিনি তাদের সূক্ষ্মদর্শীতার প্রশংসা করতেন। এমন কি বিদেশীরাও তিনি খুশী হন বলে তাঁর সাক্ষাতে যথাসাধ্য হিন্দুস্থানী শব্দ ব্যবহার করেন। সুতরাং এ অনুষ্ঠানে তাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহারের কি অজুহাত আছে? নেহরু কমিটি তাঁদের রিপোর্টে সুপারিশ করেছে যে স্বরাজী ভারতে হিন্দুস্থানী সার্বজনীন ভাষা ও সরকারী ভাষার মর্যাদা পাবে। এর পর রসিকতা করে তিনি বললেন, "কিন্তু সম্ভবত তোমরা হয়ত বলবে, 'আমরা ইনডিপেনডেন্সওয়ালা'। আমি তাহলে তোমাদের দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল বোথার উদাহরণ মনে করিয়ে দেব। বোয়ার যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার নিষ্পত্তিকালে তিনি এমন কি সম্রাটের সাক্ষাতেও ইংরাজীতে বার্তালাপ করেননি। দোভাষীর সাহায্যে নিজ মাতৃভাষা ডাচ ভাষাতে কথা বলাই তার অধিকতর কাম্য বোধ হয়েছিল। স্বাধীনতা পিয়াসী জাতির প্রতিনিধির এছাড়া গত্যন্তর নেই।" তাদের বিদেশী চালচলন ও ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন. "অর্থশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে তোমাদের জানা উচিত যে, তোমাদের শিক্ষা ব্যয় বাবদ রাজকোষ থেকে যে পরিমাণ ব্যয় হয়, তোমাদের শিক্ষণ বেতন তার সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। হে আমার তরুণ বন্ধুর দল, একথা কি তোমরা কখনও ভেবে দেখেছ যে বাদবাকি টাকা আসে কোথা থেকে? এ টাকা আসে দরিদ্রদের পকেট থেকে। এ টাকা যোগায় উড়িষ্যার জীবন্ত কঙ্কালরা।* নিষ্প্রভ চক্ষু এবং মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের ছাপ নিয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়। বৎসরের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এদের জঠরে ক্ষুধার অগ্নি ফুঁসতে থাকে। এদের অস্তিত্ব নির্ভর করে ধনাঢ্য গুজরাটী ও মারোয়াড়ীর অপমানকর বদান্যতার অভিব্যক্তি—তাদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত কয়েক মুষ্টি কদন্ন এবং

*উড়িষ্যায় সে সময় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চলছিল। অনুবাদক।

সামান্য একটু নোংরা লবণরূপী ক্ষীণ সূত্রের উপর। তোমাদের এইসব ভাইদের জন্য তোমরা কি করেছ? নিজ ভগ্নীর পবিত্র হস্তদ্বারা উৎপন্ন গৃহজাত খাদি পরিধান করার পরিবর্তে তোমরা বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করে প্রতিবৎসর ষাট কোটী টাকা দেশের বাইরে পাঠাবার কাজের সহায়ক হও এবং এইভাবে ভারতের দরিদ্র ব্যক্তিদের মুখের গ্রাস তোমরা ছিনিয়ে নাও। ফলে দেশ ধুল্যাবলুণ্ঠিত। আমাদের বাণিজ্য দেশকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের শোষণের কারণ হয়েছে এবং আমাদের বণিক সম্প্রদায় ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেস্টারের কমিশন এজেণ্টের পর্যায়-ভুক্ত হয়েছেন। খুব বেশী হলে তাঁরা লাভের শতকরা পাঁচটাকা পান এবং এর থেকে সৃষ্ট হয় নগরগুলির আপাতদৃষ্টিতে নয়নমুগ্ধকর সমারোহ।" তিনি বলে চললেন যে লর্ড স্যালিসবারীই প্রথম এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রকাশ করেন যে ভারতের দেহ থেকে রক্ত মোক্ষণ করতে হলে সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় শলাকা বিদ্ধ করতে হবে। আর লর্ড স্যালিসবারীর সময় যদি রক্ত মোক্ষন করে রাজস্ব আদায় করা হয়ে থাকে, তাহলে এত বছরের শোষণের পর ভারত দরিদ্রতর হওয়ায় সে রক্তক্ষরণ কেমন হচ্ছে তা ভাববার কথা। তারা যেন ভুলে না যায় যে ভারতীয় জনসাধারণের প্রাণবায়ুরূপ এই রাজস্ব থেকে তাদের শিক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। এতদ্ব্যতিরেকে তারা কি একথা উপলব্ধি করছে যে স্বদেশবাসীর সর্বনাশ ঘটিয়ে তারা শিক্ষা পাচ্ছে? কারণ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থ আসছে কুখ্যাত আবগারী আয় থেকে। সুতরাং ন্যায়াধীশ ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের এই ভীষণ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে—'নিজ ভ্রাতাদের জন্য তুমি কি করেছ?' তিনি তাদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে তারা এর কি জবাব দেবে? এরপর তিনি তাদের নিকট হজরত ওমরের উদাহরণ পেশ করলেন। মুসলমান রাজ-পুরুষরা যখন বিলাস-পূর্ণ জীবনযাত্রা প্রণালীর করতলগত হলেন এবং তাঁরা যখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করা আরম্ভ করলেন, হজরত ওমর তখন তাঁদের এই বলে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেছিলেন যে, যাঁরা সর্বদা মোটাদানার আটার রুটি এবং মোটা পোশাক ব্যবহার করে না, তাঁরা পয়গম্বরের সত্যকার অনুবর্তী নন। তিনি চান যে তারা যেন এই ঈশ্বরপ্রেমী খলিফার জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

আর এটা কি একটা লজ্জার বিষয় নয় যে সিন্ধুর বন্যার্তদের সেবার জন্য নারারণ দাস মালাকানীর যখন যুবক দলের সাহায্যের প্রয়োজন ঘটল, তখন এর জন্য তাঁকে গুজরাটের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হল? এবং সর্বশেষে ঘৃণ্যকারজনক "দেতি-লেতি" প্রথা সম্বন্ধে তাদের কি বক্তব্য আছে? স্ত্রীকে তারা গৃহ এবং নিজ হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী

না করে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত করেছে। এ বিদ্যা কি তারা ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করে অর্জন করেছে? স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গী। তারা কিন্তু তাকে ক্রীতদাসীর পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ দেশের এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত দশা। উপসংহারে তিনি বললেন, "স্বরাজ ভীরুদের জন্য নয়। এ তাদেরই জন্য যারা হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে চড়বে এবং এমন কি এসময় চোখ বাঁধতেও অস্বীকার করবে। শপথ কর যে তোমরা দেতি-লেতি প্রথার কলঙ্ক অপনোদন করবে এবং নিজ ভগ্নী ও স্ত্রীকে তোমরা পূর্ণ মর্যাদা ও স্বাধীনতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠ করার জন্য জীবনপণ করবে। তাহলেই আমি বুঝব যে দেশের স্বাধীনতাকে বরণ করতে তোমরা প্রস্তুত হয়েছ।" তদনন্তর উপস্থিত ছাত্রীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "মেয়েদের আমি শুধু এই কথাটাই বলব যে আমার অভিভাবকত্বে যদি কোন মেয়ে থাকত, তবে তাকে আমি আজীবন কুমারী রেখে দিতাম; কিন্তু কেউ তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার বিনিময়ে একটিমাত্র পয়সা চাইলেও সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হতাম।" অবশেষে তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে ছাত্রদের এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে তারা যদি তাঁর উপদেশ গ্রহণ করার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু তাঁর গুণগানে নিজেদের তৃপ্ত মানে, তবে তাদের আচরণ হবে ভাট বা তোতাপাখীর মত, ভদ্রলোকের মত নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৪-২-১৯২৯

৪৪। যুবকদের প্রতি বাণী *

ছাত্র সহকর্মী ও বন্ধুগণ,

তোমাদের অভিনন্দন পত্র এবং দরিদ্রনারায়ণের জন্য তোমাদের উন্মুক্ত হস্তের দানের সঞ্চয় এই টাকার থলির জন্য তোমাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তোমাদের মধ্যে যারা ভারতীয়, তাদের কাছে দরিদ্রনারায়ণ শব্দের অর্থ অজানা নয়। তবে বর্মী ছাত্ররা হয়ত শব্দটির তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। দরিদ্রনারায়ণ হচ্ছে সেই নামাতীত ঈশ্বরের লক্ষ লক্ষ নামের মধ্যে একটি নাম—যে নামে মানব সমাজ মানুষের বোধাতীত ঈশ্বরকে জানে। এ কথাটির অর্থ হচ্ছে দরিদ্রের ভগবান—দীনজনের হৃদয়ে উদ্ভূত ভগবান। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এক পবিত্র মুহূর্তে সহজ জ্ঞানের আলোকে এ নামটি আবিষ্কার করেন। নিজ অভিজ্ঞতার বলে আমি এ নাম গ্রহণ করিনি, এ হচ্ছে দেশবন্ধুর নিকট হতে প্রাপ্ত ঐতিহ্য। যে কর্তব্য সাধনের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত, সেই সম্পর্কে তিনি এ শব্দটি

* রেঙ্গুনের ছাত্রদের সমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

প্রয়োগ করেন। এ আদর্শ হচ্ছে চরকার বাণী প্রচার করা। আমি জানি এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁরা এই ছোট্ট যন্ত্রটিকে উপহাস করেন এবং আমার এই কাজটিকে তাঁরা উৎকেন্দ্রিকতার নিদর্শন বলে মনে করেন। একে পরিহাস বা সমালোচনা করা সত্ত্বেও আমি চরকার বাণী প্রচার করাকে আমার অন্যতম কর্ম-স্থচীর অঙ্গীভূত করেছি এবং এখন আমি তোমাদের সামনে কথা বলছি—এই ঘটনা সম্বন্ধে আমি যতটা নিশ্চিত, ঠিক ততখানি নিশ্চিত এই বিষয়ে যে এক সময় এ সমস্ত বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করা বন্ধ হবে এবং চরকা যাতে ভারতের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু জনতার সর্বজন পরিত্যক্ত কুটীরে উপযুক্ত স্থান পায়, তার জন্য বিদ্রূপকারীরা আমারই সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাবে। তাই যে ভারতবাসীরা এ দেশকে নিজ মাতৃভূমি করে নিয়েছে, তাদের কাছেও আমি এ বাণী নিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করিনি। বর্মীদের খাদি কার্য প্রসারের জন্য টাকা দিতে বলার অধিকার আমার নেই; কিন্তু যেসব ভারতবাসী বিশেষ করে তোমাদের এদেশ থেকে অন্ন সংস্থান করে, তাদের কাছে এ দাবী জানাবার এবং দরিদ্রনারায়ণকে আহার দিতে অনুরোধ করার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি।

ছাত্রসমাজে তোমরা আমাকে এমন এক সম্মানের আসন দিয়েছ, আমি যার যোগ্য নই। তবে অন্য একটি দাবী জানাবার জন্য আমি চেষ্টায় আছি। এ হচ্ছে ছাত্রসমাজের সেবক হবার দাবী। শুধু ভারত বা ব্রহ্মের নয়, আমার প্রচেষ্টাকে যদি নিতান্ত আকাশচারী আখ্যা না দেওয়া হয়, তবে বলব সমগ্র বিশ্বের ছাত্র সমাজের সেবক হবার প্রচেষ্টায় আমি মগ্ন আছি। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে অবস্থিত অনেক ছাত্রের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ আছে এবং ভগবান যদি আমাকে আর কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখেন, তবে আমার এ দাবীর যথার্থতা আমি হয়তো সপ্রমাণ করতে পারব। বিগত চল্লিশ বছরের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই যে আমি যখন পড়াশুনা ছাড়লাম, তখনই যেন ছাত্রজীবনের দ্বারদেশে এসে উপনীত হলাম। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে আমার কাছ থেকে তোমরা জেনে রাখ যে শুধু বই পড়া পরবর্তী জীবনে বিশেষ কাজে লাগবে না। ভারতবর্ষের কোণ কোণ থেকে ছাত্রদের যে সমস্ত চিঠিপত্র পাই, তাতে বুঝতে পেরেছি গাড়ী গাড়ী পুঁথিপত্রের খবর দিয়ে মগজ ঠাসাই করার ফলে ছাত্রদের আজ কি শোচনীয় দুরবস্থা। কারও কারও জীবনে কোন সঙ্গতি নেই, কেউ বা উন্মাদ হয়ে গেছে এবং কেউ বা আবার অসহায় ভাবে অসৎ জীবন যাপন করছে। আমি যখন তাদের কাছ থেকে শুনি যে শয়তানকে আয়ত্ত করতে না পারায় তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাদের অবস্থা যে-কে সেই, তখন তাদের জন্য আমার মন বেদনায়

অভিভূত হয়ে ওঠে। সখেদে তারা বলে, "আমাদের পরাভূতকারী এই অপবিত্রতা-রূপী শয়তানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি বলুন?" তাদের যখন আমি রামনাম নিয়ে ঈশ্বরের সামনে নতজানু হয়ে তাঁর সহায়তা যাজ্ঞা করতে বলি, তখন তারা আমার কাছে এসে বলে, "ভগবান যে কোথায় তা আমরা জানি না। কিভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করতে হয় তাও আমাদের জানা নেই।" আজ তারা এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এই জন্যই আমি ছাত্রদের সতর্ক থাকতে বলি। আমি তাদের বলি যে, যে কোন বই পেলেই তারা যেন পড়া না সুরু করে এবং শিক্ষকদেরও আমি তাদের মনোরাজ্যের খবর রাখতে বলি। আর পরামর্শ দিই যে তাঁরা যেন তাদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমার ধারণা এই যে শিক্ষকের কর্তব্য ক্লাশঘরের ভিতরের চেয়ে এর বাইরেই বেশী। একদিন কাজ না করলে আজকাল পেট চলে না। এই অবস্থায় শিক্ষক ও অধ্যাপকরা যেটুকু পারিশ্রমিক পান সেইটুকুই কাজ করেন। এইজন্য ক্লাশের বাইরে তাঁরা ছাত্রদের সময় দিতে পারেন না এবং এই না পারাটাই বর্তমানকালের ছাত্রদের জীবন ও চরিত্র বিকাশের পথে সর্বাপেক্ষা জটিল প্রতিবন্ধক। কিন্তু শিক্ষকরা ক্লাশের বাইরে সবটুকু সময় ছাত্রদের জন্য দিতে না পারা পর্যন্ত বিশেষ কিছু হবার নয়। তারা যেন মস্তিষ্কের বদলে হৃদয়ের অলঙ্করণ করে। তাদের অভিধান থেকে হতাশা বা নৈরাশ্যদ্যোতক সমস্ত শব্দ যেন তারা মুছে ফেলে। সৎকর্ম প্রচেষ্টায় কখনও পরাজয় মেনো না এবং এরপর মনে মনে স্থির কর যে তোমরা পবিত্র হবে ও ঈশ্বরের কাছ থেকে সাড়া পাবে। ভগবান কিন্তু উদ্ধত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দর-দস্তুরকারীর প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন না। তোমরা কি গজেন্দ্র মোক্ষর কাহিনী শুনেছ? এখানে উপস্থিত যেসব বর্মী ছাত্র এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য জান না, বিশ্বের অন্যতম স্বর্গীয় রচনার স্বাদ যারা পায়নি, তাদের আমার অনুরোধ যে তারা যেন স্বীয় ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট হতে এ জেনে নেয়। আমার সদাসর্বদা একটি তামিল প্রবাদ মনে পড়ে। এর অর্থ হচ্ছে, "অসহায়ের সহায় হরি।" তাঁর কাছে সহায়তা পেতে হলে নিঃস্বভাবে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াও এবং তোমাদের মত পতিত মানবকে কিভাবে তিনি সাহায্য করবেন এ সম্বন্ধে কোনরকম শঙ্কা বা সংশয় মনে না রেখে নির্ভয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও। কোটী কোটী প্রার্থীকে যিনি সাহায্য করেছেন, তিনি কি তোমাদের বিমুখ করবেন? তিনি কোনরকম বাছ-বিচার করেন না এবং দেখবে যে তোমাদের প্রতিটি প্রার্থনায় তিনি সাড়া দিচ্ছেন। একান্ত অপবিত্র যে, তার প্রার্থনাও বিফল হবে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের আমি একথা

বলছি। পাপস্খালনের অগ্নিশিখায় আমি দগ্ধ হয়েছি। প্রথমে শুধু স্বর্গরাজ্য চাও, তারপর সব পাবে। অপবিত্র মনে শিক্ষকদের কাছে যেও না বা বই ছুঁয়ো না। শুচিশুভ্র অন্তঃকরণে তাঁদের কাছে যাও এবং তাহলে যা খুঁজছ তা পাবে। তোমরা যদি দেশসেবক হতে চাও, সত্যকার দেশহিতব্রতী এবং দরিদ্রের ত্রাণকর্তা হওয়া যদি তোমাদের লক্ষ্য হয়, তোমরা যে শিক্ষা পাও তার স্বাদ পাওয়া যেসব বিত্তহীন ও অত্যাচারিত ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব, তাদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব যদি নিতে ইচ্ছুক হও, তোমরা যদি ব্রহ্মদেশের প্রতিটি বালিকা ও মহিলার পবিত্রতার অছি হতে চাও, তবে সর্বপ্রথম নিজেদের চিত্ত শুদ্ধ কর। এই প্রেরণা নিয়ে জীবনের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হলে বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৪-৪-১৯২৯

৪৫। ছাত্রদের মাঝে *

গান্ধীজী বলতে লাগলেন, "ছাত্রদের কাছ থেকে এইভাবে অযোগ্যতার স্বীকারোক্তি শুনতে আমি প্রস্তুত নই। তোমাদের সব পাণ্ডিত্য এবং সেক্সপিয়ার ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়া বৃথা যাবে, যদি না পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন কর এবং নিজ চিন্তা ও কর্মের প্রভু হও। আত্মজয় করে তোমরা যখন ইন্দ্রিয় সংযম করা শিখবে, তখন আর নৈরাশ্য প্রকট করবে না। হৃদয় সমর্পণ করার পর তোমরা আর কর্মের দৈন্য স্বীকার করতে পার না। হৃদয় সমর্পণ করার অর্থ সবকিছু দেওয়া। প্রথমে তোমাদের হৃদয় সমর্পণ দিয়ে সুরু করতে হবে।

"কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা আজ কি দেখছি? আমি শুনেছি যে উত্তর প্রদেশের ছাত্ররা অভিভাবকদের পীড়াপীড়ির জন্য নয়, নিজের আগ্রহে বিবাহ করে। ছাত্রাবস্থায় শক্তির অপব্যয় না করে সঞ্চয় করাই হচ্ছে নিয়ম। আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন বিবাহিত। মন্দের ভাল হিসাবে তোমাদের এখন বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কঠোর ইন্দ্রিয় সংযমী হওয়া উচিত এবং অধ্যয়নরত অবস্থায় নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। পাঠ্যাবস্থার অবসানে দেখবে যে এই সংযমের ফলে দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—সকল দিক দিয়েই তোমাদের অবস্থা শ্রেয়তর। একথা মনেও ঠাঁই দিও না যে আমি তোমাদের কাছে অসম্ভব কিছু বলছি। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও একান্তভাবে সংযম পালন করার মতবাদ ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করছে এবং এতে এই আদর্শ পালনকারী এবং সমগ্র মানব সমাজের

* আগ্রা কলেজের ছাত্রদের সমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। যারা অবিবাহিত, তাদের আমি প্রলোভন জয় করতে বলব। আসলে তো আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করার সংগ্রামরত গোলাম জাতি। তোমরা অন্তত পৃথিবীতে গোলাম শিশুর সংখ্যা বাড়াবার পাপের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। তোমাদের কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র আমার কাছে মর্মস্পর্শী চিঠি লিখে মানসিক দৌর্বল্যের হাত থেকে ত্রাণ পাবার উপায় জানতে চায়। আমি তাদের সেই প্রাচীন ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকি। সকল দুর্বলতার ভিতর দিয়ে তারা যদি ঈশ্বরের সহায়তা যাচ্ঞা করে, তবে আর অসহায় বোধ করবে না। যে বন্ধুটি আমাকে এই বিবাহরূপী পাপের সংবাদ দেন, তিনি অভিযোগ করেছেন যে ছাত্ররা বিবাহোপলক্ষ্যে অভিভাবকদের বাজে খরচের চক্রে ফেলার দোষেও দোষী। তোমাদের অবশ্যই একথা জানা উচিত যে বিবাহ হচ্ছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং এর জন্য কোন রকম অর্থব্যয় হওয়া অপ্রয়োজনীয়। ধণাঢ্য ব্যক্তিরা যদি জাঁকজমক এবং ভোজ্যের জন্য অর্থব্যয় করার ইচ্ছা বর্জন না করেন, তবে দরিদ্ররাও এর অনুকরণ করতে যাবে এবং ফলস্বরূপ ঋণগ্রস্ত হবে। তোমরা যদি সাহসী হও তবে বিবাহের প্রাক্কালে যে কোন রকমের অমিতব্যয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৯-৯-১৯২৯

৪৬। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ *

যেসব প্রতিষ্ঠান ও শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে ইংরাজীতে অভিনন্দন পত্র পাবার কোনরকম যুক্তি থাকতে পারে না, তাদের কাছ থেকে বিদেশী ভাষায় অভিনন্দন পত্র পাওয়া যে কিরকম ক্ষতিকারক, সে সম্বন্ধে ছাত্ররা অজ্ঞ বলে গান্ধীজী বেদনাযুক্ত বিস্ময় প্রকাশ করলেন। ছাত্রদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে লখনউ-ইংরাজী ব্যবহার করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। লখনউ হচ্ছে জাতীয় ভাষার লীলাভূমি। ছাত্ররা জানে যে বক্তার উচ্চাঙ্গের লখনউই উর্দু বুঝতে অসুবিধাও হয় না। তিনি তাদের বললেন যে নিজ মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হিন্দুস্থানীর প্রতি তাদের যদি বিন্দুমাত্র অনুরাগ না থাকে, তবে তারা ভারতের স্বরাজের জন্য সংগ্রামকারী সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাবার আশা করতে পারে না। মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন কোন ব্যক্তি স্বদেশপ্রেমী বলে দাবী করতে পারে না। তিনি

* লখনউএর ছাত্ররা ইংরাজীতে অভিনন্দন পত্র দেওয়াতে তার উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ।

তাদের পরলোকগত জেনারেল বোথার উদাহরণ দিয়ে বললেন যে, তিনি ইংরাজী জানা সত্ত্বেও লণ্ডনে গিয়ে রাজার সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে ডাচ ভাষায় কথা বলার উপর জোর দিয়েছিলেন। রাজা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে একে ডাচ ভাষাভাষী জাতির প্রতিনিধির উপযুক্ত কার্য বলে প্রশংসা করেছিলেন। তাদেরও নিজ মাতৃ-ভাষা সম্বন্ধে এইরকম গৌরব বোধ করা উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১০-১০-১৯২৯

৪৭। স্নাতকদের উদ্দেশ্যে বাণী *

সরকারী স্কুল-কলেজের সঙ্গে তোমাদের স্কুল-কলেজের তুলনা করলে তোমরা হতাশ হতে বাধ্য। এ দুটি বিপরীত প্রকৃতির। জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল সরকারী বিদ্যানিকেতনের জন্য যেসব প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে এবং সেখানে যেসব বিভিন্ন পদাসীন উচ্চ বেতনের জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকমণ্ডলী রয়েছেন, তোমরা তা আশা করতে পার না। আর্থিক সঙ্গতি হলেও তোমাদের ভাগ্যে এ জুটবে না। সরকারী প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশী শাসকদের শাসন কার্যের সৌকর্যের জন্য কেরানী বা ঐ জাতীয় কর্মচারী সৃষ্টি করা। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সম্পূর্ণ এর বিপরীত বা ঐ জাতীয় কর্মচারী সৃষ্টি করার পরিবর্তে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সব মানুষ সৃষ্টি করা যারা যে কোন মূল্যে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে দৃঢ় সংকল্প এবং তাও যথাসম্ভব সত্বর। সরকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বভাবতই বিদেশী শাসকদের কাছে অনুগত থাকতে হবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য দেশের কাছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থের দিক থেকে লাভদায়ক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে জাতীয় প্রতিষ্ঠান পূর্ণ সেবার বিনিময়ে শুধু মাত্র টিকে থাকার মত সঙ্গতির প্রতিশ্রুতি দেয়। এইমাত্র তোমরা ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধের এক শপথ গ্রহণ করেছ। ম্যাক্সমূলার আমাদের ঠিকই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে জীবন কর্তব্যসমূহের সমষ্টি মাত্র। যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করলে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে অধিকার অর্জিত হয়। তবে অধিকারের দিকে চোখ দিয়ে যে কর্তব্য পালন করতে হয়, সাধারণতঃ সে ঔদাসীন্যভরে সে কর্তব্য পালন করে এবং সময় সময় সে বাঞ্ছিত অধিকার পায় না, অথবা পেলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তা বোঝায় পরিণত হয়েছে। তোমাদের তাই শুধু সেবা করাতেই সন্তুষ্টি। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের

* কাশী বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসবের বক্তৃতা।

বিশ্রাম নেই। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমাদের এই মৌলিক পার্থক্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করলে তোমরা কখনও নিজ অভিরুচির জন্য গ্লানি বোধ করবে না। তবে আমি জানি যে সংখ্যাল্পতা সময় সময় তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বেকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করার বুদ্ধিমত্তায় সংশয় প্রকাশ কর ও মনে মনে সেখানে প্রত্যাবর্তন করার গোপন অভিলাষ পোষণ কর। আমি বলছি যে যাবতীয় মহান আদর্শে যোদ্ধার সংখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কি উপাদানে তারা তৈরী তাই দিয়েই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। বিশ্বের মহাপুরুষরা চিরকালই একলা। জোরাষ্ট্র, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহান ধর্মনায়কদের উদাহরণ নাও। এঁরা সবাই একা দাঁড়িয়েছিলেন। এইরকম আরও নাম করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের ঈশ্বর ও নিজের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস ছিল এবং ঈশ্বর তাঁদের স্বপক্ষে আছেন এই বিশ্বাস থাকার জন্য তাঁরা কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করেন নি। পয়গম্বরের সঙ্গে পলায়নকালে বিপুল সংখ্যক শত্রু কর্তৃক অনুধাবিত হওয়ায় আবুবকর যা বলেছিলেন, তা বোধহয় তোমাদের মনে পড়বে। পরিণামের কথা চিন্তা করে কম্পিত বক্ষে হজরত মহম্মদকে আবুবকর বললেন, "যে বিপুল সংখ্যক শত্রুদ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত হচ্ছি তার দিকে চেয়ে দেখুন। এই ভীষণ সংকটের মুখে আমরা দুজন কি করব?" বিন্দুমাত্র চিন্তা ব্যতিরেকে পয়গম্বর তাঁর বিশ্বাসী অনুচরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "না আবুবকর, আমরা তিনজন। কারণ ভগবান আমাদের সঙ্গে আছেন।" অথবা বিভীষণ বা প্রহ্লাদের অটল বিশ্বাসের উদাহরণ নাও। আমি চাই যে নিজের ও ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের এই জাতীয় জলন্ত বিশ্বাস জন্মাক।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১০-১০-১৯২৯

৪৮। যুবকরা কি করতে পারে?

কয়েকদিন হল আগ্রার ইয়ুথ লীগের তরফ থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে একটি চিঠি এসেছে :—

"ভবিষ্যতের কার্যক্রম সম্বন্ধে আমরা একেবারে অন্ধকারে রয়েছি। কৃষক ও আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক; কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে না। আমরা আশা করি যে আপনি এ বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য কিছু বাস্তব কর্মপন্থা দেখিয়ে দেবেন। মনে হয় যে শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানই এরকম অসুবিধায় পড়েনি। সুতরাং আপনি নবজীবন বা ইয়ং

ইণ্ডিয়াতে এর নিশ্চিত সমাধানের ইঙ্গিত দিলে তা অতীব কাম্য হবে।"

গোরখপুরের ইয়ুথ লীগের অভিনন্দন পত্রে ঐ একই মনোভাবের প্রতিচ্ছবি প্রকট হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার ছাত্রদের সামনে মূর্তিমান আতঙ্ক-অন্নসমস্যার সম্মুখীন হবার উপায় জানতে চেয়েছিল। আমার মতে উভয় সমস্যাই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং নগর জীবনের পরিবর্তে গ্রামীন জীবন যদি যুবকদের আদর্শ হয়, তবে উভয় সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। আমরা গ্রামীন-সভ্যতার উত্তর সাধক। দেশের বিশালতা, জনসংখ্যার বিপুলতা এবং এ দেশের অবস্থিতি ও আবহাওয়া সবই আমার মতে গ্রামীন সভ্যতাকে এদেশের বিধিলিপি করার মূলে আছে। এর দুর্বলতাও সুবিদিত ; তবে তা অনতিক্রম্য নয়। আমার মতে কোন কঠোর পদ্ধতির বলে দেশের জনসংখ্যাকে ত্রিশ কোটীর বদলে তিন কোটী বা ত্রিশ লক্ষে পরিণত না করা পর্যন্ত এর মূলোৎপাটন করে এর পরিবর্তে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এই কথা ধরে নিয়ে এ সমস্যার প্রতিবিধানের পরিকল্পনা দেব যে আমরা বর্তমানের গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতাকে চিরস্থায়ী করব, তবে এর সর্বমান্য দোষগুলির সংশোধন করার প্রচেষ্টাও চলবে। এটা করা সম্ভব তখনই—যখন যুবকরা গ্রাম্য জীবন গ্রহণ করবে। আর এ করতে হলে এমনভাবে জীবনযাত্রার পুনর্গঠন করা প্রয়োজন, যাতে ছুটির প্রত্যেকটি দিন তারা নিজ স্কুল বা কলেজের আশেপাশের গ্রামে গিয়ে থাকতে পারে এবং যারা পড়াশুনা শেষ করেছে বা যারা মোটেই পড়াশুনা করছে না, তাদের গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা চিন্তা করতে হবে। এই জাতীয় ছাত্রদের গ্রামসেবার উপযুক্ত গুণান্বিত করে তুলতে এবং গ্রামে সহজলভ্য সরল জীবনযাত্রা প্রণালীতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে ইচ্ছুক হলে সম্মানজনক উপায়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিতে অখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ * বা এর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বদাই প্রস্তুত। চরকা সঙ্ঘ মাসিক ১৫৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী দেশের প্রায় ১৫০০ যুবককে প্রতিপালন করে এবং এখনও চরকা সঙ্ঘ এমন সব অগণিত যুবককে নিতে প্রস্তুত যারা উদ্যমী, সৎ ও পরিশ্রমী এবং যারা শরীরশ্রম করতে লজ্জাবোধ করে না। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও সীমাবদ্ধ হবার কারণ, জাতীয় শিক্ষার রেওয়াজ দেশে নেই। প্রচলিত পরিবেশ ও দৃষ্টি-

(* গান্ধীজীর মৃত্যুর পর চরকা সঙ্ঘ ও গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত গঠনমূলক কার্যের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্মিলিত করে অখিল ভারত সর্ব সেবা সঙ্ঘ নাম দেওয়া হয়েছে—অনুবাদক।)

কোণের প্রতি বীতস্পৃহ প্রতিটি আগ্রহশীল যুবককে আমি এই দুটি নীরব অথচ অতীব কার্যকরী গঠনমূলক কাজের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা অনুধাবন করতে বলি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের যুবকদের কাছে সেবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছে। তবে তারা এই দুটি মহান জাতি গঠন-মূলক প্রতিষ্ঠানের শরণ নিক বা না নিক, তারা যেন গ্রামজীবনে অনুপ্রবেশ করে সেবা গবেষণা এবং সত্যকার জ্ঞানার্জনের অসীম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। অবকাশ কালে অধ্যাপকবর্গ ছেলেমেয়েদের উপর বইএর বোঝা না চাপালেই ভাল করবেন। ছাত্রদের তাঁরা সে সময় গ্রামে শিক্ষামূলক সফরে যাবার উপদেশ দেবেন। ছুটির সদ্ব্যয় আমোদ প্রমোদে, বই মুখস্থ করায় নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৭-১১-১৯২৯

৪৯। বৃন্দাবনে *

নিজ প্রতিবেশীর জন্য পরিশ্রম না করলে তোমরা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মুক্ত হস্তের দান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তোমাদের শিক্ষা যদি কোন সজীব পদার্থ হয়, তবে চতুষ্পার্শ্বে একে এর সুবাস বিতরণ করতে হবে। চারিপাশের জনসাধারণকে কোন প্রত্যক্ষ সেবা দেবার জন্য তোমাদের দৈনিক কিছু সময় ব্যয় করা উচিত। সুতরাং তোমাদের কোদাল, ঝাড়ু আর ঝুড়ি ধরতে তৈরী থাকতে হবে। তোমাদের এই পবিত্র নগরীর অবৈতনিক ঝাড়ুদারের পদগ্রহণ করতে হবে। বই মুখস্থ করা নয়, এই হবে তোমাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শিক্ষা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৪-১১-১৯২৯

৫০। সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

উত্তরপ্রদেশ সফরকালে এলাহাবাদের ছাত্রদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি পেয়েছি।

"ইয়ং ইণ্ডিয়াতে সম্প্রতি আপনি গ্রামীন সভ্যতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে শিক্ষান্তে গ্রামে ফিরে যাওয়া সম্পর্কিত আপনার সুপারিশ আমরা সমর্থন করি। কিন্তু আপনার ঐ বক্তব্য আমাদের পথ প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমাদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম

* বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমক্ষে বক্তৃতা থেকে।

ছকে দেওয়া হোক। ভাসা ভাসা উপদেশ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দেশবাসীর জন্য সব কিছু করতে আমাদের উদগ্র বাসনা; কিন্তু ঠিক যে কোথায় সুরু করব তা আমরা জানি না এবং আমাদের পরিশ্রমের সম্ভাব্য ফল ও উপকার সম্বন্ধে মনে কি জাতীয় আশা পোষণ করব তাও জানা নেই। আপনি যে মাসিক ১৫৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা আয়ের কথা বলেছেন, তা পাবার উপায় কি? আমরা আশাকরি যে কোন ছাত্র সমাবেশে বা আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় এই বিষয়গুলির প্রতি আপনি দয়া করে আলোক সম্পাত করবেন।"

যদিচ একটি ছাত্রসমাবেশে বক্তৃতাকালে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং যদিও এই পত্রিকাতে ইতিপূর্বে ছাত্রদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ছকে দেওয়া হয়েছে, তবুও আর পুনরুক্তিতে দোষ নেই এবং বিশেষতঃ পূর্বে যে পরিকল্পনার আভাস দেওয়া হয়েছে তার বিশদ আলোচনার মূল্য আছে।

পত্রলেখকরা জানতে চাইছে যে শিক্ষা সমাপনান্তে তারা কি করতে পারে? আমি তাদের এই কথা বলব যে পড়তে পড়তেই বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের (এর ভিতর প্রত্যেকটি কলেজের ছাত্র পড়ে) গ্রামের কাজ করা উচিত। এইভাবে যেসব কর্মী আংশিক সময় দেবে, তাদের জন্য নিম্নরূপ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

ছাত্ররা তাদের সমগ্র অবকাশকাল গ্রামসেবায় নিয়োগ করবে। এর জন্য তারা চিরাচরিত পথে না চলে নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যাবে এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করবে। এই অভ্যাসের ফলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র গড়ে উঠবে এবং তারপর ছাত্ররা যখন সত্য সত্যই তাদের মধ্যে বাস করতে যাবে, তখন পূর্বপরিচয়ের জন্য তাদের নবীনাগন্তুক মনে করে সন্দেহ করার বদলে গ্রামবাসীরা তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে। দীর্ঘ অবকাশকালে ছাত্ররা গ্রামে থাকবে এবং তখন তারা বয়স্কদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবে এবং গ্রামবাসীদের সাফাইএর নিয়মগুলি শেখাবে ও অসুখের মোটামুটি কারণ সমূহের প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করবে। তারা তাদের ভিতর চরকার প্রবর্তন করে প্রতিটি কর্মহীন মুহূর্তের সদুপযোগ শেখাবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজ অবকাশের সদুপযোগ সম্বন্ধীয় ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। সময় সময় অবিমৃষ্যকারী শিক্ষকরা ছুটির পড়া দিয়ে থাকেন। আমার মতে সর্বাবস্থাতেই এ একটা অন্যায় প্রথা। অবকাশ হচ্ছে এমন একটা কাল যখন ছাত্রের মন বাঁধাধরা কাজ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তাকে এ সময় স্বাবলম্বন ও মৌলিক আত্মবিকাশের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমি যে ধরণের গ্রামসেবার কথা উল্লেখ করেছি, নিঃসন্দেহেই

তা শিক্ষার লঘু কার্যক্রম যুক্ত শ্রেষ্ঠ প্রমোদ ব্যবস্থা। পাঠ সমাপনান্তে সম্পূর্ণভাবে গ্রামসেবার্থ আত্মনিয়োগের জন্য নিঃসন্দেহে এ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতির উপায়।

সম্পূর্ণভাবে গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করার পরিকল্পনা এমন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। অবকাশকালে যা করা হয়েছিল এখন তাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গ্রামবাসীরাও আরও ভালভাবে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হবে। গ্রামজীবনের আর্থিক, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক —প্রতিটি দিক আমাদের স্পর্শ করতে হবে। নিঃসন্দেহে অধিকাংশক্ষেত্রে আর্থিক দুর্দশার অবিলম্বে সমাধানের উপায় হচ্ছে চরকা প্রবর্তন করা। প্রথম থেকেই গ্রামবাসীরা এর দ্বারা কিছু আয় করতে সুরু করে এবং দুষ্কার্য করার অবকাশ পায় না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্যক্রমে সাফাই ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও রোগ পরিচর্যা স্থান পাবে। এই ক্ষেত্রে ছাত্রকে নিজ হাতে কাজ করতে হবে। খাত খনন করে মলমূত্র এবং গ্রামের অন্যান্য আবর্জনা তার মধ্যে চাপা দিয়ে তাকে সারে পরিণত করা কূপ এবং পুষ্করিণী পরিষ্কার করা, ছোটখাটো বাঁধ দেওয়া এবং আবর্জনা ইত্যাদি অপসারিত করে গ্রামকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনুষ্য-বসবাসোপযোগী করা হবে এইসব কাজের লক্ষ্য। গ্রামসেবককে সামাজিক দিকটিও ধরতে হবে এবং অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ, মদ্য ও অন্যবিধ মাদক দ্রব্য এবং আরও বহুবিধ স্থানীয় কুসংস্কার বর্জন করার জন্য গ্রামবাসীদের উপর ধীরে ধীরে চাপ দিতে হবে। সর্বশেষে রাজনৈতিক দিক। এই ক্ষেত্রে কর্মীকে গ্রামবাসীদের রাজনৈতিক অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এবং সর্বাবস্থায় তাদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের মর্যাদা শিক্ষা দিতে হবে। আমার মতে এই হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গরূপ। কিন্তু গ্রামসেবকের কাজ এখানেই শেষ হয় না। গ্রামের শিশুদের প্রতি তার দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে ও বয়স্কদের জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করতে হবে। অবশ্য এই অক্ষর পরিচয় হচ্ছে সমগ্র শিক্ষাক্রমের একটি মাত্র অঙ্গ এবং শুধু পূর্বোক্ত বৃহত্তর আদর্শে উপনীত হবার সোপান।

আমি বলব যে এজাতীয় সেবাকার্যের উপযুক্ত গুণ হচ্ছে উদার হৃদয় এবং সন্দেহাতীত চরিত্র। এই দুটি গুণ থাকলে অন্যান্য যোগ্যতা আপনি হবে।

শেষ প্রশ্ন হচ্ছে খেতে পরতে পাবার। শ্রমিককে তার পরিশ্রমের দাম দিতে হবে। কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি প্রাদেশিক ভিত্তিতে জাতীয় সেবকদলের সংগঠন করছেন। অখিল ভারত চরকা সঙ্ঘও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠছে। ফলে চরিত্রবল বিশিষ্ট যুবকদের সামনে সীমাহীন সেবাকার্যের সুযোগ

আসছে। বেঁচে থাকার মত পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। তার বেশী দেবার ক্ষমতা নেই। একসাথে আত্মসেবা ও দেশসেবা দুই চলে না। দেশ সেবার কার্যক্রমে আত্মসেবার স্থান অতীব সীমিত। তাই জীবনযাত্রার মান এই নিতান্ত দরিদ্র দেশের সঙ্গতির উর্ধ্বে উঠতে পারে না। গ্রামসেবা করার নামই স্বরাজ স্থাপন করা। আর সব কিছু অলস মস্তিষ্কের কল্পনা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৬-১২-১৯২৯

৫১। কর্মপন্থা নয় ধর্মনীতি *

এই বিদ্যাপীঠের জন্ম অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং এর উদ্দেশ্যের কথা তো কয়েক বৎসর পূর্বেই আমি বলেছি—স্বরাজ অর্জন। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি ছাত্র এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে দেশের জন্য করণীয় সবকিছু করতে হবে ও স্বরাজ অর্জন করার জন্য দেশের যে নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে যাওয়া দরকার, তাদের তার মূর্ত প্রতীক হতে হবে। সময়কালে তারা যাতে স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে পারে তার জন্যই এর প্রয়োজন।

আমাদের আন্দোলন আত্মশুদ্ধির জন্য। কেউ কেউ মনে করেন যে রাজনীতির সঙ্গে নীতি শাস্ত্রের সম্পর্ক নেই। নেতৃবৃন্দের চরিত্র দিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। নৈতিকতার যে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে এ মনোভাব ইউরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্র একেবারে বর্জন করেছে। সময় সময় দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বিরাট পণ্ডিত হয় এবং বুদ্ধির বলে তারা কোন কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনে সমর্থ হন। হাউস অফ কমন্সের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র সন্দেহজনক হলেও তার প্রতি দৃকপাত করার প্রয়োজন ঘটে না। অনুরূপ ভাবদ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরাও সময় সময় রব তুলেছি যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি বা নেতৃবৃন্দের নৈতিকতা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্পূর্ণ পৃথক পথ গ্রহণ করে আমরা ঘোষণা করলাম যে, যেহেতু কংগ্রেস নিজ অভীষ্টে উপনীত হবার জন্য সত্য এবং অহিংসাকে একমাত্র সাধন বলে গ্রহণ করেছে, তাই এমন কি রাজনৈতিক জীবনেও আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন।

আজ অবশ্য এ ভাবধারার প্রকাশ্য বিরোধী বিশেষ কেউ নেই, তবে এমন

* আহমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ।

অনেকে আছেন যাঁরা গোপনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে রাজনীতির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়। এইজন্য আমাদের অগ্রগতি এত মন্থর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিমাণ শূন্য। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ব্রত অনুসারে কাজ করলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হবার জন্য নয় বৎসর লাগার কথা নয়। স্বরাজের অর্থ যদি আমাদের সভ্য করা ও সে সভ্যতাকে পরিশুদ্ধ ও স্থিতিবান করা না হয়, তবে তার কোন মূল্য নেই। আমাদের সভ্যতার মূল কথাই হচ্ছে, কি ব্যক্তিগত কি জনজীবনে, আমরা নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিই এবং বিদ্যাপীঠের অন্যতম কার্য আমাদের সভ্য করে তোলা হওয়ায় স্বরাজের সংগ্রামে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সর্বাধিক ত্যাগ আশা করা হয়।

আমি চাই যে তোমরা সকলে আমাদের এই নীতির খুঁটিনাটি দিকগুলি হৃদয়ঙ্গম কর। তোমরা যদি ভাব যে সত্য ও অহিংসা কংগ্রেসের ধর্মনীতি নয়—কর্মপন্থা, তাহলে আমি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব তা জানি না। তবে তোমাদের যদি মনে হয় যে ও তোমাদের ব্যক্তিগত ধর্মনীতি, তবে আমার আর এর সবিস্তার বর্ণন করার প্রয়োজন নেই। কেউ বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত, এইটুকুই তার সত্য ও অহিংসার পথে চলার স্বপক্ষে যথেষ্ট নিশ্চয়তা হওয়া উচিত। সুতরাং এই জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোক্তা এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রত্যেকটি ব্যক্তির সর্ব-প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের যাবতীয় কার্যকলাপ এই ধর্মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, এই প্রশ্ন নিজেদের করা। সত্য এবং অহিংসাকে শুধু যদি কর্মপন্থা মেনে নিয়ে তোমরা চল, তবে এমন একদিন আসবে, যেদিন তোমরা এই কর্ম-পন্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রলুব্ধ হবে। উদাহরণ স্বরূপ আমার বন্ধু আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা ধরা যেতে পারে। সত্য এবং অহিংসাকে তাঁরা শুধু কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং একথা তাঁরা কোনদিন গোপন করেন নি। তাঁরা বরাবরই বলতেন যে একে তাঁরা ধর্মনীতি বলে গ্রহণ করতে অক্ষম। এই ধারায় চিন্তাকারী আরও অনেকে আছেন এবং নিঃসন্দেহে দেশসেবার কার্যে তাঁদের যথাযোগ্য স্থানও আছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ, তোমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু যথেষ্ট নয়। উভয় নীতিকে তোমাদের ধর্মনীতিরূপে গ্রহণ করতে হবে। এ তোমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। সবাই যদি আহিংসাকে কর্মপন্থা মনে করে এবং আমি শুধু এর একমাত্র ধর্মনীতি রূপের বিশ্বাসী থেকে যাই, তাহলে আমরা অতি সামান্য অগ্রগতি করতে পারব। তাই আর একবার আত্মানুসন্ধান করে আমরা যেন মনে মনে স্থির করে নিই যে স্বরাজ অর্জনের জন্য কোন অবস্থাতেই আমরা অসত্য ও হিংসার শরণ নেব না। তাহলে

সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

সত্য এবং অহিংসার ধর্মনীতি হতে গঠনমূলক কার্যক্রমের জন্ম। এর দফাওয়ারী আলোচনা করা যাক। যতদিন হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানরা হিন্দুর বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করবে, ততদিন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অসম্ভব। কংগ্রেসের লাহোর প্রস্তাব এই নীতি অনুযায়ী রচিত হয়েছিল। শিখরা শুধু ন্যায়-বিচার চেয়েছিল; কিন্তু তোমরা প্রস্তাবে লক্ষ্য করে দেখে থাকবে যে আরও বহু-দূর অগ্রসর হয়ে শুধু শিখদেরই নয়, ভারতের সকল সম্প্রদায়কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এরপর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা নাও। এই সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ শারীরিক অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বলেন, কেউ বা আবার কূপ, বিদ্যালয় ও মন্দির আদিতে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। কিন্তু তোমাদের এর চেয়েও দূরে যেতে হবে। তাদের তোমরা নিজেদেরই মত ভাল-বাসবে যাতে তারা তোমাদের দর্শনমাত্রই বুঝতে পারে যে তোমরা তাদেরই একজন। তাহলেই শুধু তোমরা গঠনমূলক কার্যক্রমে তাদের সহযোগিতা পাবে। তার আগে নয়।

মাদক বর্জন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। খাদির ব্যাপারেও তাই। কিন্তু তার কথা কি এখন আলোচনা করা প্রয়োজন? এ কার্যক্রম এত বাস্তব এবং স্থূল দৃষ্টিগোচর যে, যারা দৈনিক কাজের দিনলিপি রাখে, তারা প্রত্যহ জাতীয় সম্পদের কতখানি বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে তার পরিষ্কার হিসাব দিতে পারবে। এই ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা যদি এই কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হতাম, তাহলে আজ পর্যন্ত অনেক-খানি অগ্রগতি করে ফেলা যেত। আমাদের গত বৎসরের যৎসামান্য কাজ সত্বেও আমরা কি করতে সমর্থ হয়েছি, বিদেশী বস্ত্র বয়কট কমিটি সে কথা আমাদের জানিয়েছে। আমার মতে আমরা যা করেছি তা নগণ্য; কিন্তু প্রত্যেকে আমরা যদি দৃঢ় ইচ্ছা ও সক্রিয় বিশ্বাস নিয়ে একাজ করতাম, তাহলে এর পরিণাম কি হত? আমাদের সৎ ও যোগ্য কর্মীর বড়ই অভাব। কিন্তু আমি জানি যে তোমাদেরই মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাদের মনে আগ্রহের স্বল্পতার কারণে যোগ্যতারও অভাব ঘটছে। আমাদের জড়তা ও অবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং এরপর যোগ্যতা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এসে যাবে।

কি করতে হবে আমি তা তোমাদের বলেছি। এরপর কি করা উচিত নয় সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু বলব। সাহিত্য চর্চা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা, ভাষাতত্ত্বের অন্বেষ্টাবৃত্তি, ইংরাজী, সংস্কৃত এবং নানারূপ চারুকলার পাঠ না হয়

কিছুদিন মুলতুবী থাক। আমাদের প্রতিটি জাতীয় বিদ্যালয়কে জাতির আয়ুধ অর্থাৎ গঠনমূলক কাজের কারখানায় পরিণত করা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা আদি আমি যেসব বড় বড় কথার উল্লেখ করেছি, তার সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, দেশে আজ এমন সব লক্ষ লক্ষ ছেলে রয়েছে, যারা কোন শিক্ষাই পায় না। অন্তত যতদিন না স্বাধীনতা অর্জিত হয়, ততদিন আমরা কেন এসব ছাড়া চলতে পারব না ?

সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছে। এ কাজের জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কি ? তোমরা সকলেই সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এ কাজের ভার নিতে পার। বিগত মহাসমরের সময় ইউরোপের ছাত্ররা কি করত তা স্মরণ কর। আমরা কি তাদের মত আত্মত্যাগে প্রস্তুত ? আমাদের হৃদয়ে যদি এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া অবধি আমরা শান্তিতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও গ্রহণ করব না, তাহলে আমরা চলনে-বলনে, কাজেকর্মে গঠনমূলক কার্যক্রমকে মূর্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করব।

তোমাদের কাছে কি আশা করা হয়, সে সম্বন্ধে সর্বশেষে আমি কিছু বলব। শুদ্ধ হবার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন মৃত্যুভয় বিসর্জন করি। জনৈক ইংরেজ সম্প্রতি বলেছেন যে যদিও গান্ধী মনে করেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলে ভারতের অবস্থার কোনরকম অবনতি ঘটবে না, তবুও তাঁর মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে তাঁর দেশবাসী (ইংরেজ) ভারতের মাটি ছাড়ামাত্র আর একটিও ধনীর সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে না বা কোন নারীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে না। এ থেকেই আমাদের মত ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর কি হীন ধারণা, তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এর ব্যত্যয় হবে কি করে ? আজ আমরা এমন ভয়-তাড়িত যে নিজ সম্পদ ও সম্মান রক্ষার্থ আমাদের ভাড়াটে লোক রাখতে হয়। মৃত্যুভয় ত্যাগ করা মাত্র আমরা এই শোচনীয় দশা থেকে মুক্তি পাব। বিদ্যাপীঠের ছাত্রী প্রতিটি যুবতীর কাছে আমি আশা করি যে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে যথোপযুক্ত নৈতিক বল সংগ্রহ করতঃ তারা যেন দুষ্ট লোকের স্পর্শেরও প্রতিরোধ করে। আমি চাই যে তোমরা সকলে মরণের ভয় বিসর্জন দাও। ফলে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিত হবার সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম তাতে এই বলে উল্লিখিত হবে যে এরা হিংসার শরণ না নিয়ে হিংসার প্রতিরোধ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। সে হিংসার অনুষ্ঠাতা কে তা তারা বিচার করে নি। আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করার শক্তি অপরিহার্য নয়, মরার ক্ষমতা থাকলেই হল। মানুষ যখন মৃত্যু আলিঙ্গনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়, তখন তার মনে হিংসা প্রতিরোধের

ইচ্ছাও জাগে না। বরং আমি স্বপ্রকাশ প্রতিজ্ঞা স্বরূপ একথা বলতে পারি যে হননেচ্ছা মরণ বরনেচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত স্থিতি। আর ইতিহাস এমন সব ব্যক্তিদের উদাহরণে পূর্ণ যারা সাহস ও সহানুভূতি ভরা বক্ষে মৃত্যুর কণ্ঠালিঙ্গন করার ফলে তাদের চূড়ান্ত বিরোধীদেরও হৃদয় পরিবর্তন করেছেন।

* * *

বক্তৃতা শেষে একটি প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী বললেন :—

"তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আগামী সংগ্রামে ছাত্রদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি এত সচেতন হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন স্কুল-কলেজ বয়কট করার জন্য চাপ দিইনি? আমি বলব এর অনুকূল পরিবেশ নেই। তবে তোমরা নিশ্চয় এই প্রত্যাপবাদ দেবে না যে অনুকূল আবহাওয়া যখন নেই তখন এই কটি ছেলেই বা কি করবে? এরা অনেক কিছু করতে পারে। নিজ আদর্শের প্রতিবাদের যদি অধিকতর নিষ্ঠা থাকত, তবে তারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত যাতে সরকারী স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিজ বিদ্যায়তন বর্জন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। ইতিপূর্বে তারা যা করতে পারেনি, এত দিনে তা করা চলতে পারে।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৩-১-১৯৩০

৫২। প্রার্থনা সম্বন্ধে আলোচনা *

তোমরা আমাকে প্রার্থনার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে বলায় আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি যে প্রার্থনাই ধর্মের মূল এবং নির্যাস স্বরূপ। সুতরাং প্রার্থনা মানব জীবনের মুখ্য কৃত্য হওয়া উচিত, কারণ ধর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। অবশ্য এমন কেউ কেউ আছেন, যারা যুক্তিবাদের আত্মশ্লাঘা পরবশ হয়ে বলেন যে ধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ কথা হচ্ছে নাসিকা বিনা নিশ্বাস গ্রহণের মত। যুক্তি, সহজ প্রবৃত্তি বা কুসংস্কার—যে কোন ভাবেই হোক না কেন, মানুষ ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে কোন না কোন রকমের সম্বন্ধ স্বীকার করে। চূড়ান্ত অজ্ঞবাদী বা নাস্তিকও সুনীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং মানে যে সুনীতির বিধান পালনে ভাল ও লঙ্ঘনে খারাপ হয়। বিখ্যাত নাস্তিক্যবাদী ব্রাডলও সর্বদা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস প্রকাশ করার উপর জোর দিতেন। এই ভাবে সত্য কথনের জন্য তাঁকে বহু পীড়ন সহ্য করতে হ'ত; কিন্তু তিনি এতে আনন্দ পেতেন ও বলতেন যে সত্যই স্বয়ং সত্যের পারিতোষিক। সত্য

* আহমেদাবাদের ছাত্র সম্মেলনের বক্তৃতা

পালন দ্বারা যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। এ আনন্দ অবশ্য পার্থিব নয়, ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে সংযোগের ফলেই এর উৎপত্তি। এই জন্যই আমি বলেছি যে ধর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, এমন কি ধর্মের যে নিন্দা করে সেও না।

এর পর দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রার্থনা মানব জীবনের মূল; কারণ এই হচ্ছে ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রার্থনা হয় আবেদন মূলক নচেৎ ব্যাপকার্থে অন্তর্লোকের মিলন, উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিন্ন। প্রার্থনা যখন আবেদন মূলক হয়, সে আবেদন হওয়া উচিত আত্মার পরিশুদ্ধি ও চতুর্দিকস্থ অজ্ঞানতা নাশ ও তিমির জাল থেকে আত্মাকে মুক্ত করার জন্য। অতএব নিজের ভিতর অনুপমের জাগরণ যার কাম্য, তাকে প্রার্থনার শরণ নিতেই হবে। কিন্তু প্রার্থনা তো স্বরযন্ত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলন মাত্র নয় বা এ শুধু নিষ্প্রাণ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি নয়। হৃদয় আলোড়িত করতে না পারলে যতই রাম নাম করা যাক না কেন, তার মূল্য নেই। প্রার্থনায় হৃদয় বিহীন শব্দ মালার চেয়ে শব্দ বিহীন হৃদয় অধিকতর কাম্য। যে ক্ষুধার কারণে প্রার্থনার জন্ম, প্রার্থনাকে তার তৃপ্তি বিধান করতে হবে। ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন হৃদ্যতা সহকারে পরিবেষিত ভোজ্যে তৃপ্তি বোধ করে, উপবাসী আত্মাও তেমনি হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টিকারী প্রার্থনায় সন্তুষ্টি বোধ করবে। নিজের এবং আমার সঙ্গী সাথীদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমাদের বলছি যে, প্রার্থনার যাদুর পরিচয় যে ব্যক্তি পেয়েছে, সে খাদ্য ব্যতিরেকে একাদিক্রমে একাধিক দিন থাকতে পারে, কিন্তু প্রার্থনা ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচবে না। কারণ প্রার্থনা ছাড়া অন্তর্লোকের শান্তি নেই।

কেউ হয়ত বলবে যে যদি তাই হয়, তাহলে তো আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই প্রার্থনা করছি। এ সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই; কিন্তু আমরা নিত্য ভ্রান্তিকারী মরণশীল মানব বলে এমন কি তিলেকের তরে অন্তর্লোকচারী হতে পারি না। এমতাবস্থায় সেই অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে চির মিলন অসম্ভব। এই জন্য আমরা এমন কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে নিই, যখন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমরা ভব-বন্ধন ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হই এবং সেই সময়টুকুর জন্য এই রক্ত মাংসের পিণ্ডের ঊর্ধ্বে থাকার আন্তরিক চেষ্টা করি। সুরদাসের নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি তোমরা শুনে থাকবে:

মো সম কোন কুটীল খল কামী।
জেহি তন দিয়ো তাহি বিসরায়ো,
এইসো নমক হারামী॥

(অর্থাৎ আমার মত কুটিল, খল ও কামুক আর কেই বা আছে? যাঁর কৃপায় এই শরীর পেয়েছি, তাঁকেই ভুলে বসে আছি, এতই কৃতঘ্ন আমি।)

এ হচ্ছে সেই স্বর্গীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য হৃদয়ের আকুল আকূতি। আমাদের বিচারে তিনি ছিলেন মহাপুরুষ; কিন্তু নিজেকে তিনি পাপীর অধম মনে করতেন। আধ্যাত্মিক লোকে তিনি আমাদের বহু যোজন অগ্রগামী ছিলেন; কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের কাছ থেকে তিনি নিজেকে এতটা বিচ্ছিন্ন মনে করতেন যে হতাশা ও আত্মগ্লানিতে তিনি ঐ কাতর আর্তনাদ তুলেছিলেন।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছি এবং আলোচনা প্রসঙ্গে প্রার্থনার মূল তত্ত্বের কথাও আমি চর্চা করেছি। আমাদের জন্য অপরের সেবার জন্য এবং সকলে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ না হলে এ কর্তব্য সুসম্পাদিত হওয়া কঠিন। মানব হৃদয়ে নিরন্তর সুরাসুরের সংগ্রাম চলেছে এবং যে ব্যক্তি নিজ জীবনের ভরসাস্থল প্রার্থনারূপী নোঙরের আশ্রয় পায়নি, তার অসুর শক্তির কবলে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। প্রার্থনাকারী মানব নিজেকে এবং সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে শান্তিতে থাকবে এবং এই দুনিয়ায় যে প্রার্থনাশীল হৃদয় ছাড়াই বিচরণ করে, সে মনে মনে ক্ষত বিক্ষত হবে এবং বিশ্বজগতকেও দয়নীয় করে তুলবে। সুতরাং মৃত্যুর পর মানবের উপর প্রভাব বিস্তারের কথা বাদ দিলেও ইহলোকেই প্রার্থনা মানুষের কাছে অমূল্য সম্পদ। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে শৃঙ্খলা, শান্তি এবং স্থৈর্য আনার একমাত্র সাধন হচ্ছে প্রার্থনা। আশ্রমের আমরা যে সব বাসিন্দা এখানে সত্যের সন্ধানে আসি ও যারা সত্যানুভূতির জন্য প্রার্থনার অপরিহার্যতার কথা বিশ্বাস করে, তারাও এখনো প্রার্থনাকে অত্যাবশ্যক ব্যাপার বলে গণ্য করে না। এর প্রতি আমরা অন্যান্য বিষয়ের মত নজর দিই না। অকস্মাৎ আমি একদিন এই মহাসুপ্তি থেকে জেগে উঠলাম এবং বুঝতে পারলাম যে আমার এই কর্তব্যের প্রতি আমি গুরুতর অবহেলা করেছি। এইজন্য আমি কঠোর অনুশাসন মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করলাম এবং এর ফল খারাপ হবার পরিবর্তে ভালই হয়েছে। এর কারণ অতীব স্পষ্ট। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি নজর দিলে অন্যান্য বিষয় আপনিই ঠিক হয়ে যায়। চতুর্ভুজের একটি কোণ ঠিক করে ফেল, তাহলে বাকি কোণগুলি আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

সুতরাং তোমাদের দিনের সূচনা হোক প্রার্থনা দিয়ে এবং সে প্রার্থনাকে এমন প্রাণবন্ত কর যে তা যেন সায়ংকাল পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকে। প্রার্থনার দ্বারা সমগ্র দিবসের কর্মসূচীর উপর সমাপ্তির যবনিকা টেনে দাও এবং তাহলে দেখবে যে তোমাদের রাত্রি হবে শান্তিপূর্ণ—দুঃস্বপ্ন মুক্ত। প্রার্থনার পদ্ধতি নিয়ে দুশ্চিন্তা

কোরো না। এর রূপ যাই হোক না কেন, এ যেন শুধু আমাদের সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ সাধন করতে পারে। শুধু এইটুকু স্মরণ রেখো যে এর পদ্ধতি যে রকমই হোক না কেন, প্রার্থনা মন্ত্র যখন কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, আমাদের হৃদয় যেন সেই সময় ইতস্তত সঞ্চারশীল না হয়।

আমার বক্তব্য যদি তোমরা প্রণিধান করে থাক, তা হলে তোমাদের ছাত্রাবাসাধ্যক্ষকে উপাসনায় অনুপ্রাণিত না করা পর্যন্ত তোমরা শান্তি পাবে না এবং একে বাধ্যতা মূলক করে ছাড়বে। স্বতঃ আরোপিত সংযম বাধ্য-বাধকতা নয়। যে সংযম-বন্ধন থেকে মুক্তি অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারের পথ গ্রহণ করবে, সে হবে ইন্দ্রিয়ের দাস এবং যে নিজেকে নিয়ম কানুন ও সংযমের বাঁধনে বাঁধবে, সে তার আত্মার বন্ধন মোচন করবে। সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহ নক্ষত্র সহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পদার্থ একটি নিয়ম বন্ধনে চলে। এই নিয়মের বাঁধন ছাড়া পৃথিবী এক মুহূর্তও চলত না। তোমাদের মত যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে নিজ সাথীর সেবা, তারা যদি কোন না কোন অনুশাসনের বাঁধন স্বীকার না কর, তা হলে তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এবং প্রার্থনা হচ্ছে একটি অতীব প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অনুশাসন। আমাদের সঙ্গে পশু কুলের পার্থক্য হচ্ছে শৃঙ্খলা ও সংযমে। আমরা যদি চতুষ্পদ হয়ে চলার পরিবর্তে উন্নত শির হয়ে বিচরণ করতে চাই, তাহলে আমাদের অনুশাসন ও সংযমের মহত্ত্ব বুঝে স্বেচ্ছায় নিজ জীবনে একে প্রয়োগ করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৩-১-১৯৩০

৫৩। পথ নির্দেশ

সময় সময় শুনি যে জাতীয় বিদ্যালয় সমূহ, বিশেষ করে গুজরাট বিদ্যাপীঠ বাবদ ব্যয়িত অর্থ বৃথা গেছে। আমার মতে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের দ্বারা গুজরাট বিদ্যাপীঠ স্বীয় প্রতিষ্ঠাতার আশা এং দাতৃবর্গের বিশ্বাস আশাতিরিক্ত ভাবে রক্ষা করেছে। কারণ বিদ্যাপীঠ এখানে শিক্ষাধীন ষোল বছরের কম ছেলেদের জন্য ছাড়া ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় পাঠ্যক্রম বিসর্জন দিয়েছে। পনের বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক ছাত্র ও শিক্ষকরা স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন এবং এযাবৎ শিক্ষক সহ চল্লিশজন ছাত্র কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন, যাদের জন্য প্রয়োজন অনুভব করা হচ্ছে, তাদের এক পক্ষকাল সত্যাগ্রহ সম্বন্ধীয় জরুরীকালীন বিশেষ বর্গে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ছাত্র ও শিক্ষকরা যে রকম তড়িৎ গতিতে কাজ করেছেন, আমি সেজন্য তাদের অভিনন্দিত করছি। আমি একথাও উল্লেখ করতে পারি যে

এদের মধ্যে কুড়ি জন যাত্রাপথে আমার সঙ্গী। দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এরা আশীজন তীর্থযাত্রীর আগে আগে তাদের ব্যবস্থাপত্র করতে ও গ্রামবাসীদের সাহায্যদানের জন্য পাদ-পরিক্রমা করছে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই আশী জন গ্রেপ্তার না হলে তারা আইন অমান্য করবে না এবং এদের কারাবরণের পর অবিলম্বে তারা এদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

আমি নিঃসন্দেহ যে প্রতিটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অসহযোগের দাবীতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই গুজরাট বিদ্যাপীঠের মহান উদাহরণের অনুকরণ করবে। আমি এও আশা করি যে পুরোপুরি সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও এপথে চলবে। এযুগের প্রতিটি বিপ্লবে ছাত্ররা ছিল পুরোভাগে ; এ বিপ্লব শান্তিপূর্ণ বলে ছাত্রদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় হওয়া উচিত নয়।

গুজরাট বিদ্যাপীঠের আদর্শ হচ্ছে 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।' এর অর্থ হচ্ছে : জ্ঞান তাকেই বলে যা মুক্তি প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। বড়র ভিতর যেমন ছোটর স্থান আছে, তেমনি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিতর জাতীয় বা আধিভৌতিক স্বাধীনতাও সমাবিষ্ট। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রাপ্ত জ্ঞান যেন অন্তত মানুষকে সেই পথ দেখায় ও তদ্রূপ স্বাধীনতার পথে তাদের নিয়ে চলে।

একান্ত পল্লবগ্রাহী দর্শকেরও এটা চোখে পড়বে যে সত্যাগ্রহ তীর্থযাত্রীদের দৈনিক কার্যসূচীই স্বয়ং নিখুঁত একটি শিক্ষাক্রম। সত্যাগ্রহী অভিযাত্রী দল সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-বন্ধন-মুক্ত ভাঙ্গনের নেশায় উন্মত্ত ভাবে ইতস্তত বিচরণকারী হিংস বিদ্রোহী বাহিনী নয়। এরা সুসংগঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহের বিজয় কেতন উড্ডীনকারী একদল আত্মসংযমী মানব। এই পীড়নের কবল থেকে মুক্তিকামী চূড়ান্ত আত্মনিগ্রহী ও যাত্রাপথে সত্য ও অহিংস পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের বাণী প্রচারকারী একদল বীর সৈনিক এরা। দেশের বর্তমান অবস্থায় যাকে সর্বাধিক পরিমাণ আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা বলা চলতে পারে, নিজ পুত্র কন্যাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য উৎসর্গ করায় কোন পিতার বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বোধ করা উচিত নয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ ও এখনকার আহ্বানের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দিই। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খালি করে জাতীয় প্রতিষ্ঠান খাড়া করার ডাক দেওয়া হয়েছিল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। এ ছিল প্রস্তুতির আহ্বান। আজকের ডাক হচ্ছে চূড়ান্ত সংঘর্ষ অর্থাৎ ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার জন্য। সে শুভ অবসর হয়ত আসতে পারে আবার নাও আসতে পারে। এযাবৎ যারা

স্বাধীনতার জন্য সব চেয়ে বেশী গলা ফাটিয়েছে, তারা যদি এখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়, তবে সে লগ্ন হয়ত নাও আসতে পারে। নুন যদি তার স্বাদ হারিয়ে ফেলে, তবে আর লবণাক্ত করা হবে কি দিয়ে? শুধু অর্থহীন শূন্যগর্ভ-ধ্বনি উচ্চারণ করা নয়, কোন সংকট থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রোচিত নীরব, সম্মানজনক এবং অদম্য কর্ম প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। এমনও হতে পারে যে আত্মত্যাগ এবং বিশেষ করে অহিংসায় ছাত্রদের বিশ্বাস অতি ক্ষীণ। স্বভাবতই তারা তাহলে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসবে না এবং তাদের এভাবে আসা উচিতও নয়। সন্ত্রাসবাদীদের মত তাদের তাহলে একান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে যে কার্যক্ষেত্রে অহিংসা কি করতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে বীরোচিত কাজ হচ্ছে হয় সর্বান্তঃকরণে এই অহিংস বিদ্রোহে আত্মনিয়োগ করা, আর নয় নিরপেক্ষ থাকা। ইচ্ছা হলে তারা ঘটনা প্রবাহের সমালোচক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তারা যদি এই আন্দোলনের স্রষ্টাদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নিজেদের মনোমত কাজ করে চলে বা তাঁদের কর্মসূচীর বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে তারা এ আন্দোলনকে ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তবে একথা আমি জানি যে, এখন যদি আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্ণতম বিকাশ না হয়, তবে আগামী এক পুরুষে আর তা হবে না। ছাত্রদের সামনে পথরেখা স্পষ্ট। তারা পথ বেছে নিক। বিগত দশ বৎসরের জাগরণ তাদের পূর্বাবস্থায় রাখেনি। তারা এবার শেষ দীক্ষা গ্রহণ করুক।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২০-৩-১৯৩০

৫৪। আত্মমর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে

কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমি এই মর্মে চিঠি পেয়েছি যে শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ স্কুল-কলেজে প্রত্যাবর্তনেচ্ছুক সংগ্রামকারী ছাত্রদের উপর নানারকম সর্ত আরোপ করছেন। এই জাতীয় একটি নির্দেশ নামার নকল থেকে জানতে পারলাম যে অভিভাবকদের এই মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তাঁদের সন্তান রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবে না। এই সব পত্রলেখকরা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে এই সব সর্তের সঙ্গে কি চুক্তির (গান্ধী আরউইন চুক্তি—অনুবাদক) সঙ্গতি আছে?

এখনকার মত সে প্রসঙ্গের অবতারণা না করে বিনা দ্বিধায় আমি বলব যে বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা অবশিষ্ট থাকলে অভিভাবক বা ছাত্ররা এ জাতীয় সর্ত মঞ্জুর করবেন না। সরকারী শিক্ষা ও অভিজ্ঞান পত্রের মূল্য সম্বন্ধেই যেখানে সন্দেহ

বিদ্যমান, সেখানে আত্মাকে এই ভাবে কুণ্ঠিত করায় অভিভাবক বা ছাত্রদের কি লাভ ? ছাত্রদের জন্য জাতীয় শিক্ষালয়গুলির দ্বার উন্মুক্ত। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি তাদের মনোমত না হলে ঘরেই তারা পড়াশুনা করতে পারে। শুধু স্কুল-কলেজে গেলেই জ্ঞানার্জন হয়—এ কথা মনে করা প্রচণ্ড কুসংস্কার। স্কুল-কলেজ সৃষ্টির পূর্বে এই পৃথিবীতে অলোকসামান্য মেধা সম্পন্ন ছাত্রের অপ্রতুলতা ছিল না। স্বাধ্যায়ের মত মহান ও স্থায়ী জিনিস আর কিছু নেই। স্কুল আর কলেজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের শুধু জ্ঞানের বাহ্যাড়ম্বরটুকুর মাননীয় অধিকারীর মর্যাদা দেয়। জ্ঞানরূপী ফলের পরিত্যাজ্য খোসাটুকু কেবল আমরা গ্রহণ করি। অহেতুক আমি স্কুল-কলেজের নিন্দা করতে চাই না। ক্ষেত্র বিশেষে ঐ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমরা এ নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছি। এগুলি জ্ঞানার্জনের বহুবিধ মাধ্যমের ভিতর একটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৫-৬-১৯৩১

৫৫। গর্হিত আচরণ

বোম্বাইএর অস্থায়ী গভর্ণর স্যার আর্নেস্ট হটসনকে হত্যা করার প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বাধিক কলঙ্কজনক বিষয় হচ্ছে এই যে, যখন মহামান্য গভর্ণর কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিরূপে কলেজ পরিদর্শন করছিলেন, তখন কলেজেরই জনৈক ছাত্র এই কাজ করেছিল। এ হচ্ছে গৃহস্বামী কর্তৃক নিজ গৃহে অতিথিকে আঘাত করার মত। সমগ্র বিশ্বে এই প্রথা সম্মান পেয়ে আসছে যে পরম শত্রুও যদি নিজ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে, তাহলে তাকে সকল প্রকার বিপদপাতের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং ছাত্রটির আচরণ নিতান্ত গর্হিত এবং এর মধ্যে প্রশংসনীয় কিছুই নেই।

অস্থায়ী গভর্ণর মহোদয় দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে গেছেন এবং ভারত ও বিশেষতঃ ছাত্রজগতও এর ফলে বেঁচে গেছে। স্যার আর্নেস্ট হটসন এবং সমগ্র জাতিকে আমার অভিনন্দন জানাই।

হিংস পন্থায় বিশ্বাসীরা এই আনন্দজনক বিয়োগান্তক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে ভাল হয়। একে আনন্দজনক এই জন্য বলছি যে আততায়ী ছাড়া আর কারও এতে ক্ষতি হয় নি।

তার কষ্টভোগ শেষ হয়েছে না এখনও তার পালা চলছে ? অথবা সে কি নিজেকে মস্ত বড় বীর মনে করে আত্মপ্রতারণা করছে ? যাই হোক না কেন, এই

ঘটনা যেন ছাত্রদের চোখ খুলতে সমর্থ হয়। স্কুল বা কলেজ আসলে একটি পবিত্র স্থান এবং অন্যায় ও অপবিত্র কার্যের অনুষ্ঠান এখানে হওয়া অনুচিত। স্কুল-কলেজ চরিত্র গঠনের কারখানা। অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই জন্য সেখানে পাঠান যে তারা যেন মানুষ হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে যদি যে কোন রকমের বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে সক্ষম সম্ভাব্য আততায়ী বলে সন্দেহ করা হয়, তবে সে অবস্থা হবে জাতির দুর্দিনের সূচক।

ভগত সিং-এর পূজা দেশে বহু অকল্যাণ করেছে এবং এখনও করছে। ভগত সিং-এর চরিত্র সম্বন্ধে আমি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে অনেক কিছু শুনেছিলাম। এ ছাড়া তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা মকুব করার জন্য যে প্রচেষ্টা হয় তার সঙ্গেও আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম বলে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করাচী কংগ্রেসের এ সম্বন্ধীয় সতর্ক অথচ ক্ষমতা রক্ষাকারী প্রস্তাবের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে দেখছি যে সে সতর্কবাণী বৃথা গেছে। ভগত সিং-এর কাজেরই পূজা করা হচ্ছে। যেন বিবাদ বিসম্বাদ করা ভাল। ফলস্বরূপ যেখানে যেখানে এই উন্মত্ত পূজা চলছে, সেখানেই ভণ্ডামি এবং অধঃপতনের সূচনা দেখা দিচ্ছে।

দেশে কংগ্রেসের শক্তি আছে। আমি কিন্তু কংগ্রেসীদের সতর্ক করে দিতে চাই যে, তারা তাদের উপর ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করে চিন্তায়, কথায় বা কাজে যদি ভগত সিং বৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহলে অবিলম্বেই কংগ্রেস তার সকল আকর্ষণ হারাবে। তাঁদের অধিকাংশ যদি কংগ্রেসের সত্য ও অহিংসার কর্মপন্থায় বিশ্বাসী না হয়, তবে কংগ্রেসের সংবিধানের প্রথম ধারার পরিবর্তন করলেই হয়। আমরা যেন কর্মপন্থা ও ধর্মনীতির পার্থক্য বুঝে নিই। কর্মপন্থার পরিবর্তন হতে পারে; কিন্তু ধর্মনীতির হেরফের হয় না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় উভয়ের গুরুত্বই সমান। তাই অহিংসাকে যারা শুধু একটি কর্মপন্থা বলে মনে করেন, তাঁরা যেন গর্হিত আচরণের দোষে অভিযুক্ত না হয়ে কংগ্রেসের সদস্যতাকে হিংসাবৃত্তির আবরণ হিসেবে ব্যবহার করতে না পারেন। আমি কিছুতেই এই বিশ্বাসমুক্ত হতে পারছি না যে আমাদের স্বরাজাভিমুখী প্রগতির পথে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাধা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের অভাব। এই হত্যা প্রচেষ্টার সৌভাগ্যজনক ব্যর্থতা যেন আমাদের চক্ষুরুন্মীলন করে।

কিছু উগ্র স্বভাব যুবক বা হয়ত অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই এই বলে তর্ক করবেন, "কিন্তু গভর্ণরের মসীলিপ্ত অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন। অপরাধী কি স্বয়ং স্বীকার করে নি যে সোলাপুরের ঘটনা এবং একজন ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী ডিঙ্গিয়ে তাঁর অস্থায়ী গভর্ণর হওয়া—এই দুই কারণে সে গুলি চালিয়ে-

ছিল।" তাঁদের আমি বলব, "১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন সত্য ও অহিংসাকে কংগ্রেসের কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করি, তখনই আমরা এসব কথা জানতাম। স্যার আর্নেস্ট হটসনের চরম শত্রু পর্যন্ত তাঁর উপর যেসব দোষারোপ করেছে, তখন তার চেয়েও কলঙ্কজনক ঘটনার কথা আমরা পরিজ্ঞাত ছিলাম। বহু আলাপ আলোচনার পর কংগ্রেস স্বেচ্ছায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সরকারের দুষ্কৃতি এবং হিংস আচরণের জবাব আমাদের তরফ থেকে অধিকতর মাত্রায় হিংসার অনুষ্ঠান নয়। বরং আমাদের পক্ষে হিংসার জবাব অহিংসায় এবং অন্যায়ের প্রত্যুত্তর সত্য দিয়ে দেওয়াই অধিকতর লাভদায়ক। কংগ্রেস এও বুঝেছিল যে চূড়ান্ত রকমের অযোগ্য শাসকও মনে প্রাণে খারাপ নয়। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারা যে পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে, এরা তারই শিকার। আমরা আরও দেখেছি যে এই পদ্ধতি এমন কি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নষ্ট করে ফেলেছে। সুতরাং এই পদ্ধতি বিলুপ্ত করার জন্য আমরা অহিংস কর্মপন্থা গ্রহণ করলাম। দশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সংশয়াকুলচিত্তে অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও অহিংস কর্মপন্থা মোটামুটি ভাল ভাবেই তার অভীষ্ট সাধন করেছে এবং আমরা তীরের সন্নিকটে সমুপস্থিত। স্যার আর্নেস্ট হটসনের অতীত ইতিহাস যতই কালিমাযুক্ত হোক না কেন, এই হত্যা প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাসঘাতকতারূপী উভয়মুখী অপরাধের সমর্থনে সে যুক্তি একেবারে অবান্তর এবং এ কথায় অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হতে পারে না। কতিপয় ছাত্র কর্তৃক আয়োজিত ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শন এই কুৎসিত ব্যাপারটিকে আরও কদর্য করেছে। আমি আশা করি সমগ্র ভারতের ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায় কটীবদ্ধ হয়ে শিক্ষাসদন সমূহের সুব্যবস্থা করবেন। আমার মতে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশনের দৃঢ়ানুবদ্ধ কর্তব্য হচ্ছে এই ঘৃণ্য কার্যের নিন্দা করা এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজ কর্মপন্থা পুনরুচ্চারণ করা।

সরকার ও শাসকবর্গের প্রতি একটি নিবেদন আছে। প্রতিশোধাত্মক এবং দমনমূলক ব্যবস্থায় কাজ হবে না। এইসব হিংসাত্মক বিক্ষোভ ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ। যারা এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তাঁরা হয়ত তাদের বিচার করতে পারেন। কিন্তু এর মূল কারণে অনুপ্রবিষ্ট হলেই শুধু আসল রোগের চিকিৎসা হওয়া সম্ভব। তাঁদের যদি এরকম করার ইচ্ছা বা সাহস কিছুই না থাকে, তবে তাঁরা যেন সব ব্যাপার জাতির হাতে ছেড়ে দেন। অতীতের অত্যাচার ও দমন-নীতি সত্ত্বেও দেশ এগিয়ে চলেছে। নিজেদের মধ্যে হিংসার চিকিৎসা দেশ নিজ পদ্ধতিতে করবে। প্রচলিত আইনে যে শাস্তি বিধান করা হয়, সরকার তার চেয়ে বেশী কিছু করলে তাঁরা শুধু এই উন্মত্ততা বাড়িয়ে দেবেন এবং অহিংসায় বিশ্বাসীদের

কঠিন কাজ আরও কঠিন করে দেবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩০-৭-১৯৩১

৫৬। লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি *

ভারতীয় ছাত্রদের কাছে আমার এই আবেদন যে তোমরা যেন বিশদভাবে এ সমস্যার পর্যালোচনা কর এবং যথার্থই তোমরা যদি সত্য ও অহিংসার শক্তিতে বিশ্বাসী হও, তবে ভগবানের দোহাই এই নীতি দুটিকে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে মূর্ত করে তোল। তাহলে তোমরা দেখবে যে এর জন্য তোমরা যে প্রচেষ্টাই কর না কেন, তা সংগ্রামকালে আমার সহায়ক হবে। হয়ত ইংরেজ নরনারীরা তোমাদের বলতে পারে যে তাদের জ্ঞাতসারে ভারতীয় ছাত্রদের মত সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ছাত্র তারা দেখে নি। তোমরা কি মনে কর না যে এর অর্থ আমাদের জাতির উদ্দেশ্যে প্রশস্তি উচ্চারণ করা? "আত্মশুদ্ধি" কথাটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই মুহূর্ত থেকে কংগ্রেস বুঝেছিল যে আমাদের অন্তর্শুদ্ধি করতে হবে। আত্মত্যাগের দ্বারা আমাদের আত্মশোধন করতে হবে, যাতে আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়ে উঠি এবং ভগবান যাতে আমাদের সহায় হন। এই পটভূমিকায় আত্মত্যাগ বৃত্তির অভিজ্ঞানবাহী প্রতিটি ভারতবাসীকে সে অন্য কিছু না করেই নিজ মাতৃভূমির সেবা করছে বলা চলবে। আমার মতে কংগ্রেস-নির্ধারিত পন্থার শক্তি এতখানি। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে এখানকার প্রত্যেকটি ভারতীয় ছাত্রের কর্তব্য শুধু আত্মশোধন করা এবং সন্দেহ ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে দেদীপ্যমান চরিত্রগুণের অধিকারী হওয়া।

৫৭। ছাত্রসমাজ ও অবকাশ

দেরাদুন থেকে জনৈক ছাত্রের যে পত্র পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নরূপ :—

"আমাদের কলেজের ছাত্রাবাসে ইতিপূর্বে ভাঙ্গীরা ভুক্তাবশিষ্ট নিত। কিন্তু দেশে নবজাগরণ আসার পর আমরা এ ব্যবস্থা বন্ধ করে তাদের পরিষ্কার রুটি ও ডাল দিয়ে থাকি। হরিজনরা এতে অসন্তুষ্ট। উচ্ছিষ্টে তারা ঘি এবং অন্যান্য মুখ-রোচক পদার্থের কিছু অংশ পেত। ছাত্ররা হরিজনদের জন্য এসবের ভাগ দিতে অসমর্থ। তাছাড়া আর একটা অসুবিধা আছে। আমরা না হয় নূতন রীতি প্রবর্তন

* লণ্ডনের গোয়ার স্ট্রীটে ভারতীয় ছাত্র সমাবেশে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে।

করলাম ; কিন্তু হরিজনরা তো ভোজবাড়ীর উচ্ছিষ্ট খেতেই থাকবে। এমতাবস্থায় কি কর্তব্য ? এর জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতি আর একটি অনুরোধ আছে। কিভাবে আমরা আগামী অবকাশের সুন্দরতম উপযোগ করতে পারি, সে সম্বন্ধেও আপনি কিছু লিখবেন।"

পত্রলেখক যে অসুবিধার কথা লিখেছে, তা বাস্তব। উচ্ছিষ্ট গ্রহণে হরিজনরা এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা যে শুধু এতে কিছু মনে করে না তাই নয়, তারা মনে প্রাণে এ চায়ও। এ না পেলে তারা প্রত্যক্ষভাবে বঞ্চিত হল বলে মনে করে। কিন্তু এই শোচনীয় ঘটনা শুধু হরিজন ও বর্ণহিন্দুদের অধঃপতনের সীমাই নির্দেশ করে। অন্যত্র কি হয় এ নিয়ে ছাত্রদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হল নিজেরা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা এবং তাদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে তারা যেন নিজেদের জন্য সাধারণতঃ যা রান্না হয়, তার উচিত মত কিয়দংশ তাদের ঝাড়ুদারদের জন্য আলাদা করে রাখে। দেরাদুনের ছাত্রটি খরচের কথা তুলেছে। সমগ্র ভারতের ছাত্রাবাস জীবনের কথা আমি কিছুটা জানি। আমার বিশ্বাস এই যে ছাত্ররা সাধারণতঃ রসনাতৃপ্তিকর আহার্য ও বিলাস ব্যসনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে। এও আমি জানি যে অনেক ছাত্র যথেষ্ট পরিমাণ ভুক্তাবশিষ্ট না রাখা অমর্যাদাকর মনে করে। তাদের আমি বলব যে কোন রকম ভুক্তাবশিষ্ট রাখাই হচ্ছে অমর্যাদাকর এবং দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি অসম্মান সূচক। যতটা সহজে খেতে পারি, থালায় তার চেয়ে বেশী কিছু নেবার অধিকার কারও বিশেষতঃ ছাত্রদের তো নেই। ছাত্রদের সুখাদ্য ও বিলাসোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। ছাত্রজীবনের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্ম-সংযমের অনুশীলন করা এবং তারা যদি আত্মসংযমের পথ গ্রহণ করে থালায় ভুক্তা-বশিষ্ট না রাখার পরিষ্কার অভ্যাস অর্জন করে, তাহলে তারা দেখবে যে, নিজেদের জন্য যা রান্না হয়, তার বেশ খানিকটা ঝাড়ুদারদের জন্য আলাদা করে রেখেও তাদের সাশ্রয় হচ্ছে।

অতঃপর এ কাজ করার পর, আমি চাই যে, তারা হরিজনদের সঙ্গে নিজ আত্মীয়ের মত আচরণ করবে এবং তাদের সঙ্গে সহানুভূতি সহকারে কথা বলবে। অপরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া কেন অনুচিত, তা তারা তাদের বুঝিয়ে বলবে ও তাদের জীবনে অন্যবিধ সংস্কার প্রবর্তন করার প্রয়াস পাবে। অবকাশকালের সদুপযোগ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে, উদ্যম সহকারে কর্মরত হলে নিঃসন্দেহেই তারা বহু কিছু করতে পারে। এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এখানে আমি করছি :—

১। অবকাশের মেয়াদ বুঝে সংক্ষিপ্ত অথচ সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ

করে দিবাভাগে এবং রাত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা করা।

২। হরিজন পল্লীতে যাওয়া এবং হরিজন বস্তি সাফাই করা। এ কাজে হরিজনদের সহায়তা পেলে নেওয়া।

৩। হরিজন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন এবং তাদের গ্রামের সন্নিকটস্থ দর্শনযোগ্য স্থান দেখাও। এই সুযোগে তাদের প্রকৃতিপাঠ বিদ্যা শেখানো। এই ভাবে তাদের নিজ পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী করা যেতে পারে এবং ভূগোল ও ইতিহাসের মোটামুটি জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে।

৪। রামায়ণ ও মহাভারতের ছোট ছোট সহজ গল্প তাদের পড়ে শোনানো।

৫। তাদের সহজ ভজন গান শেখানো।

৬। হরিজন ছেলেমেয়েদের দেহ পরিষ্কার করে দেওয়া ও বালক এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক সকলকেই স্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ জ্ঞান দেওয়া।

৭। হরিজনদের অবস্থা সম্বন্ধে বাছাই করা এলাকায় বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা।

৮। অসুস্থ হরিজনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এ পর্যন্ত আমি শুধু হরিজন সেবার কথাই বলেছি। তবে বর্ণ-হিন্দুদের কাছে সেবার প্রয়োজন এদের চেয়ে কম নেই। সময় সময় ছাত্ররা অতীব বিনীতভাবে তাদের কাছে অস্পৃশ্যতা বিরোধী বাণী নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। তাদের ভিতরও এতটা অজ্ঞতা বিদ্যমান, সহজেই যা সত্য তথ্য সমন্বিত বিবেচনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলে দূর হতে পারে। ছাত্ররা অস্পৃশ্যতা সমর্থক ও বিরোধীদের সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারে এবং এ কার্য করার সময় যেসব কূপ, পুষ্করিণী বিদ্যালয় ও মন্দিরে হরিজনদেরও সম অধিকার আছে তার তালিকা রচনা করতে পারে।

বিধিবদ্ধ ও নিয়মনিষ্ঠভাবে এসব কাজ করলে তারা দেখতে পাবে যে এর ফল কেমন চমকপ্রদ হয়। প্রত্যেক ছাত্রের একটি করে খাতা রাখা উচিত ও তাতে এই সব কাজের বিবরণ লেখা উচিত। অবকাশের অবসানে তারা এর থেকে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল বিবরণী প্রণয়ন করে নিজ নিজ প্রদেশের অস্পৃশ্য সেবক সমিতির কাছে পাঠাবে। অন্যান্য ছাত্ররা এই কর্মসূচীর এক বা একাধিক ধারা গ্রহণ করুক আর নাই করুক, পত্রলেখক স্বয়ং ও তার অন্তরঙ্গের দল কি করেছে, আমি যেন পত্রলেখকের কাছ থেকে তার বিবরণ পাই।

হরিজন ১-৪-১৯৩৩

৫৮। সম্প্রসারিত বাণী *

নিজেদের উচ্চবংশজাত মনে করে আমরা এই সবর্ণ হিন্দুর দল, যাদের অস্পৃশ্য বা অবর্ণ মনে করে রেখেছি এবং যাদের কাছে যাওয়া বা যাদের দেখা পর্যন্ত আমরা পাপ বলে মনে করি, আমার বাণী হচ্ছে এই যে এ জাতীয় উন্নাসিকতার কোন-রকম সমর্থন শাস্ত্র গ্রন্থে নেই। আমি যদি দেখতাম যে বেদ, উপনিষদ, ভাগবদ্-গীতা এবং স্মৃতি ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে অস্পৃশ্যতা প্রথার পূর্বোক্ত প্রকারের সমর্থন আছে, তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারত না। পচা ফলের মতই বিনা দ্বিধায় আমি একে বর্জন করতাম। যে ঈশ্বর সবর্ণ ও অবর্ণ উভয় শ্রেণীর হিন্দুর স্রষ্টা, তিনি যে তাঁর সন্তানদের উপর এ জাতীয় দুরভিসন্ধিমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করবেন, এ কথা ভাবতেও আমার বিচার বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ ও হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। যে ঋষিকুল বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র সমূহের ছত্রে ছত্রে ঈশ্বরের বিশ্বজননীতার কথা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা যে বর্তমান হিন্দুসমাজ কর্তৃক আচরিত অস্পৃশ্যতা প্রথার মত কোন গ্লানিকর বিধির কথা চিন্তাতেও আনতে পারেন, এ কথা যে কোন বুদ্ধিমান লোকের শ্রবণমাত্র অসম্ভব মনে হওয়া উচিত। তবে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তো সহজে যাবার নয়। তারা যুক্তিবাদকে আবরিত করে, বুদ্ধিকে করে আচ্ছন্ন এবং হৃদয়কে করে পাষাণ। এই জন্যই দেখা যায় যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অস্পৃশ্যতার সমর্থন করছেন।

কিন্তু তোমাদের মত ছাত্রদের জানা উচিত যে এই বাণীর পিছনে আরও এক ব্যাপকতর বাণীর গুঞ্জরণ শ্রুতিগোচর হচ্ছে। অস্পৃশ্যতার এই দানব ভারতের সমাজ-জীবনের প্রতিটি অঙ্গকে আক্রমণ করেছে। এই বাণী এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শুধু হিন্দুদের মধ্যে পারস্পারিক অস্পৃশ্যতা প্রথার অবসানেই কাজ শেষ হবে না, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ভিতরও কোনরকম অস্পৃশ্যতা বোধ থাকবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতের লক্ষ লক্ষ সবর্ণ হিন্দুর হৃদয়ে যদি এই মহান পরিবর্তন আনা যায় এবং যদি তাদের চিত্ত শুদ্ধ করা যায়, (আর নিঃসন্দেহে এ চিত্তশুদ্ধি ঘটবেও) তাহলে আমাদের এই দেশে আমরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী, সন্দেহ ও বিদ্বেষমুক্ত এক অখণ্ড জাতিরূপে বসবাস করতে

* ১৭-১-১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আলওয়ের ইউনিয়ন খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্র সমাবেশে প্রদত্ত বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ।

সমর্থ হব। অস্পৃশ্যতা এবং তার অন্যবিধ নিষ্ঠুর বাহ্য অভিব্যক্তির জন্য আজ আমরা পরস্পরের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন এবং এরই জন্য আমাদের জীবন আজ নিরানন্দ ও নীরস।

৫৯। কলকাতার ছাত্রদের সঙ্গে *

প্রশ্ন :—গণবিপ্লবকে যদি স্বাধীনতা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে আপনি কি মনে করেন যে এরূপ বিপ্লব কালে শত প্ররোচনার কারণ ঘটা সত্ত্বেও জনগণের পক্ষে কায়মনোবাক্যে একেবারে অহিংস থাকা সম্ভবপর? কোন ব্যক্তি বিশেষ হয়ত এতদূর উঠতে পারে; কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে জনসাধারণের পক্ষে অহিংস আচরণের এতখানি উন্নত স্থিতিতে উন্নীত হওয়া সম্ভব?

উত্তর :—আজ এ রকম প্রশ্ন করা আশ্চর্যের কথা। কারণ আমাদের অহিংস সংগ্রামের সমগ্র গতিপথে আমরা এই প্রমাণ পেয়েছি যে, যেখানেই হিংসার বহিঃপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তার মূলে জনগণ ছিল না। এক বিশেষ শ্রেণী অর্থাৎ বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এর অনুষ্ঠানের গোপন বন্দোবস্ত করে। এমন কি সশস্ত্র যুদ্ধেও কোন ব্যক্তি বিশেষ হয়ত আত্মবিস্মৃত হতে পারে; কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ মানসিক ভারসাম্য হারায় না বা হারাতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণ বা বৈরীসাধন বৃত্তি ব্যক্তিগতভাবে যতই তীব্র হোক না কেন, তারা শুধু হুকুম পেলেই অস্ত্র ধরে, আবার হুকুমে অস্ত্র সম্বরণ করে। সাধারণ অবস্থায় সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী যুদ্ধকালে যে অনুশাসনের পরিচয় দেয়, অহিংস সংগ্রামকালে সুশিক্ষিত জনসাধারণই বা কেন তার পরিচয় দিতে পারবে না, তার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। এছাড়া অহিংস-সেনার আর একটি বিশেষ সুবিধা আছে। সাফল্য সহকারে সংগ্রাম পরিচালনার্থ তার শত সহস্র নেতার প্রয়োজন ঘটে না। অহিংস বাণী হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে বহনের জন্য অনেক লোকের দরকার পড়ে না। মুষ্টিমেয় নরনারী যদি যথাযথভাবে অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তাদের উদাহরণে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য। এ আন্দোলনের প্রথমাবস্থাতে আমি ঠিক এই ব্যাপারই দেখেছি। আমি দেখতাম যে জনসাধারণ সত্য সত্যই বিশ্বাস করে যে, যতই আমি অহিংসার কথা প্রচার করি না কেন, মনে মনে আমি কিন্তু হিংসার সমর্থক। তাদের অবশ্য নেতৃবৃন্দের কথা এই ভাবে পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে শিক্ষা

* ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই দেশের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে কলকাতার ছাত্রদের সঙ্গে গান্ধীজীর যে আলোচনা হয়, তার বিবরণ থেকে।

দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল যে আমার কথায় ও কাজে পার্থক্য নেই, তখন অত্যন্ত বিরূপ অবস্থার মধ্যেও তারা অহিংসা পালন করেছে। আর চৌরীচেরার পুনরাবৃত্তি হয় নি। অবশ্য চিন্তাতেও অহিংস হবার ব্যাপার ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ বিচারে অসমর্থ। তবে নিঃসংশয়ে এটুকু বলা যেতে পারে যে যুগপৎ চিন্তায় অহিংস না হলে কর্মক্ষেত্রে অহিংসা বজায় রাখা অসম্ভব।

প্রশ্ন :—আপনি কি মনে করেন যে আপনার আদর্শ রূপায়নের পথে শোষক ও শোষিতের সহযোগিতা সম্ভবপর? আপনি কি মনে করেন না যে, কংগ্রেসের পক্ষে পুঁজিপতি ও জমিদারের কথা না ভেবে শুধু জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করার দিন এসে গেছে? আপনি কি বিবেচনা করেন না যে, জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে জনগণকে আর সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করা সম্ভব নয়? আপনার কি মনে হয় না যে, পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে শোষিত কৃষাণ মজুরদের দণ্ডায়মান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই? শ্রেণী সংগ্রাম যে অপরিহার্য এবং বৃহত্তর মানবতার মঙ্গলের জন্য বর্তমানের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীকে যে বিলুপ্ত হতে হবে, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

উত্তর :—কখনও আমি একথা বলিনি যে, যতদিন শোষণ বা শোষণের ইচ্ছা বজায় থাকবে, ততদিন শোষক ও শোষিতের মধ্যে সহযোগিতা হবে। আমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস করি না যে, প্রত্যেক পুঁজিপতি ও জমিদারই এক স্বভাবসিদ্ধ কারণের তাগিদে শোষক ও তাদের ও জনগণের মধ্যে কোন মৌলিক বা অনতিক্রম্য স্বার্থ সংঘাত বিদ্যমান। প্রত্যেক শোষণের মূলেই আছে শোষিতের স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছামূলক সহযোগিতা। আমরা যতই অস্বীকার করতে চাই না কেন, সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণ যদি শোষকের আদেশ অগ্রাহ্য করে, তবে শোষণের নামগন্ধ থাকবে না। কিন্তু স্বার্থ এসে পড়ায় আমরা আমাদের বাঁধনকে আঁকড়ে ধরি। এর অবসান দরকার। জমিদার ও পুঁজিপতিদের অবলুপ্তির প্রয়োজন নেই। দরকার হচ্ছে তাদের সঙ্গে জনসাধারণের বর্তমান অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে এ সম্পর্ককে অধিকতর সুস্থ ও পবিত্র করা। তোমরা প্রশ্ন করেছ, "কংগ্রেসের পক্ষে কি পুঁজিপতি ও জমিদারদের কথা না ভেবে শুধু জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করার দিন আসে নি?" আমার জবাব হচ্ছে এই যে, নরমপন্থী বা চরমপন্থী—পরিচালক যারাই হোন না কেন, জন্মের প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস এই কাজই করে আসছে। হিউম সাহেবের নেতৃত্বে এর প্রথম আবির্ভাবের সময় থেকেই কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধিত্ব প্রয়াসী। এই হচ্ছে এর গোড়ার ইতিহাস। এরপর এর পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসও আগাগোড়া এই কথাই প্রমাণ করবে যে কংগ্রেস

চিরকালই জনগণের প্রগতিশীল প্রতিনিধি।

এখন কথা হচ্ছে—আমি কি মনে করি না যে, কংগ্রেসের পক্ষে পুঁজিপতি ও জমিদারদের কথা মনে ঠাঁই না দিয়ে শুধু জনগণের স্বার্থ নিয়ে দণ্ডায়মান হবার দিন এসে গেছে? না। তা করলে আমরা জনগণের এই তথাকথিত প্রতিনিধির দল, আমাদের ও জনগণের সর্বনাশের পথ খুলে দেব। পরলোকগত স্যার স্বরেন্দ্রনাথের মত আমি পুঁজিপতি ও জমিদারদের জনগণের সেবায় নিয়োগ করতে চাই। আমরা অবশ্য তাদের পায়ে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দেব না। তাদের কথায় আমরা ওঠবোস করব না। আমরা যথাসম্ভব তাঁদের বিশ্বাস করব, যাতে তাঁরা জনগণের সেবার জন্য স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন করেন। তোমরা কি মনে কর যে, তথাকথিত স্থবিধাভোগী শ্রেণী একেবারে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক রহিত? একথা মনে করলে তাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে এবং জনস্বার্থও উপেক্ষিত হবে। তারাও কি শাসকশ্রেণী কর্তৃক শোষিত নয়? মহৎ আবেদন অবশ্যই তাদের অন্তর স্পর্শ করবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, সহানুভূতি সহকারে কথিত যে কোন বিষয় তাঁদের মনে লাগে। আমরা যদি তাঁদের আস্থা অর্জন করি ও যদি তাঁদের অস্থবিধা সৃষ্টি না করি, তবে দেখব যে ধীরে ধীরে নিজ সম্পদ দরিদ্রদের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করার নীতির তারা বিরোধী হবে না। এছাড়া আমাদের নিজেদের অবস্থা দেখতে হবে। বুভুক্ষু জনগণের সঙ্গে আমাদের অবস্থার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান, আমরা কি তার অবসান ঘটিয়েছি? আমরা স্বয়ং যখন কাঁচের মহলের বাসিন্দা, তখন অপরের ঘরে পাথর ছোড়া ঠিক নয়। জনগণের জীবনের সঙ্গে আমরা কতটুকু একাত্ম হয়েছি? আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমার কাছে আজও এ একটি আদর্শ হয়েই রয়ে গেছে। যে স্বভাবের জন্য আমরা পুঁজিপতিদের উপর দোষারোপ করি, আমাদের নিজেদের ভিতর এখনও সে দোষ রয়ে গেছে। শ্রেণী সংগ্রামের কথা আমার কাছে যৌক্তিকতাপূর্ণ মনে হয় না। আমরা যদি অহিংসার বাণী হৃদয়ঙ্গম করি, তাহলে ভারতে শ্রেণী সংগ্রাম শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, পরিত্যাজ্য। যারা শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবীতার কথা বলেন, তাঁরা হয় অহিংসার তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি, নচেৎ একে শুধু ভাসা ভাসা ভাবে বুঝেছেন।

প্রশ্ন :—ধনীক সম্প্রদায় স্বয়ং দারিদ্র্যবরণ না করে কিভাবে দরিদ্রদের সাহায্য করতে পারেন? ধনাঢ্য বৃত্তি বা পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটি প্রথা; যা নিজের মর্যাদা ও গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য পুঁজি ও শ্রমের ভিতর প্রচণ্ড ব্যবধান চিরস্থায়ী করে রাখার প্রয়াসী হয়। স্থতরাং যে কোন এক শ্রেণীর স্বার্থকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে কি এতদুভয়ের মধ্যে আপোষ রফা করা চলতে পারে?

উত্তর :—ধনীরা নিজ সম্পত্তিকে স্বার্থ প্রসূত বিলাসের জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে দরিদ্রদের হিতার্থে ব্যয় করে দরিদ্রদের সহায়তা করতে পারেন। এ পন্থানুসরণ করলে আজ "বিত্তবান" ও "সর্বহারাদের" মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান, তার আর অস্তিত্ব থাকবে না। তখনও শ্রেণী বিভাগ থাকবে, তবে সে বিভাগ তখন হবে সমান্তরাল, উর্ধ্বোধো ভাবে লম্বমান হবে না। আমরা যেন বিদেশ থেকে আমদানি করা ধুয়ো এবং লোভনীয় বুলি দ্বারা বিভ্রান্ত না হই। আমাদের কি প্রাচ্য দেশীয় প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর ঐতিহ্য নেই? পুঁজি ও শ্রমের সমস্যার সমাধান কি আমরা নিজ পদ্ধতিতে করতে সক্ষম নই? উচ্চনীচের সম্বন্ধে সামঞ্জস্য আনয়ন করা এবং পুঁজিও শ্রমের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করাই তো বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে পশ্চিম থেকে যেসব মতবাদ আমদানি হয়েছে, তার সবগুলিই হিংসার আয়ুধ দ্বারা সজ্জিত। এ পথের শেষে যে সর্বনাশ গোপন রয়েছে, তা আমি দেখেছি বলেই আমি এসবের বিরোধী। এই প্রথা দুরন্ত বেগে যে অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে চলেছে, আজ পশ্চিমের চিন্তাশীল সম্প্রদায় তার বিরোধী হয়ে উঠেছেন। পশ্চিমে আমার যতটুকু প্রভাব, তার মূলে রয়েছে এই কথা যে হিংসা ও শোষণের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পাবার পথ আবিষ্কারের জন্য আমি অবিরত চেষ্টা করে চলছি। পাশ্চাত্য সমাজ সংগঠন পদ্ধতি সহৃদয়তা সহকারে অনুধাবন করে আমি দেখেছি যে, পশ্চিমবাসীর হৃদয়ে জ্বর-ঘটিত উত্তাপ প্রবাহের অন্তরালে সত্যের জন্য অশান্ত গতিতে অনুসন্ধিৎসা চলেছে। এ বৃত্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় প্রথা সমূহকেও আমরা যেন ঐরূপ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি পরায়ণ হয়ে দেখি। তাহলে এর থেকে বিশ্বে অচিন্ত্যপূর্ব অথচ অধিকতর সঙ্গত সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ রূপ পরিগ্রহ করবে। নিঃসন্দেহেই একথা ধরে নেওয়া ভুল যে জনগণের দারিদ্র্য নিরাকরণ সমস্যার সমাধানের পথে পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ একেবারে শেষ কথা।

প্রশ্ন :—অহিংসা বলতে আপনি কি বোঝেন, এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটু স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অহিংসার অর্থ আপনার কাছে যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের অভাব হয়, তাহলে আমাদের তাতে আপত্তি নেই। আমাদের আপত্তি—যখন আপনি অহিংসা ও হত্যা না করাকে এক পর্যায়ভুক্ত করেন। কোন ব্যক্তিগত কারণে যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ হয় জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার্থ। কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য চিরকালই চূড়ান্ত দৈহিক বা নৈতিক শক্তির সহায়তা নেওয়ার প্রথা চলে আসছে। জাতীয় আদর্শের পরিপূর্তির জন্য সবাই যদি সাফল্য সহকারে দৈহিক শক্তির আশ্রয় নিতে সমর্থ হয় এবং যদি অভীষ্ট পূরণের এ সর্বাধিক সহজ পন্থা হয়,

তবুও কেন আপনি এতে আপত্তি করবেন? এছাড়া বিশ্বের জনমতও তো এখনও নৈতিক প্রতিরোধের মর্যাদা দেবার মত উন্নত হয়নি।

উত্তর :—আমার অহিংসায় নৈতিক ছাড়া অন্য যে কোন রকম শক্তি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিশ্বে জাতীয় সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য দৈহিক শক্তি প্রযুক্ত হয়ে এসেছে বা এখনও হচ্ছে বলা এককথা, আর এরকম হতেই থাকবে বলা এককথা। আমরা অন্ধভাবে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করতে পারি না। সে দেশে তারা কিছু করলে তার প্রতিকারও তাদের হাতে। আমাদের কিন্তু সে সুযোগ নেই। গর্ভ নিয়ন্ত্রণের কথাই ধর না কেন। ও দেশে এ পদ্ধতি হয়ত কার্যকারী প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যেভাবে গর্ভ নিয়ন্ত্রণ করার কথা চলছে, আমরা যদি তা গ্রহণ করি, তবে দশ বৎসরের মধ্যেই আমরা নপুংসকের জাতিতে পরিণত হব। এইভাবে আমরা যদি পশ্চিমের অনুকরণে হিংসার শরণ নিই, তবে পশ্চিমেরই মত অনতি-বিলম্বে দেউলিয়া হয়ে পড়ব। দিন কয়েক আগে জনৈক ইউরোপীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু উচ্চমাত্রায় যন্ত্রশিল্পে অগ্রসর পাশ্চাত্য জাতি সমূহ কর্তৃক পৃথিবীর অশ্বেতকায় জাতিদের সামগ্রিক শোষণের পরিণামের কথা চিন্তা করে তিনি আতঙ্ক বোধ করছিলেন। অহিংসা নীতির এখন প্রয়োগকাল চলেছে। আত্মিক শক্তির সঙ্গে পাশবিক শক্তির জীবন মরণ সংগ্রাম জারী হয়েছে। এই সংকট মুহূর্তে আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই।

প্রশ্ন :—বাঙলা দেশে বিনা বিচারে আটক যুবক-যুবতীদের জন্য কংগ্রেস কি করেছে বা কি করতে চায়?

উত্তর :—আমি তোমাদের আমার পথের সন্ধানের কথা বলেছি। কংগ্রেসে যদি আমরা অহিংসভাবে ও সততা সহকারে কাজ করতে পারি, তাহলে এর বর্তমান দুর্নীতি দূরীকরণে সমর্থ হব। কংগ্রেস আজ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং সখেদে আমাকে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এ বিষয়ে বাঙলা দেশের পাপ সর্বাধিক। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি যে, প্রতিটি আটক বন্দীকে মুক্ত করার জন্য আমি চেষ্টা করব। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের অহিংসা কায়মনোবাক্যে সাচ্চা হওয়া চাই।

প্রশ্ন :—আমাদের সমাজে যারা কোন না কোন প্রকারে শোষিত ও অবদমিত তাদেরই আমরা হরিজন মনে করি। আপনার সত্যাগ্রহ আন্দোলন চিরকালই যারা "সবার নীচে সবার পিছে"—তাদের জন্য। তাহলে আবার আলাদা করে হরিজন আন্দোলন কিসের জন্য?

উত্তর :—আমি কোন পৃথক হরিজন আন্দোলন চালাচ্ছি না। এর তাৎপর্য

তো সর্বব্যাপক।

প্রশ্ন :—ভারতের যুবকদের পক্ষে সামাজিক পুনর্গঠনের দিকে জোর দেবার সময় এসেছে কি ? স্বরাজের আগে বা পরে এরজন্য পৃথক কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে কি ?

উত্তর :—সামাজিক পুনর্গঠন ও স্বরাজের লড়াই যুগপৎ চলতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বা সমগ্র কর্মসূচীকে পরষ্পর সম্পর্ক বিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার কথা উঠতেই পারে না। তবে কোন সামাজিক নববিধান চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ তাহলে হবে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রীর মত। আমি ধৈর্যহীন সংস্কারক। আমি মনে প্রাণে তড়িৎ বেগে সামাজিক পুনর্বচনা কাম্য মনে করি। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম অনুযায়ী এর স্বাভাবিক বিকাশ হওয়া চাই। হিংস উপায়ে জবরদস্তি করে উপর থেকে সংস্কার চাপিয়ে দিলে চলবে না।

প্রশ্ন :— কংগ্রেসে এইসব "নামকাওয়াস্তে" জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের রাখার প্রয়োজনীয়তা কি ? তাদের দলে রাখার জন্য নানারকম অন্যায় ও অযৌক্তিক সুযোগ সুবিধা দেবার ফলে তাদের অতৃপ্ত ক্ষুধা বেড়েই চলেছে।

উত্তর :—মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা যদি "নামকাওয়াস্তে জাতীয়তাবাদী" হন, তাহলে আমরাও ঐ একই চিজ। সুতরাং আমরা যেন আমাদের শব্দকোষ থেকে ঐ কথাটি বাদ দিই। "অযৌক্তিক সুযোগ সুবিধা" বলতে কি বোঝায়, আমি তা জানি না। তবে আমাকে কখনও তোমরা অন্যায় সুযোগ সুবিধার সমর্থকরূপে দেখতে পাবে না এ বিষয়ে আমরা সহমত।

প্রশ্ন :—কংগ্রেসের কর্মসূচীর ভিতর খিলাফতের প্রশ্নকে সমাবিষ্ট করায় কংগ্রেসকে কি সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর দায়ে দোষী করা যায় না ?

উত্তর :—কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে বলা ঐতিহাসিক সত্য নয়। আসল কথা হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। আমি সর্বদা বিশ্বাস করি যে, কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনে নিজের মুসলমান ভাই-দের সঙ্গে যোগদান করে খুব ভাল কাজই করেছে।

অমৃত বাজার পত্রিকা ৫-৮-১৯৩৪

৬০। ছাত্রদের ভূমিকা *

"ওখানে আমরা চিকিৎসার কাজ করতে চাই। কি করে আমরা এ কাজ সম্পন্ন করতে পারি মহাত্মাজী? আপনি কি আমাদের কিছু যুক্তি-পরামর্শ দিতে পারেন?"

গান্ধীজী বললেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন আমি আমার জীবনের প্রথম ভাগ কাটিয়েছি, তখন থেকেই আমার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই প্রথমেই তোমাদের সতর্ক করে আমার বক্তব্য সুরু করব। কিয়ৎ পরিমাণ ঔষধপত্র দিয়ে তোমরা তাদের বিশেষ কোন উপকার করতে পারবে না। তাদের সাফাই কার্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শেখাতে হবে। তাহলেই শুধু ম্যালেরিয়া বন্ধ হবে। কুইনাইনে ম্যালেরিয়া বন্ধ হল মনে হয়; কিন্তু নির্মূল হয় না। দরকার প্রতিষেধ-মূলক ব্যবস্থা ও রোগের উপশম হবার পর রোগীর যথোচিত সেবা করা। তারা জানেই না যে, সময় সময় যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করার ফলে ম্যালেরিয়ার বীজাণু শরীরে বংশ বিস্তার করে। তারা যা পায় তাই খায়। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগীর পীড়ার উপশমান্তে শ্বেতসার খাদ্য, বেশী মাত্রায় আমিষ জাতীয় পদার্থ পরিহার করা উচিত এবং এ অবস্থায় দুধের উপরেই বেশী করে নির্ভর করা কর্তব্য। এই কথা তাদের বলা দরকার। কি করে রোগের প্রতিরোধ করতে হয়—তাই তাদের শেখাও। তোমরা এক হাজার কুইনাইন বড়ি বিলি করেছ শুনলে আমার কাছ থেকে খুব একটা প্রশংসা পাবে না। পারলে তাদের সাফাই সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দাও। সেখানে কোদাল গাঁইতি কাঁধে যাও, বদ্ধ জলাশয় বুঁজিয়ে দাও, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখ, তাদের কুয়াগুলি যাতে ঠিকমত ঝালাই হয় সেদিকে খেয়াল রাখ এবং দেখ যেন পুকুরের জল দূষিত না হয়। আমি পরলোকগত অতিথিবৎসল অধ্যক্ষ রুদ্রের ঘরে থেকেছি। দিল্লীর আশেপাশে যেসব জলা জায়গা ও মশকের বংশ বৃদ্ধির অনুকূল ক্ষেত্র ছিল, সেগুলিকে দিল্লীবাসী কিভাবে সাফ করেছে, একথা তাঁর কাছে আমি শুনেছি। অর্থাভাবে বা অন্য কারণে মিউনিসিপ্যালিটি বা লোকাল বোর্ডগুলি যা করে উঠতে পারে না, আমাদের কাজ হবে জনসাধারণকে সেসব করতে শেখানো।

---

* ওয়াজিরাবাদের সেন্ট স্টিফেনস্ কলেজের অধ্যাপক উইনসরের অনুগামী সোশাল সার্ভিস লীগের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ।

"সর্বোপরি তাদের গ্রামকে আবর্জনা ও ময়লার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে শেখাও। নিজেরা সানন্দে ঝাড়ুদারের কাজ না করলে এ করা অতীব কঠিন। অনেক দিন ধরে তোমাদের গ্রামের রাস্তা ঝাড়ু দিতে হবে এবং গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য-রক্ষা বিধি শিক্ষা দিতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মলমূত্র থেকে স্বর্ণসার প্রস্তুতি পদ্ধতিও শেখাতে হবে। পোর লিখিত "গ্রাম্য স্বাস্থ্য" বইটিতে এ বিষয়ে সংক্ষেপের ভিতর সুন্দর আলোচনা আছে। তারা যাতে নিজ মল নয় ইঞ্চি গভীর খাতে মাটি চাপা দেয়, তার শিক্ষা দেওয়া দরকার। এর পিছনে তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, ঐ মাটি জীবাণু পূর্ণ এবং সৌররশ্মি ঐ পর্যন্ত নীচে যেতে পারে। কিছুদিনের মধ্যে এর সমস্তটুকু উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হবে এবং তোমরা এর সহায়তায় ভাল শাকশব্জী উৎপাদন করতে পারবে।

"আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বললেও ভাল হয় মনে হচ্ছে। স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হবে, কোন খাদ্যে কি খাদ্য-প্রাণ আছে তা জানতে হবে। হাতে কোটা চাল, জাঁতায় পেষা আটা, দেশী চিনি, নিজের খেতের শাকশব্জী, গ্রামের ঘানির টাটকা তেল ইত্যাদি তারা যাতে ব্যবহার করে, তার উপর জোর দিতে হবে। আজকাল প্রত্যেক চিকিৎসক দৈনিক কিছু কাঁচা শাকশব্জী খেতে বলেন। প্রত্যেক কৃষক বিনা খরচে সব রকমের তরিতরকারী উৎপাদন করতে পারে এবং নিয়মিত খাদ্যের সঙ্গে এর কিছু কিছু খেতে পারে। যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছিল যে টিনে সংরক্ষিত বা শুষ্ক তরিতরকারী স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং স্কার্ভি রোগ দমন করার সাধ্য লাইমজুসের নেই, সে পারে শুধু টাটকা লেবু।"

"আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আচ্ছা, আমরা হরিজন ছেলেদের জন্য যে ছোট্ট স্কুলটি চালাচ্ছি, সেখানে কি কি শিক্ষা দেব, তা কি বলতে পারেন?"

"তোমাদের তো সব বলেই দিয়েছি। তোমরা নিশ্চিত থাক যে, স্বাস্থ্য ও সাফাইএর দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিশালী বনিয়াদ গড়ে ওঠার চেয়ে অক্ষর জ্ঞান থাকাটা মোটেই মূল্যবান নয়। দরিয়াগঞ্জ বিদ্যালয়ের ছাত্রী কয়েকটি হরিজন বালিকাকে আমি দেখেছি। তাদের দেখবামাত্র তাদের বড় বড় ময়লা নখ, অপরিষ্কার নাক, নাকে সর্দির ধারা এবং কানের পুঁজ চোখে পড়ল। বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে যে ভদ্রমহিলা তাঁদের শিক্ষয়িত্রী, এসব তাঁর চোখে পড়েনি। প্রথমে তাদের পরিচ্ছন্নতার পাঠ শেখাও। শুধু লিখতে পড়তে শিখে কিছু হবে না। আমি যেসব অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম, তার খেয়াল রেখো। স্মরণ রেখো যে অক্ষর জ্ঞানবিহীন ব্যক্তিরা বিশাল রাজ্য শাসনে কোন অসুবিধা বোধ করেন নি।

প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার অতি কষ্টে নিজের নাম দস্তখত করতেন। তাদের লেখাপড়া অবশ্যই শেখাবে। তবে একেই যথাসর্বস্বজ্ঞান কোরো না।"

আশাতিরিক্ত পেয়ে গেছি এই রকম একটা মুখের ভাব করে ছাত্ররা বলল, "আর একটি প্রশ্ন আছে। আমাদের একটি দুঃস্থ সাহায্য তহবিল আছে। এর সদুপযোগ কাদের দিয়ে হতে পারে?"

"তাহলে আমাকে আর না হয় হরিজন সেবক সঙ্ঘকে এটাকা দিয়ে দাও।"

"না, এটা আমরা নিজ হাতে ব্যয় করতে চাই।"

"বেশ, তাহলে বস্তিতে গিয়ে সব চেয়ে গরীব লোক খুঁজে বার করে তাদের দিয়ে দাও।"

"বস্তিতে?"

"নিশ্চয়, তা নয় তো কি লাটসাহেবের বাড়ীতে? সেখানকার আস্তাবলও গিয়ে দেখবে আমাদের ঘরের চেয়ে বেশী গরম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক। না, তোমাদের খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। তোমাদের চতুষ্পার্শ্বেই তোমরা এমন অনেক লোক দেখতে পাবে, যাদের তোমরা যা দিতে পার, তারই বিশেষ প্রয়োজন। মীরাবেনের কথাই ধর না কেন। তিনি দেখতে পেলেন যে এখানকার চৌকিদারই শীতে কাঁপছে। ডাঃ আন্‌সারী যেমন বিলাতে তাঁকে তাঁর শাল দিয়েছিলেন, তেমনি তিনিও চৌকিদারটিকে তাঁর কম্বলটি দিয়ে দিলেন।"

"কিন্তু দেখুন, সময় সময় এইসব লোক গরীব না হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের ভান করে। আমরা যোগ্য প্রার্থী বাছবো কি করে?"

"তাহলে তোমরা বোধ হয় ভগবান। দোহাই তোমাদের, তোমরা সাধুতার ঠিকে নিও না।"

"তারা যখন চলে যাবার মুখে, তখন গান্ধীজী আবার বললেন, "ওয়াজিরাবাদ গ্রামে তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ কর। এটিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করে আমাকে তোমাদের কাজ দেখতে আমন্ত্রণ জানাও। আজ আমার আশীর্বাদ জানাই। পরে এসে আমার প্রশংসা পত্র নিয়ে যেও।"

হরিজন ৮-২-১৯৩৫

৬১। ছাত্ররা কিভাবে সাহায্য করতে পারে

জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গান্ধীজীর কাছে জানতে চায় যে পড়াশুনার ক্ষতি না করে অবসর সময়ে সে কি ভাবে দেশের সেবা করতে পারে। গান্ধীজী তাকে নিম্নরূপ বিশদ পরামর্শ দেন :—

"তুমি দেশের সেবা করতে পার—

(১) প্রত্যহ দরিদ্রনারায়ণের জন্য সমান ও মজবুত সুতা কেটে এবং কত নম্বরের কত ওজনের কোন শ্রেণীর সুতা কতক্ষণ ধরে কাটলে তার দৈনিক বিবরণ রেখে ও মাসিক কার্য বিবরণ আমার কাছে পাঠিয়ে। সুতা সযত্নে সংগ্রহ করে আমার কাছে জমা করতে হবে।

(২) স্থানীয় অনুমোদিত খাদি ভাণ্ডারের হয়ে দৈনিক কিছু খাদি বিক্রি করে ও এই বিক্রির হিসাব রেখে।

(৩) রোজ অন্তত একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে।

(৪) এইভাবে জমানো পয়সা আমার কাছে পাঠিয়ে। এই "অন্তত একটা" কথাটির তাৎপর্য বুঝতে হবে। এর মানে হচ্ছে, যদি এর চেয়ে বেশী বাঁচাতে পার, তাহলে দরিদ্রনারায়ণদের তহবিলে বেশী করে দেবে।

(৫) অন্যান্য ছাত্রসহ মাঝে মাঝে হরিজন বস্তিতে গিয়ে এবং সঙ্গীসাথীসহ তাদের ঘরদুয়ার ও আশপাশ পরিষ্কার করে, তাদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও এইসব ছেলেদের সাফাই ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে।

এর চেয়েও যদি বেশী সময় পাও, তাহলে তুমি এমন কোন কুটীর-শিল্প শিখবে, যা দিয়ে পাঠদ্দশার অবসানে গ্রামবাসীদের সেবা হতে পারে। এসব করার পর যদি দেখ আরও কাজ করার সময় ও ইচ্ছা আছে, তাহলে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো। তখন আরও পরামর্শ দেওয়া যাবে।

হরিজন ১৯-২০-১৯৩৫

৬২। যুবকদের জন্য

অনেক জায়গায় আজকাল বয়োবৃদ্ধদের সব কথা নিয়ে বিদ্রূপ করা যুবকদের কাছে একটা ফ্যাশানের মধ্যে গণ্য হয়েছে। আমি একথা বলতে চাই না যে, এ বিশ্বাসের স্বপক্ষে একেবারে কোন কারণ নেই। তবে প্রবীণরা যাই বলুন, তাকে স্রেফ বৃদ্ধদের কথা বলেই লঘু করার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আমি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিতে চাই। সময় সময় শিশুর মুখে যেমন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বৃদ্ধদের কাছেও প্রজ্ঞার নিদর্শন মেলে। সেরা উপায় হচ্ছে, যার কাছে যা কিছু শোনা যাক না কেন, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে তার বিচার করা। গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণের বিষয়ের আমি পুনরালোচনা করতে চাই। প্রতি-নিয়ত কানের কাছে এই কথা বলা হয়ে থাকে যে, দেহের ক্ষুধার খোরাক জোগানো আইনসঙ্গত ঋণ পরিশোধ করার মতই পবিত্র দায়িত্ব এবং এ না করার শাস্তি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমাপহ্নব। এই দেহের ক্ষুধার সঙ্গে বংশ বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত নেই এবং গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতির সমর্থকরা বলেন যে উভয়পক্ষের সম্মতি না থাকলে গর্ভসঞ্চাররূপী দুর্ঘটনার প্রতিরোধ করতে হবে। আমার নম্র নিবেদন এই যে, যেখানেই প্রচার করা হোক না কেন, এ এক ভীষণ নীতি। বিশেষ করে ভারতের মত যে দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষরা সৃজন ক্রিয়ার দুরুপযোগের ফলে প্রায় পুরুষত্বহীনের কোঠায় এসে পৌছেছে, সেখানে এ আরও ভয়ঙ্কর। রীরংসা বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন যদি কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়, তাহলে কিছুদিন আগে আমি যেসব অস্বাভাবিক পাপের কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেসব এবং লালসা তৃপ্তির অন্যবিধ উপায় সমূহকেও কাম্য বলে স্বীকার করতে হয়। পাঠকদের জেনে রাখা উচিত যে এমন কি প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিরাও তথাকথিত কামবিকারের সমর্থক। কথাটায় হয়তো অনেকে চমকে উঠবেন। তবে কোন না কোন রকমে একবার এসব যদি মর্যাদার ছাপ পায়, তাহলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমলৈঙ্গিক রতিবাসনা তৃপ্তির রেওয়াজ চালু হবে। আমার কাছে গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা আর বিচিত্র উপায়ে রমনেচ্ছার নিবৃত্তিসাধন সমান জিনিস এবং এর ফল যে কি হয়, তা অনেকেরই জানা নেই। স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভিতর এই গোপন পাপ কি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, তা আমি জানি। বিজ্ঞানের নামে ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের ফলে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ও সমাজ-জীবনকে কলুষতা মুক্ত করার কাজে ব্রতী সংস্কারকদের কাজ এখনকার মত প্রায়

অসম্ভব করে তুলেছে। একথা আজ গোপন নয় যে, স্কুল-কলেজের ছাত্রী এমন সব অনেক বয়স্থা মেয়ে আছে, যারা সাগ্রহে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় পুস্তকাবলী এবং পত্র-পত্রিকা পাঠ করে ও এমন কি অনেকের কাছে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম থাকে। শুধু বিবাহিতাদের মধ্যে এসবের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব। যখন স্বাভাবিক পরিণতি সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে শুধু পাশববৃত্তির তৃপ্তিসাধন করাই বিবাহের লক্ষ্য ও পরমার্থ জ্ঞান করা হয়, তখন বিবাহ তার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে।

আমার এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, যেসব ভদ্রমহোদয় ও মহিলা ধর্মীয় উন্মাদনায় আবিষ্ট হয়ে এর স্বপক্ষে প্রচার করছেন, তাঁরা এই ভ্রান্ত ধারণার অনুবর্তী, যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণে অনিচ্ছুক দরিদ্র রমণীদের তাঁরা বাঁচার রাস্তা দেখাচ্ছেন এবং তাঁদের এই কাজের ফলে দেশের যুবক-যুবতীদের প্রতিকারাশক্য হানি হচ্ছে। যারা সত্যসত্যই সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক, তাঁরা সহজে তাদের কাছে পৌছাতে পারবেন না। আমাদের দেশের দরিদ্র রমণীদের পাশ্চাত্য ললনাদের মত শিক্ষা-দীক্ষা নেই। এ প্রচার নিশ্চয় মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের জন্য হচ্ছে না। কারণ আর যাই হোক, দরিদ্র নারীদের মত তাদের এতে এতটা প্রয়োজন নেই।

তবে এই প্রচারে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এর ফলে প্রাচীন আদর্শ বাতিল করে তার জায়গায় এমন এক আদর্শ কায়েম করার ব্যবস্থা হচ্ছে, যা কার্যান্বিত হলে, জাতির মানসিক ও দৈহিক অবলুপ্তি ঘটবে। পুরুষের দেহস্থিত সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের অপচয় সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্ররাজি যেসব আতঙ্ককর কথা বলছে, তা মোটেই অজ্ঞতা-প্রসূত কুসংস্কার নয়। যে গৃহস্থ তার সেরা বীজ উষর ভূমিতে বপন করে, বা যে কৃষক তার উৎকৃষ্ট ক্ষেতে এমন ভাবে ভাল বীজ নিয়ে থাকে যে, তা যেন অঙ্কুরিত না হয়, তাদের আর কি বলা যেতে পারে? ভগবান মানুষকে অতুলনীয় জীবনীশক্তি বিশিষ্ট বীজের অধিকারী করেছেন এবং নারীকে দিয়েছেন এমন ক্ষেত্র, সমগ্র ভূমণ্ডলে যার জুড়ি নেই। মানুষ তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদের অপচয় করবে—এটা নিশ্চয় চূড়ান্ত মূর্খতা। অতীব মুল্যবান হীরা-জহরতের চেয়েও সতর্কভাবে এর হেফাজত করা প্রয়োজন। এইভাবে যে নারী তার প্রাণদায়িনী ক্ষেত্রে জেনেশুনে নষ্ট হতে দেবার জন্য বীজ গ্রহণ করে, সেও অপরিসীম মূঢ়তার দোষে দোষী। এদের উভয়েই নিজ সম্পদের দুরুপযোগের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং তাদের যা দেওয়া হয়েছিল, তা তারা হারাবে। রতিকামনা মহৎ ও সুন্দর এতে সন্দেহ নেই। এতে লজ্জাবোধ করার কিছু নেই। কিন্তু শুধু সৃষ্টিতেই এর সার্থকতা। এছাড়া অন্য কোনভাবে এর প্রয়োগ ঈশ্বর ও মানবতার বিরুদ্ধে পাপ-স্বরূপ। কোন না কোন প্রকারের গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম আগেও ছিল এবং

ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে সেকালে এর ব্যবহার পাপজনক বলে মনে করা হ'ত। আমাদের যুগের কেরামতি হচ্ছে পাপকে পুণ্য বলে চালানো। গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতির প্রচারকরা ভারতের যুবকদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছেন এই যে, আমি যাকে ভ্রান্ত আদর্শ মনে করি, তাঁরা তাদের মাথায় তাই ঢোকাচ্ছেন। যেসব যুবক-যুবতীর হাতে ভারতের ভাগ্য নির্ভরিত, তারা যেন এই মেকী ভগবান সম্বন্ধে সতর্ক হয় এবং ভগবান তাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা যেন তারা সযত্নে রক্ষা করে ও ইচ্ছা হলে যেজন্য এর সৃষ্টি সে কাজে এর ব্যবহার করে।

হরিজন ২৮-৩-১৯৩৬

৬৩। একটি যুবকের অসুবিধা

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক পত্রলেখক আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধ হতে উদ্ভূত একটি সংশয়ের নিরসন করতে চান। যদিচ অজ্ঞাতনামা লেখকদের পত্র উপেক্ষা করাই হচ্ছে আমার রীতি, তবু বর্তমান ক্ষেত্রের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা থাকলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলতে পারে।

হিন্দীতে লিখিত অনাবশ্যক দীর্ঘ পত্রটির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :—

"আপনার লেখা পড়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনি যুবকদের মন আদৌ বুঝেন কিনা। আপনি যা পেরেছেন প্রত্যেকটি যুবকের পক্ষে তা পারা সম্ভব নয়। আমি বিবাহিত। আমি নিজেকে সংযত করতে পারি। আমার স্ত্রী পারেন না। তিনি সন্তানাদি চান না, কিন্তু আনন্দ-উপভোগে ইচ্ছুক। আমার কি করা উচিত? তাঁকে তৃপ্ত করা কি আমার কর্তব্য নয়? আমার এতটা ঔদার্য নেই যে তিনি অন্য কারও দ্বারা তৃপ্তি পাচ্ছেন—এ আমি তাকিয়ে দেখব। কাগজে পড়ি যে আপনি বিয়ে দেবার বিরুদ্ধে নন এবং নবদম্পতীকে আশীর্বাদও জানিয়ে থাকেন। আপনি নিশ্চয় জানেন বা আপনার জানা উচিত যে, সেসব বিবাহ, আপনি যেসব উচ্চাদর্শের কথা বলেন, তার জন্য হয় না।"

পত্রলেখক ঠিক কথাই বলেছে। উভয়পক্ষের বয়স, ব্যয়সংক্ষেপ করা ইত্যাদি আমার যেসব সর্ত আছে, তা যখন পূর্ণ হয়, তখনই আমি কোন বিবাহে আশীর্বাণী পাঠাই। আর এতে কিয়ৎ পরিমাণে এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমি অন্তত এ দেশের যুবকদের এতটুকু জানি, যাতে তারা উপদেশ চাইলে আমি তাদের পথ নির্দেশ করতে পারি।

এই পত্রলেখকের ব্যাপারটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সে সহানুভূতির পাত্র। নরনারীর

দৈহিক মিলনের একমাত্র লক্ষ্য যে প্রজনন—আমার কাছে একথা প্রায় একটা নূতন আবিষ্কারের কোঠায় পড়ে। অবশ্য এ নিয়ম আমি আগেই জানতাম ; তবে কথনও এর এত গুরুত্ব দিই নি। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত একে আমি স্রেফ একটা সদিচ্ছা বলেই জানতাম। এখন আমি একে বিবাহিত জীবনের অবশ্য পালনীয় নীতি মনে করি এবং এর সুমহান গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে এ নীতি পালন করা সহজ প্রতীয়মান হবে। এই বিধান সমাজে যথোচিত মর্যাদায় স্বীকৃত হলেই আমার লক্ষ্য পূর্ণ হবে। আমার কাছে এ এক প্রাণবন্ত বিধি। সদাসর্বদা আমরা এ বিধান ভঙ্গ করি ও তার জন্য উচ্চহারে জরিমানা দিই। পত্রলেখক যদি এর অপরিমেয় গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন এবং স্ত্রীর প্রতি তাঁর যদি প্রেমভাব থাকে ও নিজের উপর থাকে বিশ্বাস, তবে নিশ্চয় সে তার পত্নীকে নিজমতে দীক্ষিত করতে পারবে। "আমি নিজেকে সংযত করতে পারি"—এই কথা বলার সময় পত্রলেথক নিজ সততা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় কিনা ? তার ক্ষেত্রে এই পাশব কামনা কি প্রতিবেশীর সেবা বা ঐ জাতীয় কোন উচ্চ কামনায় রূপান্তরিত হয়েছে ? পত্নীর বাসনা উদ্দীপিত করার জন্য কোন কিছু করা থেকে কি সে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে ? পত্র-লেখকের জেনে রাখা উচিত যে, হিন্দু-বিজ্ঞান অষ্টবিধ প্রকারের সঙ্গমের কথা বলে এবং এর ভিতর এমন কি আকারে ইঙ্গিতে যৌন বিষয়ের উল্লেখের কথাও এসে পড়ে। সে কি এসব হতে মুক্ত ? এর জবাব যদি হয় "না", এবং সে যদি পত্নীকে কামবাসনা থেকে নিবৃত্ত করতে চায়, তবে সে যেন স্ত্রীকে পবিত্রতম প্রেম দিয়ে ঘিরে রাখে, এ সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক বিধান সে যেন স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেয় এবং প্রজননের ইচ্ছা ব্যতিরেকে নরনারীর মিলনের কি দৈহিক ফল, তা যেন স্ত্রীকে বোঝায় এবং বীর্য যে কি পদার্থ, তাও যেন স্ত্রীকে জানায়। এছাড়া তাকে তার স্ত্রীর আচার ব্যবহারে সুস্থ ভাব এনে দিতে হবে এবং তার খাদ্য, ব্যায়াম আদির নিয়ন্ত্রণ করে তার কামবৃত্তিকে ক্রমশঃ সুপ্ত করে দিতে হবে। সর্বোপরি সে যদি ধর্মপথের পথিক হয়, তবে স্ত্রীর ভিতর নিজ জীবন্ত বিশ্বাস সঞ্চালিত করার প্রয়াসী হবে। কারণ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, ঈশ্বর অর্থাৎ জীবন্ত সত্যের প্রতি জলন্ত বিশ্বাস ছাড়া ইন্দ্রিয় দমনের নীতি পুরাপুরি অনুসরণ করা অসম্ভব। আজকাল জীবন থেকে ভগবানকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি জলন্ত বিশ্বাস ছাড়াই উচ্চ-মার্গের জীবনে উন্নীত হবার দুরাশা পোষণ করা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, নিঃসন্দেহে নিজের চেয়ে অধিক ক্ষমতা বিশিষ্ট এক শক্তিতে অবিশ্বাসী এবং এমন কি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকারেও অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের আমি সত্যের এ বিধান বোঝাতে অসমর্থ। নিজ অভিজ্ঞতার বলে আমি এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছি যে, যে জীবন্ত বিধানের করাঙ্গুলী হেলনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, তাঁর প্রতি অবিচল আস্থা ছাড়া জীবনের পূর্ণবিকাশ অসম্ভব। যার এ বিশ্বাস নেই, সে সমুদ্রের ক্রোড়বিচ্যুত এক বিন্দু জলের মত পলকে বিলুপ্ত হবে। অথচ সাগরের প্রতিটি বারিবিন্দু এর মহান রূপের অংশীদার এবং আমাদের জীবন সুধাদান করার গরবে গরবী।

হরিজন ২৫-৪-১৯৩৬

৬৪। আদর্শ গ্রামসেবক *

আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, এই বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে আমি একটু সংশয় ভাব প্রকাশ করেছিলাম। উপযুক্ত মাল-মশলা বা গ্রামের কাজ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। আমার মনে সন্দেহ ছিল যে, এ শিক্ষায় ছাত্ররা বিশেষ কিছু জ্ঞান আহরণে সমর্থ হবে কিনা। আমার মনে আরও একটি সন্দেহ ছিল যে, এখানে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আসবে কিনা এবং এলেও তারা গ্রামসেবার উপযুক্ত হবে কিনা। এখন আমি সানন্দে বলছি যে, এযাবৎ কাল পর্যন্ত আমার আশঙ্কা অমূলক বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং তিনমাসের এই সংক্ষিপ্ত মেয়াদের ভিতর আমরা আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করেছি।

আজ কিন্তু আমি তোমাদের কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বলব ও কিভাবে সে কর্মপন্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তার আলোচনা করব।

ভবিষ্যৎ রচনা বলতে আজকাল যা বোঝায়, তোমরা কিন্তু সেজন্য এখানে আসনি। আজ টাকা আনা পয়সা দিয়ে মানুষের মূল্য যাচাই করা হয় এবং মানুষের শিক্ষাও দোকানদারীর জিনিসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তোমরা সেই মানদণ্ড সম্বল করে যদি এখানে এসে থাক, তবে হতাশ হতে বাধ্য। শিক্ষণকালের অবসানে হয়ত নামমাত্র মাসিক দশ টাকা পারিশ্রমিকে তোমাদের কর্মজীবনের সূচনা হবে এবং এই দশ টাকাতেই এর অবসান হবে। একটি বড় অফিসের পরিচালক বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী যা পায়, তার সঙ্গে এর তুলনা করলে চলবে না। আমাদের প্রচলিত মূল্যাঙ্কন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। আমরা তোমাদের কাছে কোন ইহজাগতিক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম। বস্তুতঃ তোমাদের মনে যাতে ঐ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা না জাগে, আমরা তার জন্য চেষ্টা করতে

* ওয়ার্ধার মগনবাড়ীতে গ্রামসেবক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

চাই। তোমাদের মাসিক ৬৲ টাকায় খাইখরচ চালাতে হবে। একজন আই. সি. এস-এর হয়ত মাসিক ৬০৲ টাকা খাইখরচ পড়ে। কিন্তু তাই বলে তিনি কোন ক্রমে দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দিক থেকে তোমাদের চেয়ে উঁচু নন বা উঁচু হবেনও না। এত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করা সত্ত্বেও তিনি হয়ত সর্বপ্রকারে তোমাদের চেয়ে হীন হতে পারেন। আমার মনে হয় তোমরা নিজ যোগ্যতার পরিমাপ রজতখণ্ড দিয়ে কর না বলেই এই প্রতিষ্ঠানে এসেছ। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে দেশকে তোমাদের সেবা দেওয়াতেই তোমরা আনন্দ অনুভব কর। কেউ হয়ত ফাটকা বাজারে হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন; কিন্তু আমাদের কাজের পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমাদের এই দীন পরিবেশে তাঁরা অসুখী বোধ করবেন এবং তাঁদের ওখানে আমরা অস্বস্তিবোধ করব। আমরা দেশ-হিতার্থে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ আদর্শ শ্রমিক চাই। যেসব গ্রামবাসীর সেবা করতে হবে, তারা কি খাদ্য দিল বা আরামের অন্যবিধ কি বন্দোবস্ত করল, সেসব কথা নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে না। যা কিছু প্রয়োজন, তার জন্য তারা ভগবানের উপর ভরসা রাখবে এবং দুঃখ দৈন্য ও কষ্টের মাঝে পড়ে জয়োল্লাসে মত্ত হবে। আমাদের মত যে দেশে সাতলক্ষ গ্রামের কথা ভাবতে হয়, সেখানে এ অপরিহার্য। নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং পেনসন ইত্যাদি যারা সর্বদা নিজ দৃষ্টিপথে জাগরূক রাখেন, সে জাতীয় বেতনভুক কর্মচারী দিয়ে এ কাজ হবার নয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বস্ততা সহকারে সেবা করাই এ কাজের পারিতোষিক।

তোমাদের ভিতর কেউ কেউ হয়ত জানতে চাইবে যে গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মানও কি এই রকম? মোটেই না। ওরকম ভবিষ্যৎ আমাদের মত সেবকদের, আমাদের প্রভু গ্রামবাসীদের অবস্থা এরকম হবে না। বহুকাল আমরা তাদের ঘাড়ে চড়েছি। তাই স্বেচ্ছায় এখন আমরা ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এইজন্য বরণ করে নিতে চাই, যাতে আমাদের প্রভু গ্রামবাসীদের অবস্থা এখনকার চেয়ে অনেক ভাল হয়। আজ তাদের যা রোজগার, তার চেয়ে অনেক বেশী তারা যাতে উপার্জন করে, আমাদের তার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের লক্ষ্যও এই। আগে যে জাতীয় সেবকদের কথা বলেছি, সেইরকম সেবকদের সংখ্যা যদি ক্রমশঃ না বাড়তে থাকে, তবে গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের উন্নতি হবে না। তোমরা যেন সেইজাতীয় সেবক হও।

হরিজন ২৩-৫-১৯৩৬

৬৫। এ দুঃখ এড়ানো যেত

জনৈক পত্রলেখকের বেদনা ভরা দীর্ঘ পত্র থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করছি।

"আমি ৬৭ বৎসর বয়স্ক জনৈক স্কুলের শিক্ষক। আজীবন (৪৬ বৎসর) আমি শিক্ষা বিভাগে আছি। বাঙলা দেশের এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আমার জন্ম। আমাদের বংশের এক কালে সুদিন ছিল; কিন্তু এখন সে শুধু স্বপ্নের কাহিনী। ভগবান অসীম করুণা (?) পরবশ হয়ে আমাকে সাতটি কন্যা ও দুটি পুত্র দিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গত আশ্বিনে ২০ বৎসর বয়সে মারা গেছে এবং আমরা তার অসহায় পিতা মাতা তার বিয়োগ ব্যথায় অশ্রু মোচন করছি। ছেলেটির ভিতর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল এবং সেই ছিল আমাদের জীবনের একমাত্র আসাস্থল। মেয়েদের মধ্যে পাঁচটির বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আমার ষষ্ঠ ও সপ্তম কন্যা (বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৬) এখনও অবিবাহিতা। আমার কনিষ্ঠ পুত্র এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তার বয়স ১১ বৎসর মাত্র। আমি সর্বসাকুল্যে ৬০৲ টাকা বেতন পাই। এতে আমার দিন চলাই ভার। আমার কোন পুঁজি-পাটা নেই। ঋণে আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি। আমার ষষ্ঠ কন্যার বিবাহ স্থির হয়েছে। বিবাহের গহনা বাবদ কম পক্ষে ৯০০৲ টাকা এবং নগদ পণ ৩০০৲ টাকা লাগবে। কানাডার সান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে আমার ২০০০৲ টাকার একটি জীবন বীমা করা আছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বীমা করা হয়। কোম্পানী আমাকে এখন মাত্র ৪০০৲ টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত। এতে বিবাহের অর্ধেক ব্যয়েরও সংস্থান হবে না। বাকি অর্থ জোগাড় করার কোন উপায় আমার সামনে নেই। আপনি কি এই হতভাগ্য পিতাকে বাকি টাকাটা জোগাড় করে দিতে পারেন না ?"

এ জাতীয় আরও বহু পত্র আমি পেয়ে থাকি। এর বেশীর ভাগই অবশ্য হিন্দীতে লিখিত থাকে। কিন্তু আমরা জানি যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে মেয়ের অভিভাবকদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে। কারণ ইংরাজী শিক্ষিত পিতার ইংরাজী জানা মেয়ের জন্যে ইংরাজী শিক্ষিত সম্ভাব্য পাত্রের বাজার দর এর ফলে চড়ে গেছে।

বাঙলা দেশের এই পিতার ক্ষেত্রে তাঁকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহায়তা দেবার উপায় তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ বা দানস্বরূপ দেওয়া নয়। তাঁকে বাঁচাবার উপায় হচ্ছে মেয়ের জন্য ছেলে না কিনতে তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করা ও টাকার জন্য নয়,

ভালবেসে তাঁদের মেয়েকে বিবাহ করবে এমন একটি পাত্র হয় তিনি আর নয় মেয়েকে দিয়ে বাছাই করানো। এর অর্থ হচ্ছে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা। জাতি ও প্রদেশের যুগ্ম প্রাচীর ভাঙ্গতে হবে। ভারত যদি এক ও অবিভাজ্য হয়, তবে এর ভিতর নিশ্চয় এমন সব কৃত্রিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগ থাকতে পারে না, যারা এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া বা বিয়ে-সাদি করবে না। এই নিষ্ঠুর প্রথার ভিতর ধর্মের নাম গন্ধ নেই। ''দু' এক জনে আর কি করতে পারে ? তাই সমগ্র সমাজ এই পরিবর্তনের অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।''—এসব যুক্তি অচল। অভীমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক মনুষ্যত্ব বিরোধী প্রথা ও আচারের অচলায়তনে আঘাত না হানা পর্যন্ত এযাবৎ কোন সংস্কার সাধিত হয়নি। আর তা ছাড়া পূর্বোক্ত শিক্ষক মহাশয়ও তাঁর কন্যা যদি বিবাহকে কেনা বেচার ব্যাপার মনে না করে পবিত্র প্রণয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করেন (অর্থাৎ এর আসল মর্যাদা স্বীকার করেন), তাহলে তাঁদের আর কষ্ট পাবার কারণ থাকে না। সুতরাং পত্র-লেখকের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে তিনি যেন সাহস সহকারে ঋণ বা ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা বর্জন করেন এবং মেয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতি বা প্রদেশের কথা মন থেকে মুছে ফেলে মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র জোগাড় করে জীবন বীমার ঐ চার শ' টাকারও সাশ্রয় করেন।

হরিজন ২৫-৭-১৯৩৬

৬৬। মেয়েদের কি চাই

একজন বিবেচক পত্র লেখক লিখছেন :

"আপনার 'যে দুঃখ এড়ানো যেত' শীর্ষক রচনাটি আমার মতে অসম্পূর্ণ। বাবা মা কিসের জন্য মেয়েদের বিয়ে দেবার উপর জোর দেবেন এবং কেনই বা তার জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করবেন ? অভিভাবকরা যদি তাঁদের মেয়েদের ছেলেদেরই মত শিক্ষা দেন এবং এর ফলে তারা যদি স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করতে শেখে, তাহলে মেয়েদের জন্য পাত্র বাছাইএর ঝঞ্ঝাটে তাঁদের আর পড়তে হবে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, মেয়েরা যখন তাদের মন গড়ে নেবার যথোপযুক্ত সুযোগ পাবে এবং সম্মানজনক উপায়ে তারা যখন দিন কাটাতে শিখবে, তখন তাদের আর কোন অসুবিধা হবে না। উপযুক্ত পাত্র খুঁজে তারা তখন নিজেরাই বিয়ে করে নিতে পারবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে মেয়েদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষা দেবার স্বপক্ষে আমি ওকালতি করছি। আমি জানি যে সহস্র সহস্র

মেয়েদের এ স্থযোগ ঘটবে না। আমি শুধু চাই যে মেয়েরা জ্ঞানার্জন করুক ও কোন প্রয়োজনীয় বৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হোক। এতে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জগতের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং মাতাপিতা বা ভবিষ্যৎ স্বামীর উপর নির্ভরশীল হবে না। বস্তুতঃ আমি এমন অনেক মেয়ের কথা জানি, যারা স্বামী পরিত্যক্তা হবার পর এখন আবার স্থখেশান্তিতে স্বামীর ঘর করছে আর এর মূলে আছে একাকিনী থাকাকালীন তাদের আত্মনির্ভরশীল হবার ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাবার সৌভাগ্য। আপনি যদি বিবাহযোগ্যা মেয়েদের অভিভাবকদের অস্থবিধার কথা আলোচনা কালে এই বিষয়টির উপর জোর দিতেন, তবে বড় ভাল হ'ত।"

আমি উৎফুল্ল অন্তঃকরণে পত্রলেখকের অভিমত সমর্থন করি। আমাকে শুধু এমন একজন পিতার বিষয়ে লিখতে হয়েছিল, যিনি কন্যার অযোগ্যতার জন্য দুঃখের দায়ভাগী হননি। তিনি দুঃখ পাচ্ছিলেন এইজন্য যে তিনি স্বয়ং এবং বোধ হয় তাঁর কন্যাও পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে নিজ জাতের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চাইছিলেন। এক্ষেত্রে কন্যার যোগ্যতাই প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল। মেয়েটি অশিক্ষিতা হলে যে কোন যুবকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারত। কিন্তু নিজে "শিক্ষিতা" হবার জন্য মেয়েটিও তার মত 'শিক্ষিত' পাত্র চাইছে। দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে কোন মেয়েকে বিয়ে করার মত ক্ষুদ্রাশয়তাও স্পষ্ট অযোগ্যতা বলে পরিগণিত হয় না। কলেজের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ এক নকল মূল্যারোপ করা হয়। এর অন্তরালে বহু পাপ চাপা পড়ে যায়। মেয়েদের বিয়ে করার জন্য যে সম্প্রদায়ের যুবকরা টাকা আদায় করে, তাদের ভিতর "শিক্ষিত" কথাটি যদি আর একটু বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে প্রযুক্ত হ'ত, তাহলে মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহের সমস্যা একেবারে মিটে না গেলেও বহুল পরিমাণে সরল হয়ে যেত, স্থতরাং অভিভাবকদের কাছে এই বিবেচক পত্র লেখকের প্রস্তাব সপ্রসংশ ভাবে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি জাতিভেদ প্রথার ভয়াবহ বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেব। এই প্রাচীর ভাঙ্গতে পারলে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে এবং অর্থ আদায় করার প্রবৃত্তির অনেকটা উপশম হবে।

হরিজন ৫-৯-১৯৩৬

৬৭। উচ্ছৃঙ্খলতার অভিমুখে

জনৈক যুবক নিম্নরূপ এক পত্র লিখেছে :

"আপনি চান যে জগতকে পরিবর্তিত করার জন্য প্রত্যেকটি মানুষই যেন কঠোর নীতিশাস্ত্রপন্থী হয়ে ওঠে। নৈতিকতা বলতে আপনি যে ঠিক কি বোঝেন, তা আমি জানি না। শুধু যৌন ক্ষেত্রে আপনি একে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, না মানুষের প্রত্যেকটি আচার ব্যবহারকে এর অধিকারভুক্ত করতে চান, তা আমার জানা নেই। আমার মনে হয় প্রথমটিই আপনার অভিপ্রেত। কারণ আমি কখনও আপনার পুঁজিপতি ও জমিদার বন্ধুদের এমন কথা বলতে শুনিনি যে, শ্রমিক ও কৃষকদের শোষণ করে বিরাট মুনাফা করে তারা কি অন্যায় ও অনিষ্ট করে চলেছে। পক্ষান্তরে যৌন বিষয়ক ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য ক্রমাগত যুবক-যুবতীদের ভর্ৎসনা করা থেকে আপনি কখনও ক্ষান্ত হননি এবং তাদের কাছে প্রতিনিয়ত চির-কৌমার্য ব্রতের গুণগান করেছেন। আপনি ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের মনের কথা জানেন বলে দাবী করেন। আমি নিজেকে কারও প্রতিনিধি বলে দাবী করছি না। তবে স্বয়ং একজন যুবক হিসাবে আমি আপনাকে আপনার দাবীর যথার্থতা প্রমাণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমান যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবককে কি রকম পরিবেশের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়, তা আপনি জানেন বলে মনে হয় না। দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব, শ্বাসরোধকারী সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার এবং সহ শিক্ষার প্রলোভন যে কি ভীষণ তা কথায় বুঝিয়ে ওঠা ভার। এ হচ্ছে পুরাতন ও নূতন ভাবাদর্শের দ্বন্দ এবং এর ফল হচ্ছে যুব শক্তির পরাজয় ও দুর্দশা। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে যুবকদের প্রতি আপনি আর একটু অনুকম্পা-পরায়ণ হোন এবং তাদের আপনার নৈষ্ঠিক নৈতিকতার তুলাদণ্ডে পরিমাণ করবেন না। যদি পারস্পারিক সম্মতি ও প্রেম থাকে, তবে বিবাহিত বা বিবাহেতর—যাই হোক না কেন, প্রতিটি দৈহিক মিলনই নীতিশাস্ত্রসম্মত। গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হবার পর থেকে বিবাহ প্রথার দৈহিক পবিত্রতার দিকটির আর প্রয়োজনীয়তা নেই। এখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তানের জন্মদান ও তাদের লালন পালন করা। আপনি হয়ত এই বিচারধারার পরিচয় পেয়ে মর্মাহত হবেন। এই ক্ষেত্রে আমি কথঞ্চিৎ স্পর্ধার পরিচয় দেব। আজকালের যুবকদের কথা বিচার করার সময় আমি আপনাকে আপনার যৌবনের কথা মনে করতে বলব। আপনি অতি মাত্রার যৌন ক্ষুধার শিকার ছিলেন এবং যৌন তৃপ্তির স্রোতে

এক রকম গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হয় এই জন্য পরে আপনার মনে দৈহিক মিলনের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব জাগ্রত হয়েছে ও এই কারণেই আপনি এখন সন্ন্যাস অবলম্বন করে এত বেশী পাপ পুণ্যের বিচার করছেন। আমার মনে হয়ে আপনার তুলনায় আজকালকার বহু যুবককে ভাল বলতে হবে।"

এ হচ্ছে এক জাতীয় পত্রের নিখুঁত উদাহরণ। আমার মনে হয় আমি যে গত তিন মাস ধরে পত্রলেখকের সঙ্গে পরিচিত, তারই ভিতর তার কয়েকবার পরিবর্তন ঘটেছে। এখনও সে এক সংকট কালের ভিতর দিয়ে চলেছে। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার একটি দীর্ঘ পত্র থেকে। ঐ চিঠি এবং ঐ জাতীয় আরও যেসব চিঠি সে আমাকে লিখেছে, তা প্রকাশ করা সম্বন্ধে তার সানন্দ সম্মতি আছে। তবু আমি যেটুকু উদ্ধৃত করেছি, তা হচ্ছে শুধু এক শ্রেণীর যুবকের মনোভাবের প্রতিচ্ছবি।

নিঃসন্দেহেই আমি যুবক-যুবতীদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ। আমার যৌবন-কালের ঘটনাবলীর হুবহু স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে। আর দেশের যুব-শক্তির উপর আমার অটল আস্থা আছে বলেই তাদের সামনে যেসব সমস্যা উপস্থিত হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে কখনও আমি ক্লান্তি বোধ করি না।

আমার কাছে নৈতিক, শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয়—এই সব শব্দগুলি পরিবর্তনশীল। ধর্মের সম্পর্কবিহীন নৈতিক জীবন হচ্ছে বালুচরে কেল্লা গড়ার মত। এবং নৈতিকতা বর্জিত ধর্ম হচ্ছে কাঁসর তৈরী করার পিতলের মত। এদিয়ে শুধু জোর আওয়াজ বেরোয় ও লোকের মাথা ফাটানো চলে। নৈতিকতার ভিতর সত্য অহিংসা এবং জিতেন্দ্রিয়তা অন্তর্নিহিত। এযাবৎ মানুষ যেসব সদ্‌গুণের আচরণ করেছে তার প্রত্যেকটির মূলে আছে এই ত্রিবিধ মৌলিক সদ্‌গুণ। আবার অহিংসা ও জিতেন্দ্রিয়তার জন্ম হচ্ছে সত্য থেকে এবং এই সত্যই আমার কাছে ঈশ্বর।

ইন্দ্রিয় দমন ছাড়া নরনারীর ধ্বংস অনিবার্য। রিপুর উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার অর্থ মাস্তুলবিহীন জাহাজের যাত্রী হওয়া। প্রথম প্রস্তরটির সংস্পর্শে এসেই এ জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। এইজন্য আমি ইন্দ্রিয় সংযমের উপর এত জোর দিই। পত্রলেখক ঠিকই বলেছেন যে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামের আবিষ্কার হবার ফলে যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণে পরিবর্তন এসে গেছে। বিবাহিত বা বিবাহেতর বিচার ছাড়াই শুধু পারস্পারিক সম্মতি যদি দৈহিক মিলনকে নৈতিকতা সম্মত আখ্যা দেবার মানদণ্ড হয়, এবং এই একই কারণে যদি সমকামিতা ও সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে যৌন বিষয়ে নৈতিকতা বিচারের সমগ্র বনিয়াদই অদৃশ্য হয়ে যায় এবং দেশের যুবকদের কপালে 'পরাজয় ও দুর্দশা' ছাড়া আর কিছু থাকে না। ভারতবর্ষে

এমন বহু যুবক-যুবতী পাওয়া যাবে, যারা পারস্পারিক দৈহিক মিলনের তীব্র বাসনা থেকে মুক্তি পেলে আনন্দিত হবে। আজ এর কবলে পড়ে তারা ছট্ ফট্ করছে। মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার জন্য এই বাসনার মত তীব্র নেশার খোঁজ এযাবৎ মনুষ্য সমাজের ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম যে শুধু সন্তানোৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে, এ আশা করা ভুল। যতক্ষণ যৌন ক্রিয়া নিশ্চিত ভাবে সন্তানের জন্মদানের সম্ভাবনার সঙ্গে সম্বন্ধিত থাকে, ততক্ষণই কলাময় জীবনের আশা থাকে। এই কারণে যৌন বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমাদের বাতিল করতে হয়। যৌন ক্রিয়াকে তার স্বাভাবিক পরিণামের সম্পর্করহিত করাকে যদি অস্বাভাবিক পাপ কার্যের সমর্থন আখ্যা নাও দেওয়া যায়, তবে একথা ঠিক যে এর ফলে ভীষণ বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হবে।

যৌন সমস্যার বিবেচনার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে বলে যেসব পাঠক আমার আত্মকথার এতদ্‌সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি পড়েননি, তাঁদের পত্রলেখক কর্তৃক উক্ত "পাপপুণ্য বিচার ও যৌনতৃপ্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া" সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। আমার গা ভাসিয়ে দেবার একমাত্র পাত্রী ছিলেন আমার স্ত্রী এবং আমি এমন এক বিরাট যৌথ পরিবারে মানুষ, যেখানে রাত্রে মাত্র ঘণ্টাকয়েক ব্যতীত গোপন মিলনের অন্যবিধ সুযোগ ছিল না। আমার বয়স যখন মাত্র ২৩ বৎসর, তখন আমি এই বাড়াবাড়ি-রূপ মূর্খতা সচেতন হই এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালনের সংকল্প করি। আমাকে সন্ন্যাসী বলা ভুল। যে আদর্শ দ্বারা আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত, তা প্রত্যেকটি মানব সন্তান কর্তৃক অনুসৃত হতে পারে। উৎক্রান্তির পন্থানুসরণ করে আমি এ আদর্শে উপনীত হয়েছি। যথেষ্ট চিন্তা ও বিচার বিবেচনার পর একএকটি পদক্ষেপ করতে হয়েছে। আমার বিবেক ও অহিংসার সৃষ্টি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং লোকসেবার প্রয়োজনের তাগিদে এর জন্ম। দক্ষিণ আফ্রিকায় গৃহস্থ, আইনজীবি, সমাজ সংস্কারক বা রাজনৈতিক কর্মী—যখন যে জীবনই গ্রহণ করি না কেন, সম্যক ভাবে আমার সে কর্তব্য পালনের জন্য কঠোর ভাবে যৌনজীবন নিয়ন্ত্রণ করা ও নিষ্ঠাসহকারে সত্য ও অহিংসা পালন করা অপরিহার্য ছিল। স্বদেশীয় বা ইউরোপীয়ান —প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার কালে এর একান্ত প্রয়োজনীয়তা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। আমি সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচুদরের কিছু নই এবং আমার যোগ্যতা সাধারণের চেয়েও কম। আর অমিত প্রযত্নের ফলে আমি যতটুকু অহিংসা বা জিতেন্দ্রিয়তার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছি, তার জন্য আমার যে বিশেষ কোন প্রতিভা আছে, এমন কোন্ দাবী আমি পোষণ করি না। আমার

তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমার মত চেষ্টা করলে ও আমারই মত বিশ্বাস এবং আশায় অনুপ্রাণিত হলে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে আমি যা করছি, তা করা সম্ভব। বিশ্বাস বিহীন কার্য হচ্ছে অতল খাদের তলে পৌছাবার প্রচেষ্টার মত।

হরিজন ৩-১০-১৯৩৬

৬৮। যৌন শিক্ষা

গুজরাটের মত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আজকাল যৌন গৃঢ়ৈষা ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হচ্ছে। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে যারা এর কবলিত হয়, তারাই আবার মনে করে যে এ যেন একটা গৌরবের বিষয়। ক্রীতদাস যখন তার লৌহ-বলয় সম্বন্ধে গর্বানুভব করে ও মূল্যবান অলঙ্কারের মত তার প্রতি আসক্ত হয়, তখনই বুঝতে হবে যে সেই ক্রীতদাসের প্রভুর পূর্ণ বিজয় লাভ হয়েছে। কিন্তু রতিদেবতার এই আপাতদৃষ্টিতে নয়নমোহনকারী সাফল্য অবশেষে যে ক্ষণস্থায়ী ও অবাঞ্ছিত মনে হবে, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। নির্বিষ বৃশ্চিকের মত শেষ পর্যন্ত এ শূণ্যগর্ভ বলে প্রমাণিত হবে। তবে তার অর্থ এ নয় যে ইত্যবসরে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। এর পরাভবের নিশ্চয়তা যেন আমাদের অলীক নিরাপত্তার সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন করতে না পারে। কোন পুরুষ বা রমণীর অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিপ্রকাশ হচ্ছে কামনা বাসনার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। বাসনাজয়ী না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিজের উপর রাজত্ব করার আশা পোষণ করতে পারে না। আর আত্মশাসন বিনা স্বরাজ বা রামরাজত্বের ভরসা নেই। আত্ম-শাসন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণকে শাসন করতে যাওয়া আত্মপ্রতারণার নামান্তর মাত্র। এ যেন সুন্দর রঙ করা মাটির আম। বাইরে থেকে দেখতে মনোহর; কিন্তু আসলে অন্তঃসারশূন্য। যে কর্মী নিজ কামনা বাসনা সংযত করতে শেখেনি, সে হরিজন সেবা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খাদি, গোরক্ষা বা গ্রামোন্নয়ন আদি কোন ক্ষেত্রেই সত্যকার সেবা করতে পারে না। এই জাতীয় মহান কার্য শুধু বৌদ্ধিক সম্পদ দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এর জন্য নৈতিক ও আত্মিক শক্তি প্রয়োজন। আত্মার শক্তি আসে ঈশ্বর কৃপায় এবং যে বাসনার দাস, সে কখনও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করতে পারে না।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে এই—আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে যৌনবিজ্ঞানের স্থান কি হবে বা আদৌ এর কোন স্থান থাকবে কিনা? যৌনবিজ্ঞান দুই প্রকারের। এক রকম যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তি শেখায় ও অপরটি যৌন উত্তেজনা বাড়ায়

ও এর খোরাক সংগ্রহে প্রবুদ্ধ করে। প্রথমোক্ত শিক্ষা ছেলেমেয়েদের জন্য যতটা প্রয়োজন, দ্বিতীয় ধরণের শিক্ষা ঠিক ততটাই ক্ষতিকারক ও বিপদজনক বলে একান্ত বর্জনীয়। কামকে মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু আখ্যা দিয়ে সকল ধর্ম ঠিকই করেছে। ক্রোধ বা বিদ্বেষকে সকলে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। গীতার মতে কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। গীতায় অবশ্য কাম কথাটি ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তবে যে সংকুচিত অর্থে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, গীতার উপদেশ সে অর্থেও সমান কার্যকারী।

অবশ্য তবুও মূল প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি থেকে যায়। কথা হচ্ছে এই যে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের প্রজনন যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কাম্য কিনা? আমার মনে হয় তাদের এ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্ঞান দান করা উচিত। বর্তমানে তাদের যে কোন উপায়ে এতদ্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় ও ফলে তারা পথভ্রান্ত হয়ে নানা রকম কুক্রিয়ার কবলে পড়ে। যৌন কামনা সম্বন্ধে জোর করে চোখ বুঁজে আমরা যথোচিত ভাবে এর নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে পারব না। সুতরাং আমি তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিজ প্রজনন যন্ত্রের তাৎপর্য ও যথাযথ উপযোগিতা শিক্ষা দেবার ঐকান্তিক সমর্থক এবং আমার উপর যেসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার পড়েছিল, তাদের আমি আমার স্বকীয় পদ্ধতিতে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি যে ধরণের যৌন শিক্ষা চাই, তার লক্ষ্য হবে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে এর থেকে নিবৃত্ত হওয়া। এ শিক্ষা স্বতঃই ছাত্রদের মানুষ ও পশুর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে, তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করবে যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়—এই উভয়বিধ বৃত্তির আধার হবার একমাত্র সৌভাগ্য হয়েছে শুধু মানুষেরই। তাদের জানতে হবে যে, মনুষ্য কথাটির শব্দ-রূপার্থের যথাযথ পরিচয় তাদের মাঝে আছে, অর্থাৎ তারা প্রবৃত্তি তাড়িত হলেও বিচারশীল জীব বটে। অতএব অন্ধ প্রবৃত্তির কাছে বিচার ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দেবার সমতুল। মানুষের ভিতর বিচারশক্তি ক্রমাভিব্যক্ত হয় ও প্রবৃত্তি যুক্তির দ্বারা চালিত হয়; কিন্তু পশুর ভিতর আত্মা চিরকালই সুপ্তিমগ্ন। হৃদয়কে সজাগ করার অর্থ নিদ্রামগ্ন আত্মাকে জাগরিত করা, যুক্তি বোধের ঘুম ভাঙ্গানো এবং সু ও কুর ভিতর পার্থক্য করার শক্তির স্ফুরণ ঘটানো।

সত্যকার এই যৌন বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবে কে? নিঃসন্দেহে যে ইন্দ্রিয় দমন করেছে সে-ই। জ্যোতিষ শাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন হয়, যাঁরা এসব বিষয় ভাল ভাবে জানেন ও এ সম্বন্ধে

শিক্ষা লাভ করেছেন। এই ভাবে যৌন বিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন বিজ্ঞান শেখবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন, যাঁরা এ সম্বন্ধে চর্চা করেছেন ও আত্মজয় করেছেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত না হলে সুমহান ভাবোদ্দ্যোতক বাক্যও নিষ্প্রাণ ও জড়বৎ প্রতীয়মান হয় এবং জনমানসে প্রবেশ করা ও হৃদয় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা এর থাকে না। অথচ আত্মোপলব্ধি ও সত্যকার অভিজ্ঞতার ফলে উৎসারিত বাক্যাবলী সর্বদা ফলপ্রসূ হয়।

আজকাল আমাদের সমগ্র পরিবেশ—পঠন, পাঠন, চিন্তা, সামাজিক আচার ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুকেই একধার থেকে কামোদ্দীপক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর হাত এড়ানো অতি কঠিন ব্যাপার। তবে নিঃসন্দেহে এ লেগে পড়ে থাকার মত কাজ। আত্মসংযমকে মানুষের সর্বোচ্চ কর্তব্য বিবেচনাকারী জনকয়েক মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষাগুরুও যদি থাকেন এবং তাঁরা যদি সত্যকার জ্বলন্ত বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ও তাঁরা যদি সদাজাগ্রত ও নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকেন, তাহলে তাদের প্রযত্নের ফলে গুজরাটের সন্তান-সন্ততির চলার পথ আলোকোদ্ভাসিত হবে, অজ্ঞজন কামুকতার পঙ্কে নিপতিত হবার হাত থেকে ত্রাণ পাবে এবং যারা ইতিপূর্বে এর কবলিত হয়েছে, তাদেরও পরিত্রাণের পথ পাওয়া যাবে।

হরিজন ২১-১১-১৯৩৬

৬৯। একটি ছাত্রের অসুবিধা

একটি ছাত্র প্রশ্ন করেছে:

"যে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ বা আণ্ডার-গ্রাজুয়েট যুবক দুর্ভাগ্যবশতঃ দু'তিনটি সন্তানের পিতা, এ অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনের জন্য সে কি করতে পারে? আর পঁচিশ বছর বয়সের আগেই যদি তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়া হয়, তা হলেই বা সে কি করতে পারে?"

এ প্রশ্নের সবচেয়ে সহজ জবাব যা মনে আসছে, তা হচ্ছে এই—যে ছাত্র তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহের পথ খুঁজে পায় না বা যাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে হয়, তার লেখাপড়া শেখার কোন মূল্য নেই। কিন্তু যাই হোক, তার কাছে আজ ঐ ব্যাপার অতীত ইতিহাস মাত্র। বিভ্রান্ত ছাত্রটিকে এমন ভাবে জবাব দেওয়া উচিত, যাতে তার সাহায্য হয়। তার চাহিদা যে কি, তা সে জানায় নি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে তার মনে ভয়ংকর একটা উচ্চাশা

যদি না থাকে এবং সে যদি নিজেকে সাধারণ একজন শ্রমিকের সমগোষ্ঠীর বলে বিবেচনা করে, তাহলে তার জীবিকা অর্জনে বিশেষ কষ্ট হবার কথা নয়। তার বুদ্ধি তার হস্তপদে অধিকতর কার্যদক্ষতা সঞ্চার করবে। সাধারণ শ্রমিকের নিজ কর্ম-কুশলতা বাড়াবার এ সুযোগ নেই। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, যে শ্রমিক ইংরাজী শেখেনি, তার বুদ্ধি নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রমিকদের মানসিক বিকাশের সুযোগ বিশেষ দেওয়া হয় নি এবং যারা স্কুল-কলেজের শিক্ষা পায়, তাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ এমন সব বাধার ভিতর দিয়ে হয়, যার নিদর্শন বিশ্বের কুত্রাপি বিরল। এই মানসিক বিকাশটুকুও আবার স্কুল ও কলেজ জীবনে অধিগত ভূয়া মর্যাদা জ্ঞান দ্বারা সমভার করে দেওয়া হয়। আর এই জন্য ছাত্ররা মনে করে যে তারা শুধু চেয়ারে বসেই নিজ জীবিকা উপার্জন করবে। প্রশ্নকর্তাকে তাই শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে এবং নিজের ও নিজ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহের জন্য এই দিকে নজর দিতে হবে।

তার স্ত্রী যে কেন অবসরকালকে কাজে লাগিয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করবে না, তা বোঝা যায় না। এছাড়া তার ছেলেমেয়েরা যদি কাজের উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদেরও কোন উৎপাদনমূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শুধু কেতাব-পত্র দ্বারাই বুদ্ধির বিকাশ সম্ভব, এই ভুল ধারণা বিসর্জন দিয়ে দ্রুততম গতিতে মনের বিকাশের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কারিগরী বিদ্যা শেখাতে হবে। হাত বা যন্ত্র-পাতিকে কেন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সঞ্চালন করতে হবে, ছাত্রকে পদে পদে এই শিক্ষা দেবার সূচনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যকার মানসিক বিকাশের সূত্রপাত হয়। সাধারণ শ্রমিকদের সমপর্যায়ভুক্ত হলে ছাত্রদের কর্মহীনতার সমস্যার সমাধান অবিলম্বে হতে পারে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ সম্বন্ধে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে ছাত্রদের এতখানি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি গড়ে তুলতে হবে, যার দ্বারা তারা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বিবাহ ব্যবস্থার প্রতিরোধ করতে পারে। একা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সর্ববিধ বিধিসঙ্গত প্রণালীতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ তো বটেই, তাদের যে কোন কিছু করানোর প্রতিরোধ করার প্রক্রিয়া ছাত্রদের শিখতে হবে।

হরিজন ৯-১-১৯৩৭

৭০। ছাত্রদের জন্য

"একটি ছাত্রের অসুবিধা" শীর্ষক যে নিবন্ধটি আপনি লিখেছেন, সে সম্বন্ধে যথোচিত বিনয় সহকারে আপনার বিবেচনার জন্যে আমার নিম্নরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করছি।

"আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি উল্লিখিত ছাত্রটির প্রতি ন্যায় বিচার করেননি। সমস্যাটির সমাধান অত সহজ নয়। আপনি তার প্রশ্নের ভাসা ভাসা জবাব দিয়েছেন। ছাত্রদের আপনি মর্যাদার ভুয়া অভিমান বর্জন করে সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হতে বলেছেন। এই সব সাধারণ কথায় আমাদের সমস্যার বিশেষ কিছু সমাধান হয় না। এবং এসব অন্ততঃ আপনার মত একজন চূড়ান্ত বাস্তবপন্থী ব্যক্তির উপযুক্ত নয়।

"দয়া করে এ সমস্যাটিকে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বিচার করুন এবং এর কোন বিশদ, বাস্তব ও সর্বাঙ্গীন সমাধান দিন। জবাব দেবার সময় বিশেষ করে নিম্নলিখিত উদাহরণটির কথা খেয়াল রাখবেন।

"আমি লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র। আমার বয়স প্রায় ২১ বৎসর। জ্ঞানার্জন আমার অতীব প্রিয় এবং এ জীবন থাকতে থাকতে যতটা সম্ভব জ্ঞান আহরণ করতে চাই। আমি আপনার জীবনাদর্শেও অনুপ্রাণিত। আর মাসখানেক পর যখন শেষ এম. এ. পরীক্ষা হয়ে যাবে, শুনছি তখন আমাকে জীবন সংগ্রামে প্রবেশ করতে হবে।

"স্ত্রী ছাড়া আমার আরও চারটি ভাই। তারা সব আমার চেয়ে ছোট এবং এদের মধ্যে একজন বিবাহিত। আমার বোন দুটি এবং তাদের বয়স বার বছরের নীচে। এছাড়া বাবা-মা রয়েছেন। এঁরা সবাই আমার উপর নির্ভরশীল। আমাদের বিশেষ কোন পুঁজিপাটা নেই। জমিজমা যা আছে, তাও যৎসামান্য।"

"ভাইবোনদের শিক্ষার জন্য আমি কি করব? তাছাড়া বোনেদের যখন বিয়ে দিতেই হবে, তখন বিশেষ দেরি করে আর লাভ কি? এসব ব্যাপার না হয় গেল। কিন্তু আমাদের খাওয়াপরাই বা জুটবে কি করে?

"আমি তথাকথিত উচ্চ জীবনমানের অদ্ধস্তাবক নই। আমার ও আমার প্রতি নির্ভরশীল প্রাণীগুলির দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করা ছাড়া আমি শুধু সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার মত মালমশলা চাই। দু' বেলা দু' মুঠো পুষ্টিকর আহার্য ও কয়েকটি পরিষ্কার পরিধেয় ছাড়া আমার বিশেষ কিছু কাম্য নেই।

"আমি আর্থিক দিক থেকে সৎ জীবন যাপন করতে চাই। সুদ খেয়ে বা চোখের পর্দা ঘুচিয়ে আমি বাঁচতে চাই না। দেশ-সেবার কাজ করার অভিলাষও আমার আছে। আপনার পূর্বোল্লিখিত মন্তব্যগুলি পালন করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

"কিন্তু এখন যে কি করি, তা বুঝে উঠতে পারছি না। কোথায় কি ভাবে কাজ আরম্ভ করি? আমার শিক্ষা শোচনীয়ভাবে পুঁথিগত ও কাগজ কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাঝে মাঝে আপনার সর্বব্যাধিহর ঔষধ সুতা কাটার কথা মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় কি ভাবে এ শিখব আর সুতা কাটা হলে তা দিয়েই বা কি করব?

"আচ্ছা, তা হলে আমার ক্ষেত্রে কি গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আপনি সুপারিশ করবেন? আপনাকে আমি জানিয়ে রাখি যে আমি আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্যের নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু ব্রহ্মচারী হতে হতেও তো কিছুদিন কেটে যাবে। যে আত্মসংযম আমরা চাইছি, পুরামাত্রায় তা অধিগত না হওয়া পর্যন্ত আমি যদি কৃত্রিম গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করি, তবে আমার ভয় হয় যে, সন্তানের জন্মদান আমি প্রতিরোধ করতে পারব না এবং এইভাবে আর্থিক দুর্দশাকে আমন্ত্রণ জানাব। তাছাড়া আমার মনে হয়, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের আবেগশীল জীবনের খাতিরে একেবারে এখন থেকেই আমার স্ত্রীর উপর কঠোর আত্মসংযমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সুস্থ নরনারীর জীবনে যৌন বৃত্তির যে যথাযোগ্য স্থান আছে, একথা তো আমাদের মানতেই হবে। আমি সাধারণের ব্যতিক্রম নই, আমার স্ত্রী তো আরও নয়। ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কুফল সম্বন্ধীয় আপনার মূল্যবান রচনাবলী পড়ে বোঝার মত জ্ঞানই তার নেই।

"চিঠিটি একটু বেশী বড় হয়ে যাওয়ায় আমি দুঃখিত। তবে মনের কথা খোলসা করার জন্য এর চেয়ে আর সংক্ষিপ্ত করা গেল না।

"আপনি এ পত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন।"

গত ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে চিঠিটি পেলেও এতদিনে এতে হাত দেওয়া সম্ভব হল। এই চিঠিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর অবতারণা করা হয়েছে। এর জবাব দিতে অনেকখানি জায়গা লাগা উচিত। তবে আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে কাজ সারার চেষ্টা করব। ছাত্রটি যেসব অসুবিধার কথা বলছে, তা দেখতে গুরুতর মনে হলেও এর অনেকগুলিই তার নিজের সৃষ্ট। শুধু এর উল্লেখ করলেই ছাত্রটির অযৌক্তিক ভূমিকা ও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অকার্যকারিতা সাবুদ হবে। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে বণিক বৃত্তি গ্রহণ করেছে এবং এর লক্ষ্য শিক্ষাকে শুধু নগদ

অর্থে রূপান্তরিত করা। আমার কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য এতদপেক্ষা মহত্তর। ছাত্রটি যেন নিজেকে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর একজন মনে করে। তাহলেই সে দেখতে পাবে যে সে তার ডিগ্রীর কাছে যা আশা করছে, তার বয়সী লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী তার কল্পনাও করতে পারে না। যেসব আত্মীয়স্বজনের কথা সে উল্লেখ করেছে, তাদের সবার ভরণপোষণের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করতে যাব কেন ? শরীর সুস্থ হলে বয়ঃপ্রাপ্তরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য পরিশ্রম করবে না কেন ? পুরুষ বলেই যে একটি কর্মী মৌমাছির পিছনে অনেক নিষ্ক্রিয় মৌমাছি পুষতে হবে, এর কোন মানে নেই।

এর সমাধান হচ্ছে এই যে তাকে আগের শেখা অনেক কিছু ভুলতে হবে। তাকে তার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তার ভগ্নীরা যেন তার মত ব্যয়বহুল শিক্ষার যূপকাষ্ঠে না মাথা গলায়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কোন হাতের কাজ শিখে তারা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করতে পারে। এই কাজ আরম্ভ করা মাত্র শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশেরও সূচনা হবে। আর তারা যদি নিজেদের মানব সমাজের শোষণকারী না ভেবে সেবক মনে করে, তাহলে এরই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় অর্থাৎ আত্মারও উন্নতি হবে এবং তারা ভাইদের সঙ্গে সমানতালে নিজেদের ভরণপোষণ বাবদ অর্থ উপার্জন করবে।

এই চিঠিতে বোনের বিয়ে সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, তার সম্বন্ধেও এখানে লেখা যেতে পারে। "বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন বিশেষ দেরি করে আর লাভ কি ?" —এ কথা বলতে পত্রলেখক কি মনে করে তা আমি জানি না। কোন অবস্থাতেই ২০ বছরের কমে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এত দিন আগে থেকে ভাবনা চিন্তার পশরা মাথায় তুলে নেবার মানে হয় না। আর পত্রলেখক যদি জীবনের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে বোনেরা নিজেরাই নিজেদের সাথী বেছে নেবে এবং সে অনুষ্ঠানের খরচ পাঁচ টাকার বেশী হবে না। স্বয়ং আমি এ জাতীয় কয়েকটি অনুষ্ঠানে হাজির থেকেছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এসব পাত্রপাত্রীর স্বামী বা তার অভিভাবকরা হয়ত বি-এ পাশ ছিলেন।

কোথায় কিভাবে চরকা চালানো শিখতে হয়, ছাত্ররা এ জানে না দেখে সত্য সত্যই দুঃখ হচ্ছে। লখনউএ ভাল করে খুঁজে দেখলে এমন বহু যুবক পাওয়া যাবে, যারা তাকে সুতা কাটা শেখাতে পারবে। যদিচ গ্রামীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন নরনারীর কাছে চরকা চালানো দ্রুত পূর্ণ সময়ের পেশা বলে পরিগণিত হচ্ছে, তবুও সে যেন শুধু সুতা কাটা নিয়েই না থাকে। আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট বলেছি ও বাদবাকি খুঁটিনাটি সে নিজেই করে নিতে পারবে।

এবার আসে গর্ভনিয়ন্ত্রণের কথা। এক্ষেত্রেও যে অসুবিধার কথা বলা হয়েছে, তা কাল্পনিক। পত্রলেখক নিজ স্ত্রীর বুদ্ধিকে কম করে দেখে ভুল করেছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা সচরাচর যেসব নারী দেখি, তার স্ত্রী যদি সেই পর্যায়ের হয়, তবে অবিলম্বে সে আত্মসংযমের প্রস্তাবে সাড়া দেবে। পত্রলেখক নিজে যেন নিজের কাছে খাঁটি থাকে এবং নিজেকে যেন এই প্রশ্ন করে যে তার ভিতর যথেষ্ট আত্মসংযম বল আছে কিনা। এ পর্যন্ত আমি যতদূর দেখেছি, তাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ভিতরই আত্মসংযমের অভাব বেশী। তবে সংযম পালন করা সম্বন্ধে নিজ ক্ষমতাকে ছোট করে দেখবার প্রয়োজন নেই। মানুষের মত তাকে বৃহৎ পরিবারের সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হবে এবং পরিবার প্রতিপালনের শ্রেষ্ঠ পন্থা খুঁজে বার করতে হবে। তাকে একথা জানতে হবে যে, যেখানে মাত্র হাজার কয়েক লোক গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় জানে, সেখানে কোটী কোটী লোক এর নাম পর্যন্ত শোনেনি। কোটী কোটী জনসাধারণ সন্তানের জন্ম দিতে ভয় পায় না; যদিচ একথা ঠিক যে, তাদের প্রত্যেকটিই অতীব বাঞ্ছিত নয়। আমার মতে কৃতকার্যের ফল পেতে না চাওয়া ভীরুতার পরিচায়ক। যারা কৃত্রিম গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শরণ নেয়, তারা কোন দিনই সংযমের মহত্ব বুঝবে না। তাদের জীবনে এর প্রয়োজনই ঘটবে না। গর্ভ-নিরোধক ব্যবস্থার আড়ালে ইন্দ্রিয়শক্তির দাস হলে হয়ত সন্তানের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হবে; কিন্তু এর ফলে নর ও নারী উভয়েরই—বিশেষ করে আবার পুরুষের জীবনী শক্তি বিনষ্ট হবে। শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে অস্বীকার করা হচ্ছে মনুষ্য নামে কলঙ্ক আরোপ করা। পত্রলেখক যেন এ বিষয়ে মনস্থির করে যে, অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের হাত এড়ানোর একমাত্র সম্মানজনক ও নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে আত্মসংযম, সে ও তার স্ত্রী যদি এ প্রচেষ্টায় শতবার ব্যর্থকাম হয়, তাতে ক্ষতি কি? আনন্দ তো সংগ্রামেই। এর ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।

হরিজন ১৭-৪-১৯৩৭

৭১। ছাত্রসমাজ ও ধর্মঘট

বাঙ্গালোরের জনৈক কলেজের ছাত্র লিখছে:

"আমি হরিজনে আপনার লেখা পড়েছি। আন্দামান দিবস বা ঐ জাতীয় আন্দোলন উপলক্ষে ছাত্র ধর্মঘট সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানাতে অনুরোধ করছি।"

ছাত্রদের বাক্ স্বাধীনতা ও যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতার স্বপক্ষে আন্দোলন করলে ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্র ধর্মঘট এবং ছাত্রদের দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন আমি সমর্থন করতে অক্ষম। ছাত্রদের মতামত প্রকাশের সর্ববিধ স্বাধীনতা থাকা চাই। তারা ইচ্ছামত যে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে পারে। কিন্তু আমার মতে পাঠ্যাবস্থায় তাদের ইচ্ছামত যা কিছু করার স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত নয়। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। তবে জাতীয় আন্দোলন কালে কঠোরভাবে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবশ্য তখনকার অবস্থায় 'ধর্মঘট' শব্দটি প্রয়োগ করা চলতে পারে কিনা, তা একটি বিবেচ্য বিষয়। যাই হোক, তখন আর তাদের ধর্মঘট করতে হয় না। তখন সর্বব্যাপক ধর্মঘট সুরু হয়; অর্থাৎ সাময়িকভাবে পড়াশুনা মুলতুবী রাখতে হয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে, আসলে তা ব্যতিক্রম পদবাচ্য নয়।

সত্যি কথা বলতে কি পত্রলেখক যে সমস্যার উল্লেখ করেছে, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে তার উদ্ভব হবার কথা নয়। সেসব প্রদেশে এমন কোন অধিকার সঙ্কোচন হওয়া সম্ভব নয়, যা কিনা ছাত্ররা সানন্দে মেনে না নিতে পারে। তাদের ভিতর অধিকাংশই নিশ্চয় কংগ্রেসী ভাবাপন্ন। মন্ত্রীদের বিব্রত করতে পারে, এমন কিছু তারা নিশ্চয় করবে না। তারা যদি স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে, তবে তা এই জন্যই করবে যে, মন্ত্রীরা তা চান। কংগ্রেস যখন আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয় এবং কংগ্রেস যখন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অহিংস সংগ্রাম সুরু করেছে, তখন ছাড়া অন্য সময়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা চাইবেন যে, ছাত্ররা ধর্মঘট করুক, একথা আমি ভাবতেও পারি না। তবু আমার মনে হয়, সে অবস্থাতেও প্রথমেই ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ করে ধর্মঘটে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা নিজেদের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা করার সামিল। জনগণ যদি ধর্মঘট বা ঐ জাতীয় বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে থাকে, তবে শেষ উপায় হিসাবে ছাড়া ছাত্রদের এসব বিষয়ে টানা-টানি করা উচিত নয়। আমার যতদূর স্মরণ আছে, বিগত-যুদ্ধের সময় ছাত্রদের প্রথমে আহ্বান জানানো হয়নি। তাদের ডাকা হয়েছিল শেষে এবং তাও কলেজের ছাত্রদের।

১৮ই সেপ্টেম্বরে হরিজনে জনৈক স্কুল-শিক্ষকের পত্র সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি, পত্রলেখককে আমি সেটা পড়তে আর ইতিপূর্বে তা পাঠ করে থাকলে পুনর্বার পড়তে অনুরোধ জানাই। ছাত্র ও স্কুলের শিক্ষকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিকোণ আমি উক্ত রচনায় প্রকট করেছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গে অপর একজন

লিখছে ঃ

"আমরা যদি বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও অন্যান্য সকলকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিই, তবে অতীব বিশৃঙ্খল অবস্থা পরিদৃষ্ট হবে। সরকারী কর্মনীতি রূপায়ণ করার ভার যেসব সরকারী আমলা ও অন্যবিধ কর্মচারীর উপর তারা যদি সরকারের কার্যকলাপের সমালোচক হয়, তাহলে কোন সরকারের কাজ চালানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। আপনি চাইছেন যে, জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশ প্রেমিকতার ভাবধারা সকলের ভিতর কাজ করুক, তা অবশ্য ঠিক। তবে আমার মনে হয় যে, আপনি যদি আপনার দৃষ্টিকোণ আর একটু খোলসা না করেন, তবে আপনার লেখাটি নিয়ে ভুল বোঝার সৃষ্টি হবার আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল।"

আমি মনে করেছিলাম যে, আমার মনোভাব আমি স্পষ্টভাবে জানিয়েছি। যেখানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অবশ্য তার কর্মচারী বা ছাত্রদের সঙ্গে সরকারের মতদ্বৈধতা হবার অবকাশ অত্যন্ত ক্ষীণ। আমার মন্তব্যে কোথাও আমি উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিই নি। পূর্বোক্ত শিক্ষক মহাশয় যে বিষয়ের প্রতিবাদ করেছেন (এবং অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই এ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন), তা হচ্ছে গুপ্তচর নিয়োগবৃত্তি এবং স্বাধীন অভিমত দমন ব্যবস্থা। আজকাল এই দুটি কু-কাজের প্রসার বাড়ছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা স্বয়ং জনসাধারণের ভিতর থেকে এসেছেন এবং তাঁরা জনসাধারণের একজন। তাঁদের গোপন বলতে কিছু থাকার কথা নয়। তাঁরা ছাত্রদের মনোরাজ্যসহ প্রতিটি লোকহিতকর কার্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন, এইটাই আশা করা হয়। তাঁদের হাতে সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা কিনা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হওয়ায় নিসন্দেহেই আইনকানুন, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এভাবে যাদের পোষকতা করে না, বুঝতে হবে তারা বাতিল মাল। যেসব মন্ত্রীর পিছনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের পক্ষে আইনকানুন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী যে অনাবশ্যক লেজুড়—একথা বলা চলে। আর শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের জীবন্ত প্রতীক না হলে কংগ্রেসেরই বা মূল্য কি? সুতরাং কংগ্রেস যেখানে ক্ষমতাধিরূঢ়, সেখানে সর্বত্র বাধ্যতামূলক নয়, সেচ্ছাপ্রণোদিত শৃঙ্খলা বিরাজিত হবে।

হরিজন ২-১০-১৯৩৭

৭২। ছাত্রদের পক্ষে লজ্জার বিষয়

প্রায় হু'মাস যাবৎ আমার দপ্তরে পাঞ্জাবের একটি কলেজের ছাত্রীর একটি অত্যন্ত করুণ পত্র পড়ে রয়েছে। সময়াভাবের জন্যে মেয়েটির প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি বলাটা খানিকটা বাজে অজুহাতের মত শোনাবে। আসল কথা এই যে, তার প্রশ্নের জবাব জানলেও পাকেপ্রকারে জবাব দেবার হাঙ্গামা আমি এড়াতে চাইছিলাম। ইতিমধ্যে আর একজন অতীব অভিজ্ঞতাসম্পন্না ভগ্নীর একটি চিঠি পেলাম এবং তখন মনে হল যে, কলেজের ঐ ছাত্রীটি যে অতীব প্রত্যক্ষ অসুবিধার উল্লেখ করেছে, আর তার সম্বন্ধে আলোচনা না করলে চলে না। পত্রটির ছত্রে ছত্রে মেয়েটির গভীর ভাবাবেগের ছাপ পড়েছে। তাই সম্পূর্ণ পত্রটি উদ্ধৃত করা সম্ভব না হলেও তার প্রতি আমি যথাসম্ভব ন্যায় বিচার করব ঃ

"ইচ্ছা না থাকলেও মেয়েদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তাদের একলা বাইরে বেরোতে হয়। শহরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা, বা এক শহর থেকে অন্য শহরে সময় সময় তাদের যাবার দরকার পড়ে। এই ভাবে তাদের যখন একলা পাওয়া যায়, তখন কু-স্বভাব ব্যক্তিরা তাদের উত্যক্ত করে। পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা অসৌজন্যমূলক এবং এমন কি অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করে। আর তাদের মনে ভয়ডর না থাকলে, তারা আরো দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অহিংসার কর্তব্য কি তা আমি জানতে ইচ্ছুক। অবশ্য এরকম অবস্থায় হিংসার প্রয়োগ করা তো হাতের মধ্যেই রয়েছে। মেয়েটি যদি যথেষ্ট সাহসী হয়, তবে সে সেই বদলোকটিকে শায়েস্তা করার জন্য হাতের সামনে যা পাবে, কাজে লাগাবে। তারা অন্ততঃ চেঁচামেচি জুড়ে দিতে পারে এবং তার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়ে বদমাসটির পিঠে ভালমত চাবুকের দাগ পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আমি একথা জানি যে, এর ফলে দুর্গতিকে শুধু মুলতুবী রাখা হয়, এ কোন স্থায়ী সমাধান নয়। মানুষ দুর্ব্যবহার করলেও একটা আশা থাকে যে যুক্তি, প্রেম ভাব এবং বিনয়ের পরিচয় দিয়ে তার মন পাল্‌টানো যেতে পারে। কিন্তু সাইকেলে করে যেতে যেতে কেউ যখন পুরুষ অভিভাবকহীনা মহিলাদের উদ্দেশ্যে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করে, তখন কি করা চলতে পারে? তার সঙ্গে যুক্তি তর্কে প্রবৃত্ত হবার অবকাশ নেই। তার সঙ্গে হয়ত আর কোনদিন দেখাই হবে না। তাঁকে এর পরে চেনাও যাবে না, বা তার হাল-হদিশও জানা নেই। এ অবস্থায় দুর্ভাগা মেয়েদের উপায় কি? উদাহরণ স্বরূপ আমার গত কালকার (২৬শে অক্টোবর) অভিজ্ঞতার

কথা বলব। রাত প্রায় সাড়ে সাতটার সময় একটা বিশেষ কাজে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে আমি যাচ্ছিলাম। সে সময় কোন পুরুষ সাথী পাবার উপায় ছিল না, আর কাজটাও মুলতুবী রাখার মত ছিল না। রাস্তায় একটি শিখ যুবক সাইকেলে চড়ে পার হয়ে গেল এবং আমরা তার কথা শ্রবণযোগ্য দূরত্বের মধ্যে থাকাকালীন সব সময় সে একটি কথা বলেই চলল। বুঝলাম সে কথা আমাদেরই লক্ষ্য করে। আমরা ক্ষুণ্ণ হলাম ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। রাস্তায় বিশেষ জনমানব ছিল না। দুই এক পা যেতে না যেতেই সেই সাইকেল আরোহী ফিরে এল। বেশ খানিকটা দূর থেকেই তাকে আমরা চিনতে পেরেছিলাম। সে আমাদের দিকেই আসতে লাগল। আমাদের সামনে নেমে পড়া, না পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া, কি যে তার মতলব ছিল ভগবানই জানেন। আমাদের মনে হ'ল বিপদ আসন্ন। শরীরের শক্তিতেও আমাদের ভরসা ছিল না। নিজে আমি গড়পড়তা মেয়ের চেয়ে দুর্বল। তবে আমার হাতে একখানা ভারী বই ছিল। কি জানি কি করে আমার মনে হঠাৎ সাহস এল। ভারী বইখানা সাইকেলের দিকে ছুঁড়ে মেরে আমি চীৎকার করে উঠলাম, "ফের ওসব বলবে ?" অতি কষ্টে সে সাইকেলের ভারসাম্য বজায় রেখে জোরে পা চালিয়ে পালিয়ে গেল। আমি যদি ঐভাবে সাইকেলের দিকে বইখানি ছুঁড়ে না মারতাম, তাহলে সারাপথ সে হয়ত ঐসব কুৎসিত কথা বলে আমাদের বিরক্ত করত। এটা অবশ্য অতি সাধারণ ও অনুল্লেখযোগ্য ঘটনা। আপনি যদি লাহোরে এসে আমাদের মত হতভাগ্য মেয়েদের কাহিনী শোনার অবকাশ পেতেন, তা'হলে বড় ভাল হ'ত। আপনি নিশ্চয় এর সম্যক সমাধান খুঁজে পাবেন। প্রথমতঃ আমাকে এই কথা বলুন যে, ঐরকম অবস্থায় কি ভাবে মেয়েরা অহিংসা নীতি প্রয়োগ করে আত্মরক্ষা করতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ এই সব হীনচেতা যুবকদের মহিলাদেরকে অসম্মান করার রোগমুক্ত করার উপায় কি ? আপনি নিশ্চয় এ কথা বলবেন না যে যতদিন না মেয়েদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন মানব সমাজের অভ্যুদয় হচ্ছে, ততদিন ধৈর্য ধরে আমাদের এ অপমান সয়ে যেতে হবে। সরকার হয় এ সামাজিক দুরাচার বন্ধ করতে অনিচ্ছুক, আর নয় তার সে শক্তি নেই। বড় বড় নেতাদের এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোন সাহসিকা কোন অসৌজন্যকারী যুবককে উচিত শিক্ষা দিয়েছে শুনলে বলেন, "ঠিক করেছ। এই ভাবে সব মেয়েদের চলা উচিত।" সময় সময় কোন নেতা ছাত্রদের এই সব কদভ্যাসের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য কেউ নিরন্তর প্রযত্নশীল নন। আপনি একথা জেনে দুঃখিত ও বিস্মিত হবেন যে দেওয়ালী ও

অন্যান্য পর্বের সময় সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে সব বিজ্ঞপ্তি বেরোয় যে, মেয়েরা যেন এমন কি দীপান্বিতার আলোক সজ্জা পর্যন্ত দেখতে না বেরোয়। শুধু এই একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন যে, পৃথিবীর এই অংশে আমরা কি রকম হীন অবস্থায় নেমে গেছি। ঐসব বিজ্ঞপ্তির লেখক ও পাঠক কারও মনে এই জাতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য এতটুকু লজ্জাবোধ নেই।"

আর একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে আমি এই চিঠিটি পড়তে দিয়েছিলাম। সে নিজ কলেজ জীবনের কথা উল্লেখ করে পত্র-লেখিকার বক্তব্য সমর্থন করল এবং জানালো যে এই মেয়েটি যা লিখেছে, অধিকাংশ মেয়ের অভিজ্ঞতাই এই ধরণের।

আর একজন যে অভিজ্ঞতা সম্পন্না মহিলার কথা উল্লেখ করেছিলাম, তিনি তাঁর লখনউএর বান্ধবীদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে পিছনের সারিতে উপবিষ্ট ছেলেরা নানা রকম অভব্য উক্তি করে তাঁদের বিরক্ত করে। সেখানকার ছেলেরা তাঁদের সঙ্গে যেসব ঠাট্টা তামাসা করতে যায়, তার কথা পত্র লেখিকা উল্লেখ করলেও আমি এখানে তার আর পুনরালোচনা করছি না।

কথাটা শুধু যদি তৎকালীন ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হত, তা'হলে বলতে হবে যে মেয়েটি নিজেকে দুর্বল মনে করে, তার কাজ অর্থাৎ সাইকেলের আরোহীর দিকে বই ছুঁড়ে মারাই ঠিক। প্রতিকারের এ পন্থা বহু দিনের। এবং একাধিক বার আমি বলেছি যে হিংস আচরণ করতে ইচ্ছুক হলে শারীরিক দুর্বলতা, এমন কি অধিকতর বলশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসার আয়ুধ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যের বাধা নয়। আর আজকাল দৈহিক হিংসা প্রয়োগ করার এমন সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, একটুখানি বুদ্ধি থাকলে ছোট্ট একটি মেয়েও হত্যা ও ধ্বংস সাধন করতে পারে। পত্রলেখিকা-বর্ণিত অবস্থায় এ পন্থায় মেয়েদের আত্মরক্ষা করার উপায় শিক্ষা দেবার রেওয়াজও আজকাল দেখা যাচ্ছে। তবে পত্রলেখিকা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বলে এ কথা বুঝতে পেরেছেন যে ঐ ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে বাঁধানো বইটিকে আত্ম-রক্ষার অস্ত্র রূপে সাফল্য সহকারে প্রয়োগে সমর্থ হলেও ক্রমবর্ধমান এই পাপের স্থায়ী সমাধান এ নয়। কেউ কোন অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করলে বিচলিত হবার কারণ নেই। তবে এসব ঘটনা উপেক্ষা করাও চলে না। এসব কাহিনী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। দুষ্কৃতিকারীদের খোঁজ পাওয়া গেলে তাদের নাম প্রকাশ করা দরকার। পাপকে সর্বজন সমক্ষে ব্যক্ত করার ব্যাপারে কোন রকম ভুয়া বিনয় যেন সামনে এসে পথরুদ্ধ না করে। প্রকাশ্যে যারা বদমাসী করে বেড়ায়, তাদের সাজা দিতে হলে জনমতের মত কার্যকারী আর কিছু নেই। পত্রলেখিকার কথা ঠিক যে জনসাধারণের মনে এ সম্বন্ধে প্রচণ্ড ঔদাসীন্য বিদ্যমান। তবে এজন্য

শুধু জনসাধারণকে দোষ দিলেই চলবে না। তাদের কাছে দুর্ব্যবহারের প্রত্যক্ষ উদাহরণ পেশ করা চাই। চুরির ঘটনা প্রকাশ না হলে এবং তার তদন্ত না হলে যেমন চুরির ব্যাপারে কিছু করা যায় না, তেমনি দুর্ব্যবহারের উদাহরণ চেপে গেলে তার আর কিনারা হয় না। সাধারণতঃ পাপ ও অপরাধের পরিপুষ্টির জন্য অন্ধকারের প্রয়োজন ঘটে। আলোর ছটা পড়লেই এসব নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

তবে আমার মনে হয় যে একজন আধুনিকা অন্ততঃ পক্ষে আধ ডজন রোমিওর জুলিয়েট হতে চায়। দুঃসাহসিক বৃত্তি তাঁদের খুব পছন্দ। পত্র লেখিকা বোধ হয় সাধারণ মেয়ের ব্যতিক্রম। আধুনিকাদের পোশাক পরিচ্ছদ বৃষ্টি বাদলা বা রবিকরোত্তাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নয়; অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। গালে মুখে রংচং মেখে তারা প্রকৃতির উপরও এক কাঠি উঠতে চায় এবং নিজেদের চেহারাকে অনন্যসাধারণ করে তোলে। অহিংসা এসব মেয়ের জন্য নয়। একাধিকবার আমি একথা বলেছি যে, নিজেদের মধ্যে অহিংস শক্তির বিকাশের একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারাবাহিক নিয়ম আছে। এর জন্য কঠোর প্রযত্ন করতে হয়। চিন্তা ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে এর জন্য বিপ্লব সাধন করতে হয়। পত্র লেখিকা এবং তার মত মেয়েরা যদি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় জীবনে বিপ্লব সাধন করে, তাহলে অনতিবিলম্বে তারা দেখতে পাবে যে, যেসব যুবক তাদের সংস্পর্শে আসে তারা তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে ও তাদের সামনে সাধ্যমত সৌজন্য-মণ্ডিত আচরণ করছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা যদি দেখে যে তাদের সতীত্ব সংকটাপন্ন (আর এর সম্ভাবনা আছেই), তা'হলে মানুষের ভিতরকার সেই পশুটার কাছে আত্মসমর্পণ করার বদলে তারা বরং মরার সাহস অর্জন করবে। অনেকে আমাকে বলে থাকেন যে মুখে কাপড় গুঁজে বা অন্যভাবে যেসব মেয়েকে বেঁধে রেখে তাদের আত্মরক্ষা করার শক্তিটুক পর্যন্ত হরণ করা হয়েছে, তাদের মরা আমি যতটা সহজ ভাবছি, ততটা নয়। সবিনয়ে আমি এই কথা নিবেদন করব যে, যার প্রতিরোধ করার ইচ্ছা আছে, সে তার দেহকে বন্ধনকারী সর্ববিধ বাঁধনকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাকে মরণ বরণ করার ক্ষমতা দেবে।

কিন্তু এরকম সাহসিকতা প্রকাশ করা সম্ভব শুধু তাদেরই, যারা এর অনুকূল শিক্ষা নিয়েছে। অহিংসায় যাদের জীবন্ত বিশ্বাস নেই, তারা আত্মরক্ষার সাধারণ প্রক্রিয়া শিখবে এবং এই ভাবে অভব্য যুবকদের অসৌজন্যমূলক আচরণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে।

বড় কথা হচ্ছে এই যে, যুবকরা কেন এভাবে সাধারণ ভদ্র আচরণ জ্ঞান-বিরহিত হবে, যার জন্য সচ্চরিত্রা মেয়েদের নিরন্তর তাদের দ্বারা উত্যক্ত হবার ভয়ে

কাল কাটাতে হবে? অধিকাংশ যুবক ভব্যতার যাবতীয় জ্ঞানগম্যি হারিয়েছে—এ জানলে আমি অতীব দুঃখিত হব। তাদের কিন্তু সমগ্রভাবে নিজ সম্প্রদায়ের সুযশ বজায় রাখার জন্য বদ্ধ-পরিকর হতে হবে এবং নিজ সঙ্গী সাথীদের মধ্যে কেউ বেচাল হলে নিজেদেরকেই তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদের একথা বুঝতে হবে যে প্রত্যেক নারীর সম্মান তার নিজ মাতা ও ভগ্নীর সম্ভ্রমের সমতুল মহার্ঘ। সদাচার না শিখলে তাদের সকল শিক্ষা মূল্যহীন।

ছাত্রদের ভিতর যাতে ভদ্রতাবোধের বিকাশ হয়, তা দেখা এবং ক্লাসের পাঠ্য তালিকার ভিতর সদাচার শিক্ষা দেবার প্রথা সমাবিষ্ট করার সম পরিমাণ দায়িত্ব কি অধ্যাপকবর্গ ও শিক্ষক মণ্ডলীর উপরও বর্তায় না?

হরিজন ৩১-১২-১৯৩৮

৭৩। আধুনিকা

এগার জন মেয়ের নাম ও ঠিকানা সমন্বিত একটি চিঠি আমি পেয়েছি। চিঠিটির কোন রকম অর্থ পরিবর্তন না করে শুধু সুপাঠ্য করার জন্য ঈষৎ পরিমার্জন করনান্তর আমি সেটি প্রকাশ করছি।

"জনৈক ছাত্রীর পত্রোত্তরে ৩১শে ডিসেম্বরের হরিজনে 'ছাত্রদের পক্ষে লজ্জা-জনক' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি আপনি লিখেছেন, সেটি গভীর চিন্তাদ্যোতক। তবে আধুনিকাদের প্রতি আপনি এতখানি বীতশ্রদ্ধ যে শেষ পর্যন্ত তাদের আধ ডজন রোমিওর জুলিয়েট আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দিয়েছেন। আপনার এই মন্তব্য নারী সমাজের সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা-সঞ্জাত বলে বিশেষ উদ্দীপনা জনক নয়।

এযুগে যখন জীবন সংগ্রামে পুরুষদের সমান অংশীদার হবার জন্য মেয়েদের বদ্ধ আগল খুলে বাইরে বেরোতে হচ্ছে, তখন পুরুষদের কাছে অসদ্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি নিন্দারোপ করা বড় বিচিত্র ব্যাপার। একথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বহুক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই সমপরিমাণে দোষী দেখা যায়। হয়ত কয়েকজন মেয়ে আধ ডজন রোমিওর জুলিয়েটের ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে একথাও মেনে নিতে হয় যে আধ ডজন রোমিও-ও জুলিয়েটের খোঁজে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। তবে একথা মনে করা অনুচিত যে প্রত্যেকটি আধুনিকাই জুলিয়েট এবং প্রত্যেকটি আধুনিক যুবকই রোমিও। আপনি নিজেই বহু আধুনিকার সংস্পর্শে এসেছেন এবং আপনি নিশ্চয় তাদের দৃঢ়চেতা স্বভাব ও ত্যাগবৃত্তি আদি প্রশংসনীয় নারীসুলভ আচরণে মুগ্ধ হয়েছেন।

আপনি যে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার কথা বলেছেন, সে কাজ মেয়েদের নয়। অহেতুক সংকোচ তাঁদের এ পথের বাধা, একথা বলছি না। আসলে এতে কোন ফল হবার নয়।

কিন্তু আপনার মত একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির কাছে এ জাতীয় কথা শোনা অধুনা অপ্রচলিত 'নারী নরকের দ্বার' প্রবাদের পরিপূরক।

তবে পূর্ববর্তী মন্তব্য থেকে এ কথা মনে করবেন না যে আধুনিকাদের মনে আপনার জন্য শ্রদ্ধার আসন নেই। তারা আপনাকে প্রতিটি যুবকের মত সমান সমাদর করে। তাদের আপত্তি হচ্ছে, এই ভাবে তাদের ঘৃণা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করায়। সত্য সত্যই তারা দোষী হলে ক্রটী সংশোধন করে নিতে প্রস্তুত। তবে অভিসম্পাত দেবার আগে তাদের দোষ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারা 'শুনেছেন মশাই, মেয়েছেলে'—এই জাতীয় বর্মের আড়ালে আত্ম-গোপন করবে না বা বিচারক যে তাঁর খেয়াল খুশী মত রায় দিয়ে যাবেন, তাও তারা নীরবে বরদাস্ত করবে না। সত্যের সম্মুখীন হতে হবে। আধুনিকা বা আপনার ভাষায় 'জুলিয়েটরা' সত্যের মুখোমুখী হবার সাহস রাখে।"

পত্র লেখিকাদের বোধ হয় জানা নেই যে চল্লিশ বছর আগে যখন তাদের কারও জন্মই হয়নি, তখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নারীদের সেবার ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করেছিলাম। আমি মনে করি যে নারীত্বের প্রতি অমর্যাদাসূচক কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। অবলা সমাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এত প্রবল যে আমি তাদের পক্ষে হানিকর কোন কিছুর চিন্তাই করতে পারি না। তাঁরা হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে মানব সমাজের শ্রেয়তর অর্ধাংশ। আর আমার প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল ছাত্রদের কলমের প্রতি আলোকপাত করতে, মেয়েদের দুর্বলতার কথা আলোচনার জন্য নয়। তবে সত্যকার প্রতিবিধানের নিদান নির্দেশ করতে হলে রোগ নির্ণয়কালে যে সব কারণে এ রোগের জন্ম, তার প্রত্যেকটির উল্লেখ আমি করতে বাধ্য।

আধুনিকা শব্দটি বিশেষ অর্থ বাচক। সুতরাং আমার মন্তব্যকে জনকয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অবকাশ আমার ছিল না। কিন্তু যেসব মেয়ে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়, তাদের প্রত্যেককে আধুনিকা বলা সঙ্গত নয়। আমি এমন অনেককে জানি যাদের মোটেই এই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। তবে অনেকে আবার আধুনিকা সেজে বসে আছে। আমার মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রীরা যাতে আধুনিকার নকল করে একটি গুরুতর সমস্যাকে আরও জটিল না করে দেয়, তার জন্য তাদের সতর্ক করা। কারণ এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্ধ্রের

একটি ছাত্রীরও একখানি চিঠি পেয়েছি। মেয়েটি অন্ধের ছাত্রদের অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে যা লিখেছে তা লাহোরের মেয়েটির বর্ণনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই অন্ধ্র-বালার বক্তব্য হচ্ছে এই যে সাদা সিধে পোশাক সত্ত্বেও তার সঙ্গীনীদের পরিত্রাণ নেই। স্বীয় প্রতিষ্ঠানের কলঙ্ক-স্বরূপ এই সব ছাত্রদের বর্বরতা লোক সমক্ষে জাহির করার মত সাহসও তাদের নেই। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দরবারে আমি এই অভিযোগ উপস্থাপিত করছি।

এই এগারটি মেয়েকে আমি ছাত্রদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করছি। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাদের সহায়। পুরুষদের অভব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কলা মেয়েদের শিখতে হবে।

হরিজন ৪-২-১৯৩৯

৭৪। এর নাম অহিংসা ?

নীচে আন্নামালী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের পত্র থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

"গত নভেম্বর মাস আন্দাজ পাঁচ-ছয় জন ছাত্র মিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন ছাত্রকে (তখন বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সম্পাদক) মারধর করে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতঃ সেই দলের নায়ককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করেন এবং বাদবাকি ক'জনের নাম সে বছরের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হয়।

শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের কয়েকজন বন্ধু ও সমর্থক ক্লাসে যোগদান না করার কথা ভাবতে লাগল ও তারা ধর্মঘট করা মনস্থ করল। তারা অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করে তাদেরও এর প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্মঘট করতে রাজি করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তারা এইজন্য সফলকাম হল না যে বেশীর ভাগ ছাত্রের মতে ঐ ছয় জনের শাস্তি পাওয়া উচিত বলে মনে হল এবং তারা তাই ধর্মঘটে যোগদান করল না বা তাদের প্রতি সহানুভূতিও দেখাল না।

পরের দিন আন্দাজ শতকরা ২০ জন ছাত্র ক্লাসে আসেনি। বাদবাকি ৮০ জন যথাবিহিত ক্লাসে যোগদান করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০।

এর পর বহিষ্কৃত ছাত্রটি ধর্মঘট পরিচালনার জন্য ছাত্রাবাসের ভিতর এল। ধর্মঘট অসফল দেখে সন্ধ্যাবেলায় সে অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করতে লাগল।

ছাত্রাবাস থেকে বাইরে যাবার মূল চারটি ফটকের উপর শুয়ে পড়া, ছাত্রাবাসের কোন কোন ফটকে তালা দেওয়া, যেসব অল্পবয়সী ছেলেদের ভয় দেখিয়ে কথা মানানো সম্ভব, তাদের নিজ নিজ কামরায় আটকে রাখা ইত্যাদি চলতে লাগল ; এইভাবে পঞ্চাশ-ষাট জন মিলে বিকেল নাগাদ অন্যসব ছত্রেদের বাইরে বেরোন বন্ধ করে দিল।

কর্তৃপক্ষ যখন দেখলেন যে এইভাবে সব ফটক বন্ধ হয়ে গেছে, তখন তাঁরা বেড়ার ভিতর দিয়ে রাস্তা করার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মজুরদের দিয়ে বেড়া ভাঙ্গা সুরু করলেন, ধর্মঘটীরা তখন সে রাস্তা দিয়ে অন্য ছাত্রদের কলেজে যাওয়ায় বাধা দিতে লাগল। পিকেটিংএ নিরত ছাত্রদের সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টাও সফল হল না। অবস্থা আয়ত্ত্বের বাইরে গেছে দেখে কর্তৃপক্ষ সকল গণ্ডগোলের মূল সেই বহিষ্কৃত ছাত্রটিকে ছাত্রাবাসের চৌহদ্দী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ জানালেন এবং পুলিশ এসে তাকে সরিয়েও দিল। এর ফলে স্বভাবতঃ আরও কিছু সংখ্যক ছাত্র বিক্ষুব্ধ হল এবং তারা ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা সুরু করল। পরের দিন ছাত্ররা যখন দেখল যে সমস্ত বেড়া অপসৃত হয়েছে, তখন তারা কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ক্লাস ঘরে ঢোকার পথে এবং সিঁড়িতে সিঁড়িতে শুয়ে পিকেটিং করা সুরু করল। এর ফলে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়কে দীর্ঘ দিনের অবকাশ দিলেন। নভেম্বরের ২৯শে থেকে জানুয়ারীর ১৬ই পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড় মাস কলেজ বন্ধ রইল। তিনি সংবাদপত্রে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দিয়ে অবকাশের পর তাদের আবার পড়াশুনা করার জন্য হাসি খুশী ভরা চিত্তে ফিরতে বললেন।

কিন্তু কলেজ খোলার পর দেখা গেল যে···কাছ থেকে নূতন নূতন সব সলা-পরামর্শ পাওয়ায় ধর্মঘটীরা নবোদ্যমে তাদের কাজে লেগে গেছে। শোনা গেল, তারা রাজাজীর কাছেও গিয়েছিল। তিনি তাদের উপাচার্য মহাশয়ের কথা মেনে চলবার উপদেশ দেন ও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন। উপাচার্য মহাশয় মারফৎ তিনি তাদের কাছে দুটি তার বার্তা পাঠিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে ও শান্ত ভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করতে অনুরোধ জানান। যদিচ অধিকাংশ ভাল ছেলের মনে এ তার বার্তার প্রতিক্রিয়া ভালই হয়, তবু ধর্মঘটীরা নিজেদের গোঁ ধরে রইল।

এখনও পিকেটিং চলছে। এ একেবারে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটীদের সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪৫এর মধ্যে। তাদের এমন জনা পঞ্চাশেক সমর্থক আছে, যারা সাহস করে প্রকাশ্য ভাবে ধর্মঘটে যোগ দেয় না ; কিন্তু ভিতর থেকে

সব রকমের গোলমাল পাকায়। রোজ তারা দলবদ্ধ ভাবে এসে ক্লাসে ঢোকার রাস্তার সামনে এবং দোতালার সিঁড়ির উপরে শুয়ে পড়ে ছাত্রদের ক্লাসে যাওয়া আটকায়। শিক্ষকরা কিন্তু মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করে পড়িয়ে যান এবং ধর্মঘটীরা আসার আগেই তাঁদের ক্লাস শেষ হয়ে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্লাসের জায়গা বদল হয়। সময় সময় খোলা জায়গায় ক্লাস হয় এবং সে অবস্থায় আর ধর্মঘটীরা শুয়ে থেকে পথ আটকাতে পারে না। তখন তারা চেঁচামেচি করে ক্লাসের ক্ষতি করে এবং কখনও কখনও তারা, যেসব ছাত্র অধ্যাপকদের কথা শুনতে এসেছে, তাদের সামনে বক্তৃতা জুড়ে দেয়।

কাল আবার একটা নূতন ব্যাপার ঘটেছে। ধর্মঘটীরা ক্লাসের ভিতর ঢুকে পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে চীৎকার জুড়ে দিয়েছিল। শুনলাম জনকয়েক ধর্মঘটী অধ্যাপক মহাশয় পৌছাবার আগে তাক্ বুঝে বোর্ডে খেয়াল খুশিমত লেখা সুরু করে দিয়েছিল। যেসব অধ্যাপককে তারা নিরীহ প্রকৃতির বলে জানে, তাঁদের তারা ভয় দেখানো সুরু করে দিয়েছে। এমন কি উপাচার্য মহাশয়কে তাঁরা এই বলে শাসানী দিয়েছে যে তিনি যদি তাদের দাবী না মেনে নেন, তবে 'হিংসা ও রক্তস্রোতের' বন্যা বয়ে যাবে।

আপনাকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানানো দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে গোলযোগের সৃষ্টি করার জন্য ছাত্ররা বাইরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করে ও গুণ্ডা নিয়োগ করে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্বয়ং এমন অনেক গুণ্ডা ও ছাত্রেতর ব্যক্তি দেখেছি, যারা কলেজের বারান্দায় এবং ক্লাস ঘরের আশে পাশে ঘোরাফেরা করে। এ ছাড়া ছাত্ররা উপাচার্য মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করে।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই : আমরা সকলে অর্থাৎ কতিপয় অধ্যাপক ও বহু সংখ্যক ছাত্র মনে করি যে এসব কার্যকলাপ সত্য ও অহিংসার সম্পর্ক রহিত এবং সেইজন্য সত্যাগ্রহের ভাবধারার প্রতিকূল। আমি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে অবগত হলাম যে জনকয়েক ধর্মঘটী ছাত্র এ আন্দোলনকে বার বার অহিংসা নীতি-সম্মত বলে প্রচার করছে। তারা বলে যে মহাত্মাজী যদি একে হিংস আন্দোলন বলে ঘোষণা করেন, তাহলে তারা এসব কার্যকলাপ বন্ধ করবে।"

পত্রটি ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাকা সাহেব কালেলকারের উদ্দেশ্যে লিখিত। অধ্যাপক মহাশয় কাকা সাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। এর বাকি যেটুকু অংশ প্রকাশ করা হল না, তাতে ছাত্রদের এই আচরণকে অহিংস বলা চলে কিনা, এ সম্বন্ধে কাকা সাহেবের অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং ভারতের বিভিন্ন

স্থানে ছাত্রদের ভিতর যে দুর্বিনীত ভাব দেখা যাচ্ছে, তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল।

যারা ধর্মঘটীদের বর্তমান আচরণের সমর্থক ও প্ররোচক, পত্রে তাদের নামও ছিল। ধর্মঘট সম্বন্ধে আমার অভিমত জ্ঞাপন করার পর একজন, সম্ভবত কোন ছাত্রই হবে, আমাকে উত্তেজিত ভাষায় লিখিত এক তার বার্তা প্রেরণ করে জানিয়েছে যে ধর্মঘটীদের আচরণ একেবারে অহিংসা-সম্মত। উপরে ধর্মঘট সম্বন্ধে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা যদি সত্য হয়, তবে বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করেই আমি বলব যে ছাত্রদের আচরণ নিঃসন্দেহে হিংস। আমাকে আমার ঘরের দরজার মুখ থেকে ফেলে দেবার মতই আমার ঘরের পথ আগলে থাকা হিংস আচরণ বলে গণ্য হবে।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের যদি সত্যকার কোন অভিযোগ থাকে, তবে নিশ্চয় তাদের ধর্মঘট এবং এমন কি পিকেটিং করার অধিকার আছে। তবে তারা এর জন্য নম্র ভাবে সূচনা দিতে পারে। মুখের কথায় বা ইস্তাহার বিলি করে এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তবে যারা ধর্মঘট করতে ইচ্ছুক নয়, তাদের চাপ দেবার জন্যে পথ আটকানো বা অন্য কিছু তারা করতে পারে না।

আর তাছাড়া ছাত্ররা কার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছে? শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের অন্যতম মনীষী। বেশীর ভাগ ছাত্র যখন জন্মায়নি বা যখন তাদের শৈশব কাল চলছে, তখন থেকেই অধ্যাপক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও চরিত্র মাহাত্ম্যের জন্য পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উপাচার্য রূপে পেলে গর্বানুভব করবে।

কাকা সাহেবকে যিনি পূর্বোক্ত পত্র লিখেছেন, তিনি যদি ঘটনার যথাযথ বিবরণ দিয়ে থাকেন, তবে স্বীকার করতে হবে যে আন্নামালী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আয়ত্বাধীন আনার জন্যে শাস্ত্রীজীর পদক্ষেপ অতীব সমীচীন পথে হয়েছে। আমার মতে ধর্মঘটীরা নিজ উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছে। আমি প্রাচীনপন্থী লোক এবং আমাদের শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করার কথা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু শিক্ষকের কথায় তাচ্ছিল্য করা বা তাঁদের নিন্দা করা আমার মাথায় ঢোকে না। এরকম আচরণ অভব্য এবং সব রকমের অভব্যতাই হিংসা।

হরিজন ৪-৩-১৯৩৯

৭৫। কঠিন প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ—আমি একজন হিন্দু ছাত্র। জনৈক মুসলান ছাত্রের সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু মূর্তি পূজার ব্যাপার নিয়ে আমাদের ভিতর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে। আমি মূর্তি পূজায় শান্তি পাই ; কিন্তু সেই মুসলমান বন্ধুটির বিশ্বাস উৎপাদনের মত সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আমি এর স্বপক্ষে দিতে পারি না। আপনি কি হরিজনে মূর্তি পূজা সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

উত্তর ঃ—আমি তোমার এবং তোমার সেই মুসলমান বন্ধুর, দুজনেরই প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি তোমাকে ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখিত আমার এতদ্‌সম্বন্ধীয় রচনাবলী পড়ার পরামর্শ দেব এবং তাতে যদি তুমি সন্তুষ্ট হও তবে তোমার মুসলমান বন্ধুটিও যেন সেগুলি পড়ে। তোমার প্রতি যদি তোমার বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা থাকে, তবে সে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তার গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠতে পারবে। যে সখ্যতা মত ও আচরণের অভিন্নতা দাবী করে, তার খুব দাম নেই। একেবারে মৌলিক পার্থক্য না হলে বন্ধুদের কর্তব্য হচ্ছে পরস্পরের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও চিন্তাধারার বিভিন্নতার সঙ্গে মানিয়ে চলা। তোমার বন্ধু হয়ত মনে করছে যে তুমি পৌত্তলিক বলে তোমার সঙ্গে মাখামাখি করা পাপ। পৌত্তলিকতা খারাপ ; কিন্তু মূর্তি পূজা সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। পৌত্তলিক তার মূর্তিকে দেবতা জ্ঞান করে। আর মূর্তি পূজক নুড়িতেও ঈশ্বর দর্শন করে এবং সেই কারণে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনার জন্য মূর্তির শরণ নেয়। প্রত্যেক হিন্দুর ছেলে জানে যে কাশীর সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দিরের শিবলিঙ্গটি স্বয়ং মহাদেব নয়। কিন্তু সে বিশ্বাস করে যে দেবাদিদেব বিশেষ করে ঐ শিলাখণ্ডেই অধিষ্ঠিত। কল্পনার এই অভিব্যক্তি আপত্তিকর নয়, বরং এটা কাম্যও। বইএর দোকানে যতগুলি গীতা আছে তার প্রতি আমি আমার গীতাটির মত ভক্তি মিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখি না। তর্কশাস্ত্র আমাকে বলে যে আমার গীতাখানির পবিত্রতা অন্য গীতার চেয়ে বেশী নয়। এ শুচিতাবোধ আমার কল্পনায়। কিন্তু এই কল্পনা চমৎকার ফল প্রসব করে। এর ফলে মানব জীবন পরিবর্তিত হয়। আমার মতে আমরা স্বীকার করি বা নাই করি, আমাদের প্রত্যেকেই মূর্তিপূজক বা (আমি যে পার্থক্য করেছি তা যদি সমীচীন বলে মানা না হয়) পৌত্তলিক। একখানি গ্রন্থ, একটি সৌধ, একটি ছবি বা পট—এ সবই মূর্তি এবং এর ভিতর ঈশ্বর আছেন। তবে এগুলিই ঈশ্বর নয়। যে বলে যে এইগুলিই ঈশ্বর, সে ভুল করছে।

হরিজন ৯-৩-১৯৪০

৭৬। শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা

প্রশ্ন :—শিক্ষিতদের ভিতর বেকার সমস্যা বিপদজনক গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি অবশ্য উচ্চ শিক্ষার নিন্দা করেন। কিন্তু আমরা, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রছায়ায় এসেছি, তারা বুঝতে পারি যে এখানে আমাদের মানসিক বিকাশ হয়। কেউ শিক্ষা পাক এতে আপনি আপত্তি করবেন কেন ? কর্মহীন গ্রাজুয়েটরা যদি জনশিক্ষা প্রচারে বেরিয়ে পড়ে এবং এর বিনিময়ে গ্রামবাসীরা যদি তাদের খেতে দেয়, তাহলে কি এ সমস্যার অধিকতর স্থষ্ঠু সমাধান হ'ত না ? প্রাদেশিক সরকার কি এই রকম সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কিছু হাতখরচ ও কাপড় জামার খরচ দিয়ে সাহায্য করতে পারে না ?

উত্তর :—আমি উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নই। তবে অগণিত দরিদ্র করদাতার অর্থে কয়েক লক্ষ যুবক-যুবতী এই শিক্ষা পাবে, আমি তার বিরোধী। এ হচ্ছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। সমগ্র উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা, শুধু তাই কেন, সারা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূলাগ্র পরিবর্তন দরকার। কিন্তু তোমাদের সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। এ বিষয়ে তোমরা আমার সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাবে। আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী যে প্রত্যেকের পরিশ্রমের ন্যায়সঙ্গত মূল্য দেওয়া উচিত। তাই আমি বলব যে গ্রাম-সেবার জন্য যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক যাবে, তাদের থাকা ও খাওয়া-পরার ভার গ্রামবাসীদের নিতে হবে। আর তারা এ ভার নেয়ও। তবে স্নাতকরা যদি সাহেব-সুবার মত থেকে তাদের সাধ্যের দশগুণ খরচ দাবী করে, তাহলে গ্রামবাসীরা এ ভার নিতে পারবে না। তাদের জীবনযাত্রা যথাসম্ভব গ্রামবাসীদের মত হওয়া উচিত এবং তাহলেই সে গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

হরিজন ৯-৩-১৯৪০

৭৭। একটি সমস্যা

প্রশ্ন :—আমার পিতা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একজন কর্মচারী। আমার আরও চারটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাবা চান যে আমি কারিগরী শিক্ষানবিশের কাজে ভর্তি হই। আমি যদি আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করি, তাহলে হয়ত তাঁর চাকরি চলে যাবে এবং সমগ্র পরিবারকে উপবাসী থাকতে হবে। তিনি বলছেন সাধ্যমত গঠনমূলক কাজ করে আমি জাতির প্রতি আমার কর্তব্য

পালন করতে পারি। আপনি কি উপদেশ দেন ?

উত্তর :—তোমার বাবা ঠিক বলেছেন। তুমি যদি তোমাদের পরিবারের ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা হও, তাহলে আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তোমার স্বীয় পরিবারকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। তুমি যদি পূর্ণোদ্যমে গঠনমূলক কাজ কর, তবে অবশ্যই যে কোন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারীর মতই দেশের সেবা করেছ জানবে।

হরিজন ৬ ৪-১৯৪০

৭৮। ছাত্রদের অসুবিধা

প্রশ্ন :—আমরা পুণার ছাত্র। আমরা নিরক্ষরতা বিরোধ অভিযানে ভাগ নিচ্ছি। এখন যে অঞ্চলে আমরা কাজ করছি, সেখানে অনেক মাতাল আছে এবং আমরা কাউকে লেখাপড়া শেখাতে গেলে তারা আমাদের ধমক-ধামক দেয়। আমরা হরিজনদের ভিতর কাজ করছি। তারা এতে ভয় পেয়ে যায়। অনেকে এই সব মদ্যপায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা বলেন। অনেকে আপনার মত ভালবাসা দ্বারা তাদের জয় করার কথা বলেন। আপনি কি পরামর্শ দেন ?

উত্তর :—তোমরা সৎ কাজ করছ। একালে যে বিরাট সমাজ সংস্কারের কাজ চলেছে, জনসাধারণকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা বা ঐ জাতীয় কাজের সৃষ্টি তার থেকেই। তোমরা যেসব মদ্যপদের কথা লিখেছ, তাদের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বলে মনে করতে হবে। এরা আমাদের সহানুভূতির পাত্র ও সেবা পাবার অধিকারী। সুতরাং তারা যখন ঠাণ্ডা মেজাজে থাকবে, তখন তোমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করবে এবং এতে যদি মার ধর খেতে হয়, তাও হাসিমুখে সয়ে যাবে। আমি আদালতের শরণ নেবার প্রস্তাব একেবারে বাতিল করি না ; কিন্তু তাতে এই কথা প্রমাণ হবে যে, তোমাদের ভিতর যথেষ্ট অহিংস শক্তির অভাব আছে। তবে তোমরা নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধেও যেতে পার না। যদি দেখা যায় যে প্রেমভাব প্রদর্শন সত্ত্বেও বাঞ্ছিত সুফল লাভ হচ্ছে না, তাহলে শুধু তাদের বাধার জন্য তোমাদের কাজ বন্ধ করা চলতে পারে না। সে অবস্থায় আইনের আশ্রয় নিতে হবে। তবে আইন-আদালত করার পূর্বে সর্বান্তঃকরণে প্রেম দ্বারা তাদের জয় করার সর্ববিধ প্রচেষ্টা করতে হবে।

হরিজন ৮-৬-১৯৪০

৭৯। ছাত্রসমাজ ও সত্যাগ্রহ

প্রশ্ন :—যদি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়, তবে ছাত্রদের তাতে যোগ দিতে আপনি নিষেধ করেন কেন? আর যদি তাদের সত্যাগ্রহে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তার জন্যে চিরকালের মত স্কুল-কলেজ ছাড়তে হবে কেন? দেশ যখন জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত, তখন ইংলণ্ডের ছাত্ররা নিশ্চয় হাত-পা গুটিয়ে নেই।

উত্তর :—ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছাড়তে বলার অর্থ তাদের অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে বলা। আজ এটা আমাদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমার উপর যদি সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার ভার থাকে, তাহলে ছাত্রদের আমি স্কুল-কলেজ ছাড়তে প্ররোচিত করব না বা এর জন্য আহ্বান জানাব না। আমার অভিজ্ঞতা এই কথা বলছে যে ছাত্রদের মন থেকে এখনও সরকারী বিদ্যায়তনের মোহ যায়নি। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের যে আর আগের মত মর্যাদা নেই, এ আনন্দের কথা। তবে আমি এর উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করি না। আর এসব প্রতিষ্ঠান যদি চালাতেই হয়, তবে সত্যাগ্রহের জন্য এর থেকে ছাত্রদের বার করে আনায় তাদের বিশেষ কাজ হবে না এবং আন্দোলনেরও সহায়তা হবে না। এভাবে ছাত্রদের বার করে আনাকে অহিংসা-সম্মত বলা চলে না। আমি তো একথা বলেই দিয়েছি যে, যারা এ আন্দোলনে যোগদান করতে চায়, তাদের চিরদিনের মত স্কুল-কলেজ ছেড়ে জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পরও তাদের কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ছাত্রদের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে না। সেখানে সমগ্র জাতিই যুদ্ধে প্রবৃত্ত। কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এখানে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছাড়তে হবে।

হরিজন ১৫-৯-১৯৪০

৮০। জনৈক খ্রীষ্টান ছাত্রের অভিযোগ

বাঙলা দেশের একটি মিশনারী কলেজের জনৈক খ্রীষ্টান ছাত্র লিখছে :

"মিশনারী কলেজগুলিকে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরিতকরণের কেন্দ্র বলে মনে করা হয়। মিশনারীরা বাইবেল, যীশুখ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টধর্মের কথা বলেন। কিন্তু যেই ভারতের সামনে কোন জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হয়, তাঁরা অদ্ভুত ভাবে

প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যান। আমাদের কলেজে বাৎসরিক উৎসব হয়। গত ৭ই সেপ্টেম্বর এমনি একটি অনুষ্ঠান হয় এবং ছাত্রাবাসের জনকয়েক বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত দ্বারা এর উদ্বোধন করে। কলেজের অধ্যক্ষ এই বলে এতে আপত্তি করলেন যে ইউরোপীয়দের পক্ষে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন এবং এই সব অনুষ্ঠানে যদি বন্দে মাতরম্ গাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এটাকে সরকারী ভাবে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং তাঁরা এ গানকে এরকম স্বীকৃতি দিতে মোটেই উৎসুক নন। ছাত্রদের সর্ববিধ যুক্তি তর্ক সত্ত্বেও কোন রকম আপোষ রফা সম্ভব হয়নি। ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করেছে। কংগ্রেসেরও এইভাবে সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ করা উচিত। কারণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন কিছুতেই আমাদের দৃষ্টিকোণ বুঝবে না।"

সম্প্রতি আমি ছাত্র ধর্মঘটের বিরুদ্ধে বহু কিছু লিখেছি। আমি কলেজটির নাম জানি না। নাম জানলে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্বোক্ত বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করে নিতাম। এমতাবস্থায় আমাকে ধরে নিতে হচ্ছে যে পত্র লেখক ঘটনার সত্য বিবরণই দিয়েছে। ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে সানন্দে আমি বলছি যে এ ধর্মঘট অতীব সঙ্গত হয়েছে। আমি আশা করি যে এ ধর্মঘট সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল ও ধর্মঘটীরা সফলকাম হয়েছিল। এ গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিনা, তার বিচারক ঐসব মিশনারীরা নন। তাঁদের পক্ষে এইটুকু জানাই নিশ্চয় যথেষ্ট যে তাঁদের ছাত্ররা একে জাতীয় সঙ্গীতের মান্যতা দিয়েছে। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের যদি ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হতে হয়, তাহলে তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত বা অনুচিত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

হরিজন ৬-১০-১৯৪০

৮১। ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক ধর্মঘট *

১

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের ফলে মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশের যে ছাত্র বিক্ষোভ হয় ও সেই আন্দোলন দমনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রদেশের

* রাজনৈতিক উদ্দ্যেশ্যে ছাত্র ধর্মঘট নিন্দা করে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রদত্ত দুটি বিবৃতি।

সরকার কি রকম প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তার খবর জানিয়ে আমাকে অনেক ছাত্র চিঠি লিখেছে। ছাত্ররা এখন এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করতে চায় ও এর জন্য আমার পরামর্শ চেয়েছে।

ভারতের একজন মহান ও অসমসাহসী সন্তানের কারাদণ্ড বিধানের জন্য সমগ্র বিশ্ব যখন লজ্জায় অধোবদন, তখন ভারতের ছাত্র সমাজের সত্বার মূল পর্যন্ত যে এতে বিচলিত হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? সুতরাং মনে প্রাণে তাদের প্রতি আমার সমর্থন থাকা সত্বেও আমি এই অভিমত ব্যক্ত করতে বাধ্য যে, জওহরলাল নেহরুর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হবাব প্রতিবাদে তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া অন্যায় হয়েছে। অবশ্য দমননীতি অবলম্বন করে উভয় প্রদেশের সরকার গভীরতর অন্যায় অনুষ্ঠান করেছেন।

আমার মতে ছাত্রদের প্রস্তাবিত প্রতিবাদমূলক ধর্মঘট না করাই ভাল। তারা যদি সত্য সত্যই আমার উপদেশ চায়, তাহলে তারা যেন এমন একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি আমার কাছে পাঠায়, যার কাছ থেকে সব খবরাখবর পাওয়া যেতে পারে। কারণ ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ আমার জানা নেই। আমার উপদেশের ফল যাই হোক না কেন, সানন্দে আমি উপদেশ দেব। তারা জানে যে, আমি যে আন্দোলন পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছি, তার সাফল্যের জন্য তাদের আন্তরিক সহযোগিতার মূল্য আমি কত দামী বলে মনে করি। যাই হৌক, ভাল ভাবে ভেবে চিন্তে কাজ না করলে তারা নিজেদের হানি করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

২

সংবাদপত্রে এমন কতগুলি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে ছাত্র সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী সম্বন্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ জাতীয় প্রত্যেকটি রচনা পড়ার অবকাশ আমার হয়নি। অন্য কোন কারণে না হোক, সম্প্রতি আমার মাথায় যে অতীব গুরুতর কাজের চাপ পড়েছে, তার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের মানসেই এত সব লেখা পড়ে ওঠার সময় করতে পারিনি। আমার অভিমত স্পষ্ট। চিরতরে স্কুল-কলেজের পাট চুকিয়ে দিতে মনস্থ না করা পর্যন্ত কোন রকম প্ররোচনার দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক কারণে ছাত্র ধর্মঘট করা চলতে পারে না। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের মত নয়। এদেশে যে শাসকবর্গের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমরা সংগ্রাম

করছি, তারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালক। সুতরাং শাসকবৃন্দ কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার দাম দিতে হবে ছাত্রদের আত্মাব-দমনের দ্বারা। গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব—দুই চলতে পারে না। স্কুল-কলেজে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে তারা যদি শিক্ষা পেতে চায় (আর এ তারা চায় বলেই মনে হয়), তাহলে সেখানকার নিয়মকানুন তাদের মানতে হবে। সুতরাং ঐসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সম্মতি না পেলে কোন রকম রাজনৈতিক ধর্মঘট হওয়া উচিত নয়। তবে আমি একটি পথ নির্দেশ করতে পারি। স্কুল-কলেজের কয়েক ঘণ্টার পর ছাত্রদের নিজ আয়ত্বাধীন বহু সময় থাকে। ঐ সময় তারা সভাসমিতি করে সুশৃঙ্খল ভাবে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকট করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তারা শোভাযাত্রাও বার করতে পারে। যারা আমার নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাদের সাময়িক ভাবে বিদ্যানিকেতনের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে এবং আমার অনুমতি নিয়ে সত্যাগ্রহ করার যাবতীয় সর্ত পালনের পর তারা একাজে লাগতে পারবে।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক ছাত্র আমার কাছে যেসব পত্র লিখছে, তার থেকে বুঝতে পারছি যে আমার নেতৃত্বে তাদের বিশেষ আস্থা নেই। কারণ যে গঠনমূলক কাজের মূল ও সর্বাপেক্ষা দৃষ্টিগোচর অংশ হচ্ছে খাদি, তার উপরই তাদের বিশ্বাস নেই। সুতা কাটার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই এবং পত্র লেখকদের যদি নির্ভরযোগ্য সাক্ষী বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, অহিংসার প্রতি তাদের নিষ্ঠার পরিমাণও সন্দেহজনক।

মনে প্রাণে শৃঙ্খলা বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে ছাত্ররা জাতীয় সংগ্রামে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা যদি নিজেদের খেয়ালে চলে অকিঞ্চিৎ-কর বিক্ষোভ প্রদর্শনের পিছনেই যাবতীয় উদ্যম ব্যয় করে, তাহলে তারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষতি করছে বলতে হবে। কংগ্রেস কর্মীদের কাছে বেশ শৃঙ্খলা বোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে। সত্যি বলতে কি আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেছি। কারণ আমি এর জন্য তৈরী ছিলাম না। ছাত্র সমাজের সম্বন্ধে কেউ যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, ঠিক কাজের সময় তাদের ক্রটী ধরা পড়েছে। তারা যেন মনে রাখে যে, বিশৃঙ্খল এবং হঠকারিতাপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের তুলনায় আমি তাদের কাছ থেকে অধিকতর দৃঢ়তা, সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় চাইছি। ছাত্রদের একথাও বোঝা উচিত যে, জাতির ৩৫ কোটী অধিবাসীর তুলনায় আইন অমান্যকারীদের সংখ্যা সীমিত হতে বাধ্য। কিন্তু গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগকারীর সংখ্যার কোন সীমা নেই। একেই আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অংশ মনে করি। কারণ এছাড়া আইন অমান্য আন্দোলনে কোন আইন থাকবে না এবং ফলে এ একেবারে অকার্যকারী প্রমাণিত হবে।

৮২। ছাত্রসমাজ ও ক্ষমতা দখলের রাজনীতি *

দেশের জন্য আমি লড়াই করছি। এই দেশ বলতে অন্যান্য সকলের সঙ্গে ছাত্র সমাজকেও বোঝায়। তবে ছাত্রদের উপর আমার একটা বিশেষ অধিকার আছে এবং তাদেরও আমার কাছে একটা বিশেষ দাবী আছে। তার কারণ, আমি এখনও নিজেকে ছাত্র মনে করি। আর তাছাড়া আমি ভারতে ফেরার পর থেকেই ছাত্রদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে অনেকে সত্যাগ্রহের কাজ করেছে।

সুতরাং সাময়িক আবেগের তাড়নায় আজ সমস্ত ছাত্র সমাজও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবুও আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য হবে এই আশঙ্কায় আমি উপদেশ দেওয়া বন্ধ করব না।

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়া উচিত নয়। তারা যেমন সব ধরণের বই পড়ে, তেমনি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য তারা শুনবে। তাদের লক্ষ্য হবে "নীরং পরিত্যক্তয়া গ্রহেৎ ক্ষীরম্।" রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি এই হবে তাদের যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিকোণ।

ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ছাত্র সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। এই সব ব্যাপারে আটকা পড়া মাত্র তাদের ছাত্রত্ব আর থাকে না এবং তাই সংকট মুহূর্তে তারা আর জাতির সেবা করতে সক্ষম হয় না। আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তুমি যদি এই রকম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়, তাহলে তোমাকে দিয়ে ছাত্রদের কোন সেবা হবে না।

প্রত্যেকটি কংগ্রেসীই যেমন দেবদূত নয়, তেমনি সব কম্যুনিস্ট খারাপ নয়। আমার তাই কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে কোন রকম গোঁড়ামি নেই। তবে তাদের আদর্শ তারা আমার কাছে যতটুকু বর্ণনা করেছে, তাতে বুঝেছি যে আমি তাদের সঙ্গে সহমত হতে পারি না। ডাঃ আসরফের যোগ্যতার প্রতি আমার যথেষ্ট আস্থা

* অখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে এই খবর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক গান্ধীজীকে জানালে, তাকে তিনি যে পত্র দেন, তার প্রতিলিপি। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সংবাদপত্রে প্রকাশনার্থ প্রচারিত।

আছে। তাঁর স্বদেশ প্রেমের সততা সম্বন্ধে আমি কোন দিন কোন প্রশ্ন তুলিনি। তবে এ বিষয়ে আমি দৃঢ় নিশ্চয় যে, একদিন তাঁকে ছাত্র সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য অনুতাপ করতে হবে। তবে আমার নিজ আদর্শে যতটা বিশ্বাস, তিনিও নিজ মতবাদের প্রতি ঠিক ততখানিই আসক্ত এবং আমরা দুজনেই সমান একরোখা। আমিও তাঁকে তাঁর ভুল দেখিয়ে দিতে পারব না বলে কখনও তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হই না এবং তিনিও আমাকে এড়িয়ে গিয়ে আমায় সম্মান করে থাকেন।

তবে ছাত্ররা যেন এই কথাটি জেনে রাখে যে, এখন আমি দেশের জন্য লড়াই করছি। আমি অনভিজ্ঞ সেনানায়ক নই, পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার পিছনে রয়েছে। সুতরাং আমার পরামর্শ নস্যাৎ করার আগে তারা যেন ৫০ বার ভাবে। এই পরামর্শ হচ্ছে, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তারা যেন কোন ধর্মঘট স্থরু না করে।

আমি কখনও এমন কথা বলিনি যে, কদাপি তাদের ধর্মঘট করা উচিত নয়। সম্প্রতি আমি মিশনারী কলেজের ছাত্রদের যে উপদেশ দিয়েছিলাম, (১০৬ সংখ্যক নিবন্ধ) তা যেন তারা বিস্মৃত না হয়। সে উপদেশ দেবার জন্য আমি অনুতপ্ত নই। তারা যেন একে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগায়।

৮৩। ছুটির কাজ

পুণা থেকে জনৈক পত্র লেখক জানাচ্ছে :

“এখন ছাত্ররা দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী যাচ্ছে। এদের বেশীর ভাগই শহর ছেড়ে পল্লীগ্রামে থাকবে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও তার ফলস্বরূপ ভারতবাসীর উপর যে দায়িত্ব পড়েছে, তার কথা খেয়াল করে এই সংকটজনক মুহূর্তে ছাত্রদের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনি কোন বাণী দিলে, তা কি সুফলদায়ী হবে না ? আপনার কাছে আমার তাই অনুরোধ যে আপনি যেন যথাসম্ভব সত্বর এই অবকাশ কালে ও তারপর ছাত্রদের কোনরকম কাজ করার নির্দেশ দিয়ে একটি আবেদন প্রচার করেন। আমার বিনম্র প্রস্তাব নীচে লিখলাম :

(১) সংবাদপত্র থেকে যুদ্ধ ও বিশেষ করে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ এবং হরিজনের গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ সমূহ গ্রামবাসীদের পড়ে শোনানো।

(২) বর্তমান সংকটজনক মুহূর্তের বিষয় এবং সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করা।

(৩) নাগরিক রক্ষীদল সংগঠন।

(৪) গ্রামে অন্নবস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বনের স্বপক্ষে প্রচার ও সংগঠন করা।

(৫) অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিরামহীন আন্দোলন করা। সম্ভবতঃ যেসব ছাত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্ধ স্তাবক, তারা এ কার্যক্রমের সহায়তার বদলে ক্ষতিই করবে। তবে ছাত্ররা কি উপাদানে গঠিত, সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে এবং এই কারণে উপরিউক্ত তালিকা থেকে জেনে-শুনে আমি সাম্প্রদায়িক ঐক্য বা কংগ্রেসের অন্যবিধ কর্মসূচী বাদ দিয়ে শুধু এই ধরণের কার্যক্রম এতে সমাবিষ্ট করেছি, যা নিয়ে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন আদর্শগত বিরোধের সম্ভাবনা অতি কম।"

পত্র লেখকের প্রস্তাবাবলীর সঙ্গে আমি যে সম্পূর্ণভাবে সহমত একথা বিনা আয়াসেই আমি বলতে পারি।

স্বাবলম্বন একটা বড় ব্যাপার। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর যুক্তপ্রদেশের বক্তৃতামালায় এই কথাটি এবং আত্মবিশ্বাস—এই দুটি কথাকে জাতীয় ধ্বনি বলে গ্রহণ করেছেন। এ সময়ে এ দুটি কথা জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করবে। মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূর্তির জন্য গ্রামবাসীরা যদি স্বাবলম্বী না হয় এবং আভ্যন্তরীণ নাশকতা বৃত্তি ও ব্যাধি এবং চোর-ডাকাতের বহিরাগত বিপদের সময় যদি তারা আত্মনির্ভরশীল না হয়, তবে গ্রামের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং স্বাবলম্বন বলতে কাপাস থেকে বস্ত্র বয়ন পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া এবং প্রত্যেকটি রবিশস্য, খন্দ ও পশুখাদ্যের চাষ বোঝায়। এ না করলে না খেয়ে মরতে হবে। আর আত্মবিশ্বাস বলতে বোঝায় যে গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় তাদের সব ভেদ-বিভেদের মীমাংসা করবে এবং গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তারা সম্মিলিত ভাবে কাজ করবে। শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আর কাজ হবে না। সর্বোপরি চোর ও ডাকাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের নিজ সম্মিলিত শক্তির উপর আস্থা রাখার শিক্ষা দিতে হবে। এর শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মিলিত অহিংস শক্তি। তবে কর্মীরা যদি অহিংসার কার্য পদ্ধতি যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ না হয়, তবে হিংসার আধারে সম্মিলিত আত্মরক্ষাবাহিনী গড়ে তুলতে তাদের দ্বিধা বোধ করা উচিত নয়। যেসব কংগ্রেস কর্মী অহিংসাকে তাদের বীজমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছে ও ফলে যাদের আর এ বিষয়ে নূতন করে কিছু বাছাই করার উপায় নেই, তাদের কথা এক্ষেত্রে আমি বলছি না।

সুতরাং ইচ্ছা থাকলে ছাত্ররা এই ভাবে কঠোর পরিশ্রমের অবকাশ কাটাতে পারে। কে জানে এই অবকাশের মেয়াদ অনির্দ্দিষ্ট কিনা? তা যদি নাই হয়,

তাহলেও স্বাবলম্বন এবং আত্মবিশ্বাসের সুষ্ঠু বুনিয়াদ রচনার পক্ষে এই দু' মাস যথেষ্ট সময়।

পত্রলেখক কিঞ্চিৎ ভীরু প্রকৃতির। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে ভয় পাবার কারণ নেই। যেসব ছাত্র পল্লী পুনর্গঠনের ভার নেবে, তারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হতেই পারে না। সাম্প্রদায়িকতা শহুরে মাল এবং শহরের মাটিতেই এর সম্যক পরিপুষ্টি হয়। গ্রামের অধিবাসীরা অতীব দরিদ্র এবং অতি মাত্রায় পরম্পরাবলম্বী বলে তাদের সাম্প্রদায়িক ঝগড়ায় আত্মনিয়োগ করার সময় নেই। যাই হোক এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে ছাত্র কর্মীরা এ বিষের প্রভাব মুক্ত।

হরিজন ৫-৪-১৯৪২

৮৪। পাঠান্তে কিংকর্তব্যম্

প্রশ্ন :—একটি ছাত্র যথোচিত গুরুত্ব সহকারে জিজ্ঞাসা করেছে, "পড়াশুনা শেষ হলে আমি কি করব?

উত্তর :—আজ আমরা পরপদানত জাতি এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে শাসকদের সুবিধার্থে। কিন্তু চরম স্বার্থপর ব্যক্তিও যেমন যাদের শোষণ করতে চায়, তাদের কিছু না কিছু লোভ দেখায়, তেমনি আমাদের শাসক-বর্গও তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করার জন্য একাধিক প্রলোভন আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে আসছেন। তাছাড়া প্রতিটি সরকারী ব্যক্তিই একরকম নন। এঁদের ভিতর এমন অনেক উদারপন্থী আছেন, যাঁরা শিক্ষা সমস্যাকে গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করেন। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বর্তমান ধারাতে কিছু ভালও আছে। তবে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যে কারণেই হোক, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির দুরুপযোগ হচ্ছে। অর্থাৎ একে অর্থ ও মানমর্যাদা প্রাপ্তির সাধন বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে" অর্থাৎ যা মুক্ত করে তার নাম বিদ্যা—এই যে প্রাচীন প্রবাদ, এ সেকালের মত আজও সত্য। এখানে শিক্ষার অর্থ শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয় বা মুক্তি বলতে শুধু পারলৌকিক মোক্ষ বোঝায় না। মানব সমাজের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষার নামই জ্ঞান এবং মুক্তির অর্থ হচ্ছে এমন কি ইহজাগতিক যাবতীয় বন্ধন পাশ ছিন্ন করা। বন্ধন হয় দু' রকমের। এক বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব বন্ধন এবং দ্বিতীয়তঃ নিজের মনগড়া প্রয়োজনের জালে আবদ্ধ হওয়া। এই লক্ষ্যাভিমুখী অভিযানে চলার পথে যে জ্ঞান অর্জিত হয়,

তাই হচ্ছে সত্যকার অধ্যয়ন।

বিদেশী শাসকবর্গ রচিত শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু জাতির স্বার্থহানি করবে একথা বুঝতে পেরে কংগ্রেস অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই যাবতীয় শিক্ষায়তন বয়কট করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। তবে মনে হয় সে যুগ পার হয়ে গেছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যায়তনে প্রবেশ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার চেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বর্তমান শিক্ষার এই মোহিনী রূপ পরিদৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস যে সত্যকার শিক্ষার ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত ধরণে।

যে ছাত্র আমার শিক্ষাদর্শের প্রতি নকল আদর্শের টানে নিজের পড়াশুনা ছেড়ে দেবে, সে পরে অনুতাপ করতে বাধ্য হবে। আমি তাই আরও নিরাপদ ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করি। যে প্রতিষ্ঠানে সে শিক্ষা গ্রহণ করছে সেখানে থাকতে থাকতেই সে মৎ কথিত সেবার আদর্শ গ্রহণ করুক এবং অর্থোপার্জনের বাসনা হতে নিবৃত্ত হয়ে ঐ আদর্শের পরিপূর্তির জন্য নিজ জ্ঞান নিয়োগ করুক। তাছাড়া অবসর কালে এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে সে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির অভাব মোচন করতে পারে। তাই সে যতটা পারে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করবে।

হরিজন ১০-৩-১৯৪৬

৮৫। শিক্ষার সাংস্কৃতিক অঙ্গ *

শিক্ষার সাহিত্য ঘটিত অঙ্গের চেয়ে এর সাংস্কৃতিক অঙ্গের প্রতি আমি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করি। সংস্কৃতি হচ্ছে মানব জীবনের ভিত্তিমূলক আর এখানে মেয়েদের এরই শিক্ষা পাওয়া দরকার। তোমাদের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে— অর্থাৎ ওঠা, বসা, চলা, ফেরা, কাপড়-চোপড় পরা আদি সব কিছুর মধ্যেই এর ছাপ পাওয়া যাবে। ফলে যে কেউ এক নজরে দেখেই বলে দেবে যে, তোমরা এই প্রতিষ্ঠানের হাতে গড়া। তোমাদের কথাবার্তায়, দর্শক অভ্যাগতদের সঙ্গে ব্যবহারে এবং পারস্পারিক ও তোমাদের শিক্ষয়িত্রী বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আচরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এখান থেকে ভাঙ্গী নিবাস পর্যন্ত তোমরা

* ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল নূতন দিল্লীর কস্তুরবা বালিকাশ্রমের ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ।

পদব্রজে গেছ আবার এসেছ শুনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তবে আমাকে শুধু খুশী করার জন্য এ কাজ করে থাকলে এত কষ্ট করা নিরর্থক হয়েছে বলব। কোন যানবাহন ব্যবহার করার চেয়ে হাঁটাটাই যেন তোমাদের সাধারণ নিয়ম হয়। মোটরগাড়ী কোটী কোটী দেশবাসীর জন্য নয়। তোমরা তাই একে বর্জন করবে। কোটী কোটী লোক এমন কি রেলওয়ে ট্রেনেও যাতায়াত করতে পারে না। নিজের গ্রামই তাদের কাছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। এটা খুব একটা সামান্য ব্যাপার। তবে অন্তরের সঙ্গে তোমরা যদি এই নিয়মটি মেনে চল, তাহলে তোমাদের সমগ্র জীবনে পরিবর্তন আসবে এবং স্বাভাবিক অনাড়ম্বতার মাধুর্যে মনপ্রাণ ভরে উঠবে।

এখানকার শিক্ষার ফলে তোমরা বিলাস বহুল জীবনযাত্রা নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন করবে না। আমি চাই এখানকার হরিজন মেয়েরা এমন উচ্চ কোটীর সংস্কৃতির পরিচয় দিক, যে তাদের অস্পৃশ্য মনে করতে প্রত্যেকে যেন লজ্জানুভব করে। হরিজন সেবক সঙ্ঘের কার্যকলাপের লক্ষ্যও এই। অস্পৃশ্যতার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতা প্রথার পাপ ও অমানুষিকতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে যে হরিজনরা কতটা উন্নতি করতে পারে, তা এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বের কাছে সংসাধিত করে দেখতে হবে। আমি সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন এই প্রতিষ্ঠান তার সৌরভ সমগ্র দেশে বিতরণ করবে ও দেশের প্রতিটি অংশের মেয়েদের এখানে আকর্ষণ করবে।

হরিজন ৫-৫-১৯৪৬

৮৬। স্বাধীনতার বনিয়াদ

যে উচ্ছৃঙ্খল জনতা গাড়ীর জানালা চুরমার করেছিল ও পারলে যারা বোধ হয় গাড়ীর ছাদ ভেঙ্গে ফেলত, তাদের কঠোর ভর্ৎসনা করে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন যে, প্রত্যাসন্ন স্বাধীনতার পক্ষে এ অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। তাদের নগরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলছে এবং সংক্ষিপ্ততম কালের মধ্যে জনগণ কি ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, কমিটি সেই কথা বিচার করছে। ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শুধু প্রভুর পরিবর্তন ঘটানো নয়। জনসাধারণ যদি স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে আগ্রহান্বিত হয়, তবে প্রথমে তাদের স্বতঃ আরোপিত শৃঙ্খলা পালনের গোপন মন্ত্র শিখতে হবে। নচেৎ রাজসত্বাধারীদের দ্বারা তাদের উপর অনুশাসন আরোপিত হবে। একে স্বাধীনতা বলা চলবে না, এ হবে স্বাধীনতার ব্যঙ্গ চিত্র। জনসাধারণ নিজেদের যোগ্যতার অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা পেয়ে থাকে। তারা যদি

উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহলে সরকার এবং সরকারী কর্মচারীরাও আইন শৃঙ্খলার নামে উচ্ছৃঙ্খল হবে। এর ফলে স্বাধীনতা বা মুক্তি কিছুই আসবে না, শুধু বিভিন্ন অরাজকতাবাদীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে ও এর একটি অপরটির উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করবে। সুসংবদ্ধ স্বাধীনতার জন্য প্রথমে স্বতঃ আরোপিত শৃঙ্খলা বোধ প্রয়োজন। জনসাধারণ যদি মার্জিত ব্যবহার করে, তাহলে সরকারী কর্মচারীরাও তাদের সত্যকার সেবকে পরিণত হবে। অন্যথায় সরকারী কর্মচারীরা যদি তাদের গর্দানে সওয়ার হয়, তবে তা অহেতুক বলা চলবে না। বুয়র যুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন যে, সূর্যালোক বঞ্চিত গভীর নিরক্ষীয় অরণ্যের ভিতর দিয়ে হাজার হাজার সৈনিক নীরবে কুচ-কাওয়াজ করে চলছে। শত্রুপক্ষ পাছে গতিবিধির সন্ধান পায় তাই নিশাথের অন্ধকারে তাদের এমন কি ধূমপান করার জন্য একটি দেশলাই-কাঠি জ্বালাবার উপায় ছিল না। সমগ্র সৈন্যবাহিনী একটি মাত্র লোকের মত একেবারে নীরবে ও সুশৃঙ্খল ভাবে চলাফেরা করত। স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিমুখে অভিযাত্রী জাতির কাছে শৃঙ্খলার প্রয়োজন নিঃসন্দেহে এর চেয়েও বেশী। এর বিনা রামরাজ্য—অর্থাৎ মর্তে ঈশ্বরের রাজ্য অবাস্তব কল্পনাই থেকে যাবে।

সাকসেরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় এবং কর্তৃপক্ষ নিজেদের কলেজে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমের মর্যাদা দিয়ে এক বিরাট কাজ করেছেন। তবে ছাত্ররা যদি অলস হয় বা জনসাধারণ যদি সহযোগিতা না করে, তবে এ সংস্কার সদ্য ভূমিষ্ঠ মৃত শিশুর মত হবে।

গান্ধীজী বললেন যে, কেউ কেউ এই সংশয় প্রকাশ করেন যে রাষ্ট্রভাষা প্রচারের ফলে প্রাদেশিক ভাষা সমূহের ক্ষতি হবে। এ ভয়ের জন্ম অজ্ঞতায়। সাকসেরিয়া কলেজের বর্তমান পদক্ষেপ এই সন্দেহের অমূলকত্ব সপ্রমাণের জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রাদেশিক ভাষাগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রভাষার সৌধ রচনার সুদৃঢ় আধার। এরা পরস্পরের পরিপূরক।

মাতৃভাষায় যন্ত্র বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে যে প্রভূত গবেষণা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন, তিনি এ-মনোভাবের সমর্থক নন। যাঁরা এভাবে তর্ক করেন, তাঁরা আমাদের গ্রাম্য ভাষা শৈলীতে কি পরিমাণ শব্দ সম্ভার ও বাক্ পদ্ধতি অন্তর্নিহিত আছে, সে সম্বন্ধে খবর রাখেন না। গান্ধীজীর মতে এমন কি বহুক্ষেত্রে সংস্কৃত বা পার্শিয়ানের শরণ নেবারও প্রয়োজন নেই। চম্পারণের গ্রামাঞ্চলে তিনি দেখেছেন যে তত্রস্থ গ্রামবাসীরা একটি মাত্র বিদেশী শব্দের সাহায্য না নিয়ে সাবলীলতা সহকারে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের উদাহরণ দান প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে তারা মোটর গাড়ীর পরিভাষা করেছে হাওয়া গাড়ী। বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের পণ্ডিতদের তিনি মোটর গাড়ীর এর চেয়ে মধুর পরিভাষা দিতে আহ্বান জানালেন।

জনৈক বক্তা উল্লেখ করেছিলেন যে, পূর্বোক্ত সংস্কারের ফলে কলেজের পাঠ কালের তিন বৎসরকাল সময় বেঁচে যাবে। কিন্তু গান্ধীজীর মতে এর চেয়েও বেশী সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হবে। তিনি বলে বললেন, "তাছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে তারা যা শিখবে, তা তারা ঘরে নিজের মা-বোনেদের বোঝাতে পারবে এবং এর ফলে তারাও ছাত্রটির সমপর্যায়ে উন্নীত হবে। নারীকে পুরুষের শ্রেয়তর অর্ধাংশ আখ্যা দেওয়া হয়। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার মাধ্যমের কৃপায় পুরুষ ও নারীর চিন্তা-রাজ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। আমাদের নারী সমাজ অনগ্রসর ও অজ্ঞতার সাগরে নিমজ্জিত। ফলে ভারত আজ শ্রেয়তর অর্ধাংশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত। এই বাধা বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।"

হরিজন ১৮-৮-১৯৪৬

৮৭। বিদেশে যাও কেন?

দেশে ফিরে যাতে স্বদেশবাসীর অধিকতর সেবা করতে পারেন, সেইজন্য জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক আমেরিকায় "নিউরো সার্জারী" শিখতে গিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্থান সংগ্রহ করেছেন এবং এখন হাউস-সার্জনের কাজ করছেন।

আমি যাতে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে যেতে নিষেধ করি সেইজন্য আমাকে নিম্নলিখিত কারণগুলি জানিয়েছেন :

(ক) আমাদের দরিদ্র দেশের দশটি ছাত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে শিক্ষা দিয়ে আনতে যা খরচ হয়, তা দিয়ে চল্লিশজন ছাত্রকে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক ও গবেষণাগারের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(খ) এখানে যেসব ছাত্র আসে, তারা গবেষণা কার্যে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে; কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে একটি গবেষণাগার সাজাবার শিক্ষা তারা পায় না।

(গ) ধারাবাহিক ভাবে কাজ করার সুযোগ তারা পায় না।

(ঘ) আমরা যদি বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের গবেষণাগারগুলিও নিখুঁত হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশের ছাত্ররা বিদেশে যাক, এ আমি কখনও চাইনি। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এসব ছেলে দেশে ফিরে শেষকালে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। দেশের মাটিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তাই সর্বাধিক মূল্যবান এবং আত্ম-বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। কিন্তু আজ বিদেশে যাবার মোহ ছাত্র সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। উপরিউক্ত উদ্ধৃতি যেন ঐসব ছাত্রদের কাছে সতর্কবাণী স্বরূপ হয়।

হরিজন ৮-৯-১৯৪৬

৮৮। ছাত্রদের অসুবিধা

"ছাত্র আন্দোলনের পুনরভ্যুত্থান মানসে ও ছাত্রদের জন্য একটি সম্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দেশের প্রত্যেকটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে এক জাতীয় সম্মেলনে আহ্বান করার প্রচেষ্টা চলছে। আপনার মতে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের রূপ-রেখা কেমন হওয়া উচিত? দেশের নবীন পরিস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানের কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার?"

এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটি মাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। ছাত্ররা ভবিষ্যৎ-নির্মাতা। তাদের বিভক্ত করা চলতে পারে না। আমাকে সখেদে মন্তব্য করতে হচ্ছে যে, না ছাত্ররা নিজেরা চিন্তা করছে, আর না নেতৃবৃন্দ তাদের আদর্শ নাগরিক হবার জন্য মাথা ঠাণ্ডা করে পড়াশুনা করতে দিয়েছেন। বিদেশী শাসকদের অবস্থান কালেই সর্বপ্রথম পচনক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। আমরা, যারা তাঁদের উত্তরাধিকারী হলাম, তারাও অতীতের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিনি। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ছাত্রদের মাছের ঝাঁকের মত পাকড়াও করতে কসুর করে নি। আর ছাত্ররাও বোকার মত ফাঁদে পা দিয়েছে।

সুতরাং যে কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ কাজ করা ভয়ংকর কঠিন। তবে যারা কর্তব্য পথে থেকে হঠতে রাজী নয়, তাদের ভিতর সাহসিকতাপূর্ণ মনোভাব থাকা প্রয়োজন। এর প্রথম কাজ হবে ভিন্নমুখী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একসূত্রে আবদ্ধ করা। আর সক্রিয় রাজনীতির সংস্পর্শ না ছাড়লে তাদের পক্ষে এ কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়। ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা। লেখাপড়া শেষ হলে তার কাজের সময় আসে।

"আজকালকার ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির ঝোঁক জাতীয় পুনর্গঠন কার্যে আত্ম-

নিয়োগ করার পরিবর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করার দিকেই বেশী বলে মনে হয়। এর আংশিক কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক দলীয় স্বার্থ সাধন মানসে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে করায়ত্ব করার প্রচেষ্টা। আমাদের আজকের অনৈক্যের মূলেও ঐ দলীয় রাজনীতির প্রভাব পাওয়া যায়। সুতরাং প্রস্তাবিত 'ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেণ্টস'এ আমরা এইসব দলীয় রাজনীতি ও অনৈক্যের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করার একটা ব্যবস্থা করতে চাই। আপনার মতে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে রাজনীতির সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করা কি সম্ভব? তা যদি না হয়, তবে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির রাজনীতি সম্বন্ধে কতটা আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত্ত বলে আপনি মনে করেন?"

আগের উত্তরে অংশতঃ এর জবাবও দেওয়া হয়ে গেছে। তাদের সক্রিয় রাজনীতি ছাড়তেই হবে। প্রত্যেকটি দল যে স্বীয় স্বার্থ সাধন মানসে ছাত্র সমাজকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, এটা একাঙ্গী বিকাশের লক্ষণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন শুধু মাত্র এই ছিল যে, এমন এক দাস-জাতি সৃষ্টি করা হবে, যারা দাসত্বের কারণে গর্বানুভব করবে, তখন বোধ হয় এরকম হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। আমার মনে হয় সে যুগ পার হয়ে গেছে। ছাত্রদের প্রথম কাজ হচ্ছে স্বাধীন জাতির শিশুদের কিরূপ শিক্ষা পাওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে চিন্তা করা। নিঃসন্দেহে আজকের শিক্ষাপদ্ধতি এর থেকে বহু দূরে। এর রূপ কেমন হওয়া উচিত, তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তারা শুধু এই ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে বসে না থাকে যে, এসব বিষয় তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যরা স্থির করবেন। তাদের নিজ চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। তবে আকারে-ইঙ্গিতেও আমি একথা বলছি না যে ধর্মঘট বা ঐ জাতীয় কার্য দ্বারা ছাত্রদেরকে নব শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে। গঠনমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ সমালোচনা দ্বারা তাদের জনমত সৃষ্টি করতে হবে। সিনেটের সদস্যরা প্রাচীন পন্থায় শিক্ষিত বলে তাঁদের সব কিছুতেই একটু দেরি হয়। সত্য জ্ঞান প্রচার দ্বারা তাঁদের সক্রিয় করে তোলা যেতে পারে।

"আজ অধিকাংশ ছাত্রই জাতির সেবার জন্য আগ্রহশীল নয়। তাদের ভিতর অনেকে তথাকথিত ফ্যাশন-দুরস্ত পাশ্চাত্য চালচলন গ্রহণ করেছে এবং ক্রমাগত অধিক সংখ্যক ছাত্র মদ্যপান জাতীয় কুক্রিয়ার প্রতি আসক্ত হচ্ছে। যোগ্যতার নাম শোনা যায় না ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রবৃত্তি লুপ্তপ্রায়। আমরা এসব সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করে যুবকদের মধ্যে চরিত্রশক্তি, নিয়মানুবর্তিতা এবং যোগ্যতার সৃষ্টি করতে চাই। কিভাবে একাজ করা সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?"

বর্তমান কালের চিত্তবৈলক্ষণ্যের নিদর্শন এ। পরিবেশ যখন শান্ত হবে, যখন ছাত্ররা আন্দোলনকারীর বদলে 'অধ্যয়নম্ তপঃ' ব্রত গ্রহণ করবে, তখন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। সন্ন্যাসীর জীবনের সঙ্গে ছাত্রাবস্থার যে তুলনা করা হয়, তা ঠিকই। তাকে সরল জীবন ও উচ্চাদর্শের প্রতীক হতে হবে। তাকে হতে হবে নিয়মানুবর্তিতার অবতার। অধ্যয়নই তার আনন্দের উৎস হবে। পড়াশুনা যখন ছাত্রদের কাছে দায়সারা গোছের না হয়, তখন এরকম হওয়া অবশ্যই সম্ভব। জ্ঞানরাজ্যের গভীরতম প্রদেশে অভিযানের চেয়ে অধিকতর কাম্য ছাত্রদের কাছে আর কি হতে পারে?

হরিজন ১৭-৮-১৯৪৭

৮৯। অহিংসা ও স্বাধীন ভারত *

কদিন আগে বেলেঘাটায় গান্ধীজীর আবাসে স্থানীয় ছাত্রদের একটি ছোট্ট দল সমবেত হয়েছিল। গান্ধীজী প্রথমেই তাদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তারা কেউ অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা? এর জবাবে তারা "না" বলল। তারা জানাল যে, তারা যেটুকু করেছে তা আত্মরক্ষার্থ এবং সেই কারণে তাকে দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করা বলা যায় না।

এতে গান্ধীজী অহিংসার সঙ্গে জড়িত কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকট করার অবকাশ পেলেন। তিনি বললেন যে, মানুষ চিরকালই হিংসা ও যুদ্ধকে অপরিহার্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে সমর্থন করার প্রয়াস পেয়েছে। একথা অতীব স্পষ্ট যে আক্রমণকারীর হিংসাকে পরাজিত করা সম্ভব আত্মরক্ষাকারীর অধিকতর উৎকৃষ্ট হিংসা দ্বারা। এই ভাবে সমগ্র বিশ্ব উন্মাদবৎ অস্ত্রসজ্জা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে এবং সত্য সত্য কখনও যে পৃথিবী তলোয়ারকে লাঙ্গলে পরিণত করার মত শান্ত অবস্থায় উপনীত হবে কিনা, তা কে জানে? তিনি এই মন্তব্য করলেন যে, মানব সমাজ এখনও সত্যকার আত্ম-রক্ষা-কলা শেখেনি।

কিন্তু যেসব মহাপুরুষ কথায় এবং কাজে এক, তাঁরা সাফল্য সহকারে এই কথা প্রমাণ করেছেন যে সত্যকার আত্মরক্ষার পথ হচ্ছে অপ্রতিরোধ। কথাটা শুনতে স্ববিরোধী মনে হলেও তিনি কিন্তু শব্দগত অর্থেই কথাটি প্রয়োগ করেছেন। হিংসা

* বেলেঘাটা বস্তিতে স্থানীয় ছাত্রদল ও অধ্যাপক স্টুয়ার্ট নেলসনের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনার বিবরণ।

সর্বদাই প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। আক্রমণকারী সর্বদাই একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণ করে। সে আক্রান্তকারীকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে চায় বা কোন না কোন বিষয়ে তার কাছ থেকে আত্মসমর্পণ আশা করে। এমতাবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি যদি আক্রমণকারীর হৃদয় চুরি করার পর নিজের পথ থেকে চুলমাত্র বিচ্যুত না হবার সংকল্প গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি আক্রমণকারীর হিংসার জবাবে হিংস প্রতিরোধ করার প্রলোভন জয় করে, তবে অনতিবিলম্বে আক্রমণকারী একথা বুঝবে যে অপর পক্ষকে সাজা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই এবং ওভাবে কারও উপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এতে অবশ্য কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই অবিমিশ্র আত্মপীড়নই সত্যকার আত্মরক্ষা এবং কদাচ এর পরাজয় নেই।

কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করবে যে, এই ভাবে অপ্রতিরোধের নীতি অবলম্বন করার জন্য যদি আত্মরক্ষাকারীর জীবন যায়, তাহলে একে আদৌ আত্মরক্ষা আখ্যা দেওয়া সঙ্গত কি? যীশু ক্রুশে জীবন দান করেছিলেন এবং রোমান পিলেট বিজয়ী হয়েছিল, গান্ধীজী কিন্তু এ কথা মানতে রাজী নন। বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে যে যীশুই বিজয়ী হয়েছিলেন। যীশুর অপ্রতিরোধের নীতির ফলে সমাজে যদি সুনীতির প্রভাব বাড়ে, তবে এ কাজের জন্য ভৌতিক দেহ বিলীন হয়ে গেলে কি-ই বা আসে যায়?

এই যে সত্যকার আত্মরক্ষা-কলা, যার ফলে মানুষ অমর হয়, ব্যষ্টির জীবনেতিহাসে এর সম্যক স্ফুরণ ও অভিপ্রকাশের বহুবিধ নিদর্শন বিদ্যমান। বৃহদায়তন মানব গোষ্ঠী অবশ্য শুদ্ধভাবে এ পদ্ধতির প্রয়োগ করে উঠতে পারেনি। ভারতের প্রয়োগ সমূহকে এ লক্ষ্যাভিমুখী অসম্পূর্ণ প্রয়াস বলা চলতে পারে। তাই হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের কালে এ একেবারে ব্যর্থ সাবুদ হ'ল।

ছাত্রদের সঙ্গে এই আলোচনা বৈঠকের দু' তিন দিন আগে গান্ধীজী এই বিষয়ে আমেরিকার অধ্যাপক স্টুয়ার্ট নেলসনের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করেছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় আমেরিকা ফিরে যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অধ্যাপক নেলসন তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে, যে ভারতবাসীরা মোটামুটি অহিংস পন্থায় দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তারা কেন ঐ পন্থায় গৃহ-যুদ্ধের তরঙ্গাঘাতকে প্রতিরোধ করতে পারছে না? জবাবে গান্ধীজী বললেন যে, এ এমন একটা অন্তর্ভেদী প্রশ্ন, যার জবাব দেওয়া তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে। তিনি তবে স্বীকার করলেন যে, এতদিন তিনি যাকে ভুল করে সত্যাগ্রহ মনে করতেন, আসলে তা দুর্বলের অস্ত্র-নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ছিল। ভারতবাসীরা মুখে বিদেশী

শাসকদের অহিংস উপায়ে অপসারিত করার কথা বললেও আসলে তাদের মন প্রাণ ছিল ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাদের প্রতিরোধ হিংসার দ্বারা প্রবুদ্ধ ছিল এবং সত্যাগ্রহ শক্তি দ্বারা ব্রিটিশের হৃদয় পরিবর্তন করার পরিবর্তে তারা তাদের ভিতর মনুষ্যত্বের ছিটেফোটা আছে বলে বিশ্বাস করত না।

এখন ব্রিটিশ শক্তির স্বেচ্ছায় এ দেশ ছাড়ার মুখে আমাদের বাহ্য অহিংসার দুর্বল আবরণ পলকে খসে পড়েছে। কংগ্রেসের বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও আমাদের মনের গোপন কন্দরে হিংসার যে গুপ্ত অস্ত্র ছিল, এখন তা মহাবিক্রমে জাগ্রত হয়েছে এবং ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা দেখা দিতেই আমরা পরস্পরের কণ্ঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছি। ভারত যদি আজ সাম্প্রদায়িকতার খাতে প্রবাহিত হিংস শক্তিকে অবদমিত করার উপায় আবিষ্কার করতে পারে এবং এর গতিপথের পরিবর্তন করে একে এমন এক সৃজনাত্মক শান্তিপূর্ণ ধারায় পরিচালিত করতে পারে, যার ফলে যুযুধান বিরোধী স্বার্থ সংঘাতের চির সমাধি রচিত হয়, তবে এ নিশ্চয় আমাদের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন হবে।

এর পর গান্ধীজী বলে চললেন যে, একথা সত্য যে তাঁর বহু ইংরেজ বন্ধু তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভারতের তথাকথিত অহিংস অসহযোগ মোটেই অহিংস নয়। ভারতে যা হয়েছে, তাকে দুর্বলের নিষ্ক্রিয়তা বলা চলে। সাহস বিস্তৃত বক্ষ পটোভূত অহিংসা এ নয়। এ নির্ভীকতার অভিপ্রকাশ হলে এমন কি স্বার্থ সংঘাতের মাঝেও আমরা মানব সমাজের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ বিস্মৃত হতাম না এবং বিরুদ্ধপক্ষীয়দের উপর আমরা চাপ দেবার বদলে তাদের হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্টা করতাম।

গান্ধীজী স্বীকার করলেন যে পূর্বোক্ত অভিযোগ সত্য ছিল। চিরটাকাল তিনি ভ্রান্ত ধারণা পরবশ হয়ে কাজ করে এসেছেন। তবে তিনি তার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ করেন না। তিনি বোঝেন যে তাঁর দৃষ্টি যদি ঐ মায়ায় আচ্ছন্ন না থাকত, তাহলে ভারতবর্ষ কিছুতেই আজকের অবস্থাতেও উন্নীত হতে পারত না।

ভারত যে এখন সত্য সত্যই মুক্ত, এ বিষয়ে তাঁর মনে সম্যক উপলব্ধি হয়েছে। এবার পরাধীনতার পাষাণ ভার অপসৃত হবার পর দেশে এক নবীন ব্যবস্থা রচনার জন্য যাবতীয় সুশক্তির সংঘবদ্ধ সমাবেশ হওয়া দরকার। নূতন আদর্শে পরিচালিত আমাদের এই দেশ দুটি রাষ্ট্র বা দুই দল মানুষের দ্বন্দ্ব মিটাবার জন্য চিরাচরিত হিংসার পথ বর্জন করবে। তাঁর মনে এখন পর্যন্ত এই বিশ্বাস আছে যে, ভারত সময়োপযোগী সৎসাহসের পরিচয় দেবে ও এই যে দুটি নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল, এরা মানব জাতির চলার পথে বাধা হবে না, হবে আশীর্বাদ স্বরূপ। যদি সত্য সত্যই

স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে হয়, তাহলে অহিংসার আয়ুধকে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের অবসান কার্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে স্বাধীন ভারতের অন্যতম কর্তব্য।

হরিজন ১৩-৮-১৯৪৭

৯০। ছাত্রদের সম্বন্ধে

জনৈক পত্রলেখক জানাচ্ছে:

"ভারতের ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে আপনি ঠিক সময়ে লেখা স্বরু করেছেন। এ সময়ে আপনার অভিমত পাওয়া অতীব প্রয়োজন। পরলোকগত মনীষী এইচ. জি. ওয়েলস এক জায়গায় ছাত্রদের 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট বুদ্ধি' আখ্যা দিয়েছেন। অর্ধ পরিণত ছাত্রসমাজকে কাজে লাগিয়ে নেওয়া অতীব বিপদজনক। এর ফলে ছাত্রদের অতীব প্রয়োজনীয় কাজ অধ্যয়ন ও মননকার্য ব্যাহত হয়। এই সংকট কালে 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট বুদ্ধির' শোষণ হবার ফলে যে ক্ষতি হয়, তা ফিরে শোষকদেরই আঘাত করে। তবে আপনার পূর্বোক্ত রচনা পাঠে মনে একটি প্রশ্ন জাগে। এ হচ্ছে, গান্ধীজীই কি এদের সর্বপ্রথম রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে টেনে আনেন নি? আমি জানি যে একথা সত্য নয়। তবে নিজের অবস্থা পুনরপি খোলসা করাও আপনার কর্তব্য।"

"দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে: ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি কি করবে? তাদের লক্ষ্য কি হবে? আজ আপনি ভাল ভাবেই জানেন যে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতির সাতমহলা সৌধে প্রবেশ করার সিংহদ্বার। কেউ কেউ শুধু এই উদ্দেশ্যে এগুলির নাম ভাঙ্গায়।"

মাত্র এই সপ্তাহেই 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট বুদ্ধি' কি ক্ষতি করতে পারে, তার নিদর্শন দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় ছাত্র সমাবেশে কিছু বলার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দুঃখের কথা তারা সহিদ সাহেবের (জনাব সুরাবর্দী অনুঃ) বিরুদ্ধে উত্তেজিত অন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে অবশ্য তাদের সুবুদ্ধি ফিরে আসে এবং কৃতকার্যের জন্য তারা অনুতপ্ত হয়। অর্ধ পরিণত বুদ্ধি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পেলে কি ভাবে উচিত কাজও করতে পারে, তার প্রমাণও ঐদিন তারা দিয়েছিল। এইবারের হরিজনে আমার প্রার্থনান্তিক ভাষণের যে বিবরণ বেরিয়েছে, তাতে এর সমাচার পাওয়া যাবে।

ছাত্রদের যদি একটি মাত্র সুসংহত প্রতিষ্ঠান থাকে, তবে তা দিয়ে অনেক কাজ

হতে পারে। সে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য হবে ছাত্রদের দেশমাতৃকার সেবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। তাদের ভিতর উচ্চ বেতনের কর্ম সংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টি করা এ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী হবে না। দেশসেবার আদর্শের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠলে তাদের জ্ঞানভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ হবে। যারা অধ্যয়ন শেষ করেছে আন্দোলন ইত্যাদি করার ভার শুধু তাদের উপর পড়বে। পাঠরত অবস্থায় ছাত্রদের একমাত্র কাজ হচ্ছে জ্ঞানের সঞ্চয় বাড়িয়ে যাওয়া। ভারতের জনগণের কথা চিন্তা করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে আজকের শিক্ষা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। কেউ কেউ অবশ্য এই নজির দেখাতে পারেন যে বর্তমান শিক্ষার ফলে দেশের কিছু না কিছু মঙ্গল হয়েছে। একে আমি নগণ্য বিবেচনা করি। এর দ্বারা কেউ যেন প্রতারিত না হয়। এর অগ্নি পরীক্ষার উপায় হচ্ছে এই কথাটি জানা যে, এর দ্বারা কি অতি প্রয়োজনীয় কার্য—অন্নবস্ত্র উৎপাদন ক্রিয়ার কোন সহায়তা হয়? আজকে যে কাণ্ডজ্ঞানহীন হত্যালীলা চলেছে, তা বন্ধ করার জন্য ছাত্র সমাজ কি করছে? প্রত্যেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ নয়নগোচর ভাবে সে দেশের প্রগতির সহায়ক হওয়া দরকার। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সে কর্তব্য সাধনে সক্ষম হয়নি। সুতরাং প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান কাজ হবে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির গলদ আবিষ্কার করে যথাসম্ভব নিজ জীবনকে সে ত্রুটীমুক্ত করার চেষ্টা করা। আদর্শ আচার ব্যবহারের দ্বারা তারা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের নিজ মতের অনুবর্তী করে ফেলতে পারবে। এ কাজ করতে পারলে কখনও তাদের দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়তে হবে না। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় গঠনমূলক ও সৃজনাত্মক কর্মসূচী নিঃসন্দেহে যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে; তাদের কার্যকলাপের ফলে পরোক্ষ ভাবে দেশের রাজনীতি শোষণ স্পৃহা থেকে মুক্ত থাকবে।

এবার প্রথম প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাক। মনে হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সময় ছাত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম, দেশ তা ভুলে গেছে। স্কুল-কলেজে পাঠরত অবস্থায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি কখনও ছাত্রদেরকে আমন্ত্রণ জানাই নি। আমি তাদের ভিতর অহিংস অসহযোগ বৃত্তি জাগিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, তারা যেন এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উজাড় করে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান ধারায় পরিচালিত স্কুল-কলেজের শিক্ষার আকর্ষণ ছাত্রদের কাছে অতীব শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হ'ল। মাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্র এর

সম্পর্ক বর্জন করতে সক্ষম হ'ল। সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে আমি ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে এনেছি। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় কুড়ি বছর নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন ভারতে ফিরলাম, তখন দেখি ছাত্ররা ইতিপূর্বে পাঠরত অবস্থাতেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমে পড়েছে। হয়ত তখন উপায়ন্তর ছিল না। সমগ্র দেশের জনসেবাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র বিদেশী শাসকবর্গ কর্তৃক এভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছিল যে কারও পক্ষেই আর দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। দেশের যুবকদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা এমন ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল যে, তারা এই শাসকদের অধীনে থাকতে বাধ্য হয় এবং তাদের মধ্যে অনেককে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকারে রেখে দেওয়া হ'ত। এই উপায়ে বিদেশী নিয়ন্ত্রণকে যথাসম্ভব দীর্ঘস্থায়ী করার প্রচেষ্টা চলছিল। সুতরাং ভিন্নদেশীয় শাসকবর্গ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ ছাড়া অন্যত্র স্বদেশ প্রেমিক কর্মী জুটত না। এই বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার কতখানি অপব্যবহার হয়েছিল, তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

হরিজন ৭-৯-১৯৪৭

৯১। অনুশাসনের স্বপক্ষে

প্রার্থনার পর গান্ধীজী কলকাতায় ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন যে, যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি নিজ জ্ঞান বিশ্বাস অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্য করে আসছেন এবং সম্ভবতঃ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর প্রথম বক্তৃতা ছিল ছাত্রদেরই সামনে। তারপর দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ কালে তিনি অসংখ্য ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাদের কাছে তিনি নূতন নন এবং তারাও তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তবে সম্প্রতি তিনি আর পূর্বের মত বক্তৃতা দেন না। সুতরাং আজ ছাত্রদের সমক্ষে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত বোধ করছেন। সন্ধ্যার ব্যাপার নিয়ে তাদের উপাচার্য মহাশয় সৌজন্য পরবশ হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সুরাবর্দী সাহেবের প্রতি ছাত্রদের আচরণ দৃষ্টে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন যে তিনি শুধু দৈনন্দিন প্রার্থনা করবেন ও প্রার্থনান্তিক ভাষণ দেবেন। এ রকম ঘটা উচিত হয়নি। সর্বত্র ছাত্রসমাজের ভিতর যেন অরাজকতা এসেছে। অধ্যাপকবর্গ বা উপাচার্যের প্রতিও যেন তাদের আনুগত্য বোধ নেই। পক্ষান্তরে তারা অধ্যাপকদের কাছ

থেকে আনুগত্য আশা করে। জাতির ভবিষ্যৎ নেতাদের এজাতীয় আচরণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সেদিন সন্ধ্যায় তারা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছে। তাঁর সাথী সহিদ সাহেবের প্রতি অসৌজন্যমূলক ইঙ্গিতপূর্ণ বিদেশী ভাষার প্ল্যাকার্ড তাঁকে দেখানো হয়েছে। ছাত্রদের তিনি বললেন যে সহিদ সাহেবকে অসম্মান করে তারা তাঁকেও অপমান করেছে। ঐসব অভব্য ভাষায় সহিদ সাহেবের অবশ্য কোন অপমান হয়নি। এতে তাদেরই সংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি একথা ভেবে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। সব কিছু বাদ দিয়ে ছাত্রদের বিনয়ী ও সত্য পথাশ্রয়ী হওয়া উচিত। তাদের উপাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। প্রধান মন্ত্রী সহিদ সাহেব এবং তিনি তাঁদের জন্য নির্মিত মঞ্চের উপর বসেছিলেন; কিন্তু উপাচার্য মহাশয় অন্যান্য দর্শকদের মাঝে আসন পরিগ্রহ করেন। তাঁর বিনয় দেখে গান্ধীজীর শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞের সময় তিনি অতিথিদের পদ প্রক্ষালনের মত সাধারণ কাজ বেছে নিয়েছিলেন। এতদ্বারা তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কবি বলেছেন, "বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।" হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যতটুকু জ্ঞান, তা থেকে তিনি বলতে পারেন যে অধ্যয়ন কালের অবসান না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের জীবন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনীয়। এ সময় তাকে কঠোর অনুশাসনের অধীন থাকতে হবে। এর মধ্যে তার বিবাহ বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। মদ্যপান বা ঐ জাতীয় নেশা করলে তার পড়া চলবে না। তার আচার-ব্যবহার হবে আত্মসংযমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তারা যদি এই নীতি অনুসরণ করে চলত, তবে প্রার্থনা সভায় তারা যা করেছিল, তা করতে পারত না।

হরিজন ৭-৯-১৯৪৭

৯২। একটি ছাত্রের সমস্যা

একটি ছাত্র তার শিক্ষককে যে পত্র লিখেছে, নীচে তা উদ্ধৃত করা হ'ল। শিক্ষক মহাশয় আমার অভিমত জানার জন্য চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

"জাতীয়তা বোধ ও প্রচণ্ড রীরংসা বৃত্তি—এই দুটি জিনিস আমাকে একান্ত ভাবে অভিভূত করে রেখেছে। এই বৃত্তি দুটি সদাসর্বদা আমার ভিতর ক্রিয়াশীল থাকায় আমার আচরণে পরস্পর বিরোধী ভাব পরিদৃষ্ট হয় এবং আমার কাজকর্মেও কেমন একটা অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। আমি দেশের একনিষ্ঠ সেবক হবার সঙ্গে সঙ্গে

বিশ্বের ঐহিক আনন্দও ভোগ করতে চাই। আমি স্বীকার করছি যে, সময় সময় ঈশ্বর-ভীতি প্রবল হলেও আমি আসলে নাস্তিক। যাবতীয় জীবের অস্তিত্ব আমার কাছে সমস্যা বিশেষ প্রতীয়মান হয়। এর শেষে যে কি আছে, তা আমি জানি না। মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ হতে আমি দেখেছি। শেষ এ দৃশ্য দেখেছি আমার মায়ের বেলা এবং এ দৃশ্য আমার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার ভবিষ্যতও যে ঐ, একথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। কাটা-চেরা দেখলেই আমার শরীর কেমন করে। এমতাবস্থায় আমার শরীর একদিন অগ্নিস্পর্শে ভস্মীভূত হবার কথা তো আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমি জানি, এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। আমার কাছে এই জীবনের ওপারে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর এই জন্যই আমি আতঙ্কিত।

"আমার সামনে দুটি মাত্র পথ আছে। হয় এই নিয়ে ভেবে ভেবে উৎসন্নে যাওয়া, আর নয় ঐহিক ভোগ বিলাসে মগ্ন হয়ে শেষের দিনের কথা ভুলে থাকা। আমি স্বীকার করছি (আপনার কাছে আমি এমন সব কথা স্বীকার করেছি, যা জীবনে কোন দিন কারও কাছে করিনি।) যে আমি শেষের উপায়টি বেছে নিয়েছি।

"এই জগতই একমাত্র সত্য। যে কোন মূল্যে তাই এর আনন্দ অর্জন করতে হবে। সম্প্রতি আমার স্ত্রীর দেহান্ত হয়েছে। তার জন্য সত্যি সত্যি বেদনা অনুভব করি। কিন্তু সে বেদনা যতটা না তার মৃত্যুর কারণে, তার চেয়েও বেশী আমার নিঃসঙ্গতার জন্য। মৃতের তো কোন সমস্যা নেই ; কিন্তু জীবিতের জীবন সমস্যা কণ্টকিত। আমি দেহাতীত প্রেমে বিশ্বাসী নই, তথাকথিত ভালবাসা আসঙ্গ-লিপ্সা ছাড়া আর কিছু নয়। পবিত্র প্রেম বলে যদি কিছু থাকত, তবে স্ত্রীর চেয়ে আমার মাতাপিতার প্রতিই আমি অধিকতর আকৃষ্ট হতাম। কিন্তু ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বামী হিসাবে আমি স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম ; কিন্তু পত্নীকে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি যে তার দেহাবসানের পরও তার কথা মনে রাখব। তার অবর্তমানে আমার যে অসুবিধা হবে, বোধ হয় তার জন্যই তার কথা আমার কিছু কিছু মনে পড়তে পারে। আপনি হয়ত একে নেতিবাদ আখ্যা দেবেন ; কিন্তু যাই বলুন না কেন, এ জিনিসের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না।......দয়া করে আমার পথ নির্দেশ করুন।"

উদ্ধৃত পত্রাংশে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়। (১) রীরংসা বৃত্তি এবং স্বদেশ প্রেমিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব (২) ঈশ্বর ও ভবিষ্যৎ এবং (৩) দেহাতীত প্রেম ও দেহের ক্ষুধা।

প্রথমটি বেশ ভাল ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। ছাত্রটির মনে আসঙ্গ লিপ্সাই প্রধান স্থান অধিকার করে আছে, আর স্বদেশ প্রেমিকতার কথা স্রেফ কালোপযোগী ফ্যাশান। তবে স্বদেশ প্রেম বলতে যদি ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বোঝায়, তবে এ আর দেহের ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন—এ দুই এক পদ। অনেকের জীবনে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে স্বদেশ প্রেম বলতে আমি যা বুঝি, তার অর্থ জাতির জন্য জলন্ত প্রেম। এর খাতিরে মায়ের বেলার শেষ দৃশ্যও দেখতে হয়। আর স্বদেশ প্রেমিকতা যে চিরকালই দেহের ক্ষুধা আদি সব কিছুকে দহন করে এসেছে—এ আর বড় কথা কি? তাই রীরংসা বৃত্তি ও স্বদেশ প্রেমিকতার ভিতর দ্বন্দের কথা উঠতেই পারে না। চিরকালই স্বদেশ প্রেম রীরংসা বৃত্তিকে পরাজিত করেছে। দেশপ্রেম তার পথের বাধা বা কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য বিন্দুমাত্র অবকাশ দেয় না। যে রীরংসা বৃত্তির দাস, সে তো ডুবেছে।

জীবনের প্রতি অত্যাধিক আসক্তিই ঈশ্বর ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিথিল বিশ্বাসের কারণ। এই আসক্তি নরনারীকে আবদ্ধ রাখে। এরই ফলে তারা অস্থির চিত্ততার প্রমাণ দেয়। জৈব-কামনার সমাধি রচিত হলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস উপ্ত হবে। এই দুটি জিনিস যুগপৎ বিকাশ লাভ করতে পারে না।

তৃতীয় সমস্যাটি প্রথমটির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য যে কোন প্রকার প্রেম অপেক্ষা দেহাতীত প্রেম স্বামী-স্ত্রীকে পরমেশ্বরের সমীপবর্তী করে। দেহাতীত প্রেমের সঙ্গে যখন যৌনাকাজ্ক্ষা মিশ্রিত হয়, মানুষ তখন বিশ্বস্রষ্টার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। সুতরাং যৌনানুভূতি ও রতিক্রিয়া যদি জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায়, তবে বিবাহেরই প্রয়োজন ঘটবে কিনা সন্দেহ। ছাত্রটি সত্য কথাই ব্যক্ত করেছে যে স্ত্রীর প্রতি তার স্বার্থ-গন্ধ-বিহীন ভালভাসা ছিলই না। তাদের আকর্ষণ নিঃস্বার্থ হলে জীবন-সঙ্গীনী বিহনে তার জীবন অধিকতর সমৃদ্ধ হ'ত। কারণ বিদেহী সাথীর স্মৃতি তাকে পতিত মানব জাতির সেবার জন্য অধিকতর মাত্রায় প্রবুদ্ধ করত।

হরিজন ১৯-১০-১৯৪৭

সমাপ্ত